২৫শে বৈশাখ, ১৩৬০

প্রচ্ছদশিল্পী :
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



প্রকাশক :
রুশো মিত্র
সাহিত্য প্রকাশ
৬০ জেমস লঙ্ সরণি
[পূর্বতন, সত্যেন রায় রোড]
কলকাতা ৭০০০৩৪

মুদ্রক :
অমলেন্দু শিকদার
জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩।১ মণীন্দ্র মিত্র রো
কলকাতা ৭০০০০৯

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত
বুড়ীমণিকে

॥ গোড়ার কথা ॥

বিশ্ব সাহিত্যের মূল্যায়নে পশ্চিমী লেখকরা সকলেই কমবেশী একপেশে দৃষ্টি-ভঙ্গী ও মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে বা এশিয়ার অন্য কোন দেশে এই বিভাগে কোন বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব হয়নি, তাই আমাদের মূল্যায়ন ও বিচারের ধারাটি কি, তা আমরা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতেই পারি নি। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে সমধিক আগ্রহশীল বাঙালী লেখকরাও একাজে কমই হাত লাগিয়েছেন। তবে বিশ্ব সাহিত্যের নানা মহলে বিচরণকারী বাঙালী যে বিগত শতাব্দীতে যথেষ্টই ছিলেন, তা বাংলা সাহিত্যের পুরান পুঁজিপাটা অনুসন্ধান করলেই বুঝতে পারা যায়। বেদ উপনিষদ তন্ত্র রামায়ণ মহাভারত ভাগবত ও পুরাণাদি হোক, আর ভাস কালিদাস ভবভূতি মাঘ শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের রচনাবলী হোক, অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাঙালী পাঠকের হাতে এসেছে বহুদিন আগেই। এসেছে মনু পরাশর কোটিল্য ও বাৎস্যায়নের রচনাবলী, এসেছে প্রধান প্রধান বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মশাস্ত্র এবং সংস্কৃত পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য গ্রন্থগুলি। তাছাড়া সন্ধিৎসুরা জানেন আবেস্তা বাইবেল ও কোরান হাদিস থেকে শুরু করে সাদী হাফিজ রুমী জামী ও ওমর খৈয়ামের রচনা পর্যন্ত, আবার হোমারের ইলিয়াড, প্লেটোর রিপাব্লিক, ভার্জিলের ইনিড ও দান্তের ডিভাইন কমেডী থেকে শেকসপীয়ার মিলটন মলেয়ার রুশো ভলতেয়ার গ্যয়টে ও তলস্তয়ের বিখ্যাত বই পুঁথি পর্যন্ত, বহু ভাষার ঐশ্বর্যই আহৃত হয়েছে বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে। হয়েছে কাণ্ট হেগেল প্রমুখের রচনাও। বঙ্গদেশে সেই বহুভাষাবিদ ও অধ্যয়ননিষ্ঠ মানুষদের সংখ্যা ইদানীং বিরল হয়েছে। তাই বিশ্ব সাহিত্য বলতে এখানকার পড়ুয়ারা বোঝেন প্রতীচ্য দুনিয়ার প্রাগাধুনিক ও আধুনিক কয়েকজন কবি নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিকের রচনা মাত্র। তার ওপিঠে আর নজর যায় না অনেকেরই। যা আমাদের এখানে, প্রায় সেই অবস্থাই দেখা দিয়েছে ইউরোপ আমেরিকাতেও। ইউরোপীয়তার ভিত্তি নামক প্রবন্ধে রাসেল বলেছেন, গ্রীক লাতিন ইতালীয়ান ফরাসী ও জার্মান সাহিত্যের ধ্রুবপদী রচনাবলীর সঙ্গে

ন্যূনতম পরিচয়ও নেই, র‍্যাবলে সারভান্তিস শেকসপীয়ার মিলটন ও মলেয়ারের সঙ্গে কোন দিন ভাল করে মোলাকাত হয়নি, বাইবেল এবং অষ্টাদশ শতকের বিশ্বকোষবাদী ও উনিশ শতকের মানবতাবাদী কবি সাহিত্যিকদের বার্তাও কোন দিন কানে পৌঁছায়নি ভাল করে, এমন ধারা মানুষরা ক্ষমতাপন্ন জার্মান ফ্রেঞ্চম্যান বা ইংলিশম্যান হতে পারেন। কিন্তু যথার্থ অর্থে জেন্টলম্যান অর্থাৎ ভদ্রলোক কিনা সন্দেহ। কারণ তাঁর মতে বিগত হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে যে ইউরোপীয় সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ইমারত, তা দাঁড়িয়ে আছে উপরোক্ত সাংস্কৃতিক বনিয়াদের ওপর। তার অন্তর্লোকে অনুপ্রবেশ হয়নি যাঁদের, তাঁরা ভৌগোলিক দিক থেকে যে দেশেরই মানুষ হন, সভ্য পৃথিবীর সমাজ জীবনে তাঁরা জবরদখলকারী ছাড়া কিছু নন। অথচ সব দেশেই প্রশাসন ও বিচারের এবং শিল্প সংস্কৃতি ব্যবসা বাণিজ্য ও সমাজের বেশীর ভাগ কর্তৃত্ব ন্যস্ত তাঁদের হাতে। তার ফলেই পৃথিবী আজ এমন বিপথে প্রস্থিত এবং মানবিক শুভবুদ্ধিভ্রষ্ট। রাসেল মনে করেন, ফলিত বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার উৎকর্ষ আজ যে অপরিমিত বিত্ত ও ক্ষমতা কিছুসংখ্যক সুবিধাভোগী মানুষের হাতে এনে দিয়েছে, তার অধীশ্বর হয়েই মানবিকী বিদ্যার এই অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছেন তাঁরা। যে বিদ্যা যথেষ্ট ধনাগমের পথ প্রশস্ত করে না, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মানুষকে অজেয় হতে সহায়তা করে না, তা নিশ্চিতই তাঁদের মতে পিছনের সারির জিনিস। অতএব প্রচুর সংখ্যক দর্শন ইতিহাস ও কলাকৃষ্টির সাধক চাই না, চাই বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, বৈমানিক, উচ্চ হিসাবনবীশ, কেন না রাষ্ট্র ও সমাজকে তাঁরাই সজীব ও সচল রাখেন। এই ভ্রান্ত জীবন-দর্শনের ফলেই দেখি প্রথম শ্রেণীর মেধাবী মানুষরা আজ কেউ আর যাচ্ছেন না মানবিকী বিদ্যানুশীলনের দিকে। ফলে সৃষ্টির রাজ্যেও বিরাট কাজ যেমন বেশী হচ্ছে না, তার বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রও তেমনি সংকুচিত হয়ে আসছে ক্রমশ। ভাবা হচ্ছে অল্পসংখ্যক বাতিকগ্রস্ত মানুষই শুধু সাহিত্য ও কলাকৃষ্টির সাধনা করেন এবং অল্পতর সংখ্যক মানুষ তা পড়েন, পড়ান ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন।

ঠিক এতখানি নৈরাশ্যবাদী হবার কারণ হয়ত নেই, কেননা দুনিয়ার অনেক দেশে মাত্র সেদিন ও বেশ কয়েকজন মহান লেখক ছিলেন, এখনো আছেন কয়েকজন। তাছাড়া নাটকে, কবিতায়, গল্প উপন্যাসে নূতন নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষার নামে খামখেয়ালের আবাদ যতই হতে থাকুক,

সৃষ্টির ধারা শত মুখে প্রবাহিত হয়েই চলেছে আজও এবং তার মধ্যে ভাল জিনিসও প্রচুর হচ্ছে, যার পরিচয় জানতে হবে। শুধু তাই নয়, পূর্বাপর মানব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রেখেই দেশ বিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য পড়তে হবে সকলকে। এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের, এক জাতি ও ধর্মের সঙ্গে আর এক জাতি ও ধর্মের আত্মিক সম্পর্ক খুঁজে বের করা ভিন্ন গোটা মানব সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয় কোন দিনই ত পাওয়া যায় না। তা করার সর্বোত্তম উপায় হল তুলনামূলক সাহিত্য বিচার। কি ভাবে এই বিচার করা যেতে পারে, তার একটু আভাস দিচ্ছি। ধরুন গ্রীক মহাকাব্য দুটির সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের এবং গ্রীক নাট্য সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের তুলনায় সমালোচনা করে দেখা যেতে পারে। লাতিন গদ্য লেখকদের সঙ্গে দণ্ডী ও বাণভট্টের গদ্য রচনার তুলনা করা যেতে পারে। খ্রীষ্টান মরমিয়াদেব পদাবলীর সঙ্গে স্থফী আলাবর সন্ত ও বৈষ্ণবদের রচনার তুলনা হতে পারে। ভারতীয় নীতি ও স্মৃতি শাস্ত্রগুলির সঙ্গে চৈনিক আরব্য রোমক এবং খ্রীষ্টীয় নীতিগ্রন্থগুলির তুলনা হতে পারে। হতে পারে ইউরোপীয় ত্রুবাদুর সঙ্গীত ও মধ্যযুগীয় ব্যালাড কবিতার সঙ্গে বাংলা মঙ্গল কবিতা ও লোকগাথার তুলনা। হতে পারে ভলতেয়ার গ্যয়টে তলস্তয় ও টমাস মানের সঙ্গে রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক সৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনা। এই ভাবেই হতে পারে চসারের সঙ্গে কবিকঙ্কণের এবং শেকসপীয়ারের সঙ্গে কর্ণেই ও রাসিনের, দান্তের সঙ্গে মিল্টনের এবং ওভিদ ও পেতরার্কের সঙ্গে মাইকেলের তুলনা। হয়ত আনুপূর্বিক মিল বা সমধর্মিতা দেখতে পাওয়া যাবে না এঁদের একের সঙ্গে অন্যের। কিন্তু পরস্পরের আলোয় দুপক্ষই নিঃসন্দেহে উজ্জ্বলতর হবেন এবং দুই দেশ ও সভ্যতার অন্তর্লোক উদ্ভাসিত হবে তাতে। তুলনামূলক সাহিত্য বিচার প্রয়োজন এই জন্যেই। আর এই জন্যেই জানা প্রয়োজন মানব সভ্যতা ও মানব সাহিত্যের একটি সমন্বয়িত অথচ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই বইয়ে তারই একটা কাঠামো তৈরির প্রয়াস হয়েছে।

দুই ॥ বিশ্বসাহিত্যের পটভূমি ॥

পৃথিবী কথাটা আকারে ছোট হলেও, জিনিষটা ত ছোট নয়। অসংখ্য গিরি নদী সাগর অরণ্য ও মরুভূমি সমাকীর্ণ, পাঁচটি মহাদেশে পরিব্যাপ্ত, লক্ষ লক্ষ জীবজন্তু পাখী সরীসৃপ কীটপতঙ্গ ও অন্যূন তিনশত কোটি নরনারী অধ্যুষিত এই ভূগোলক এক বিরাট বস্তু, যার বেড় পঁচিশ হাজার মাইল, কেন্দ্রবিন্দু থেকে পরিধি পর্যন্ত যার দুদিকের ব্যাস আট হাজার মাইল করে। এই বিশাল বিশ্বের প্রধান বাসিন্দা যে মনুষ্য জাতি, তার সভ্যতা সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞান ও কলাকৃষ্টির কতটুকু পরিচয় আমরা জানি? যুগে যুগে যত দেশ ও জাতির উত্থানপতন হয়েছে, যত ধর্ম উঠেছে, যত ধ্যানী জ্ঞানী ও মনস্বীর সাধনা দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে রূপ নিয়েছে, কিংবা কাব্য নাটক উপন্যাসে অথবা নৃত্য রীতি, গীত রীতি ও চিত্রকৃতিতে অভিব্যক্তি লাভ করেছে, কতটা তার বেঁচে আছে, কতটা খোয়া গেছে, তার সামগ্রিক ইতিহাস কারো জানা নেই। হাজার হাজার ভাষা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে রয়েছে মানুষের। তার মধ্যে প্রাগ্রসর ভাষার সংখ্যাই হবে প্রায় একশোটা। একজীবনে এর কটা শেখা সম্ভব? কাজেই তা থেকে নির্বাচিত মাত্র মুখ্য কয়েকটি ভাষার সাহিত্যই পর্যালোচনা করেছি আমি। আর তা করেছি মূলত ইংরেজী অনুবাদ, সংক্ষিপ্তসার, টীকা ভাষ্য ও সহায়ক গ্রন্থের সাহায্যে। কেন না তার বাইরে অন্য কোন ভাষার উপর দখল নেই লেখকের। সন্ধিৎসু সাধারণ পড়ুয়ার জন্যেই আমার এই ক্ষুদ্র আয়োজন। বিজ্ঞ বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত পড়ুয়াদের জন্যে বিদেশী ভাষায় বহু খণ্ডে বিভক্ত অনেক বড় বড় বই আছে। আছে এক খণ্ডের অনেক বৃহৎ বিদগ্ধ রচনাও। কিন্তু মাতৃভাষা মাত্র সম্বল যাঁদের, তাঁদের প্রবেশ পথ ত অবারিত নয় সংস্কৃতির সেই সব সাতমহলা প্রাসাদে। আমার এই সশ্রম প্রয়াস তাঁদের জন্যেই। তবে ভাবী কোন দিন অধিকতর অধ্যয়নশীল ও শ্রমনিষ্ঠ লেখক এই কাজে অগ্রসর হলে, হয়ত অপেক্ষাকৃত সহজেই একটা কিছু গড়ে তোলার মত কাঠামো হাতে পাবেন এই লেখা থেকে।

কিন্তু ও কথা থাক। যে পৃথিবীতে আমাদের বাস, তার বয়স আনুমানিক

সাড়ে তিনশো কোটি বছর হলেও, মানুষের বয়স কিন্তু এক লক্ষ বছরের বেশী নয়। আর এই এক লক্ষ বছরের মধ্যেও নব্বুই হাজার বছরই কেটেছে তার পশুর মত আহার অন্বেষণ, বংশবৃদ্ধি ও লড়াই করে। বাকী দশ হাজার বছরে সে শিখেছে আগুন জ্বালান, ধাতুদ্রব্য গলান, ঘরবাড়ী বানান, কৃষিকার্য করা, বন্য পশুকে পোষ মানান ইত্যাদি ইত্যাদি। এরই ক্রমিক পরিণতি রূপে এসেছে রন্ধন বয়ন লিখন ও বিবিধ শিল্পকর্ম। তারপর সম্পর্ক ও সম্পত্তি বোধ থেকে জন্মেছে সমাজ, আর সমাজের স্থিতি ও সমৃদ্ধির জন্যে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র। এর মধ্যে যথার্থ সভ্যতার জন্ম ঐ লিখন যুগ থেকেই এবং তা খুব বেশী হলে পাঁচ ছয় হাজার বছর আগে মানুষের আয়ত্তে এসেছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য মুল্লুক যেগুলি, যেমন আসিরিয়া ব্যাবিলন মিশর মহেঞ্জোদাড়ো, তারা পড়ে ঐ পাঁচ ছয় হাজার বছরের একেবারে আদিতে। অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক কালে। তারপরের ধাপে, অর্থাৎ ঐতিহাসিক কালে ওঠে ভারত, পারস্য, ইজরাইল, আরব, চীন, গ্রীস, রোম এবং সাম্প্রতিক সভ্য পৃথিবীর যা কিছু ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য, তার স্রষ্টা ও প্রচারক এরাই। বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত হোক, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মশাস্ত্র হোক, আবেস্তা বাইবেল কোরান হোক, আর হোমার ভার্জিল কালিদাস ভাস প্রমুখের রচনা হোক, সমস্তই লেখা হয়েছে এই সব মুল্লুকে এবং হয়েছে শুরু থেকে খ্রীষ্টের পরবর্তী পাঁচ ছশো বছরের মধ্যে। এই সময়ের মধ্যেই ইউরোপে আগে গ্রীকরা, তারপর রোমানরা তাঁদের বৃহৎ ভূমিকা অভিনয় করেন এবং পেগান সভ্যতার যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তা দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। উঠেছে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টান গির্জা এবং সমগ্র ইউরোপের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে নিজের রঙে রাঙিয়ে নিয়েছে। দুঃখের বিষয় রোমক সাম্রাজ্যের পতন হলে, উত্তর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বর্বর জাতিগোষ্ঠী এসে গোটা ইউরোপ তছনছ করে ফেলে এবং প্রায় হাজার বছর চলে সেই অন্ধকারের রাজত্ব। কোন মহৎ সাহিত্য শিল্প বা দর্শনই তৈরি হয়নি এই হাজার খানেক বছরে। উপরন্তু দফায় দফায় সম্মিলিত ইউরোপের সঙ্গে অগ্রসরমান ঐস্লামিক সাম্রাজ্যবাদের হয়ে চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ, যা ইতিহাসে ক্রুজেড নামে পরিচিত। তারপর পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে আবার ফুটল রেনেসাঁস বা নব জাগৃতির আলো। বিজ্ঞান কলাকৃষ্টি ও জীবন চেতনার উত্তাপে জেগে উঠল মানুষ। প্রকাশমান হতে লাগল দিকে দিকে ছোটবড় নগর রাষ্ট্র, যা রূপায়িত হল ধীরে ধীরে আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রায়তনগুলির

মূর্তিতে। সংহত হল ইউরোপীয় মাতৃভাষাগুলি এবং তাতে রচিত হতে লাগল নূতন কালের দর্শন ইতিহাস ও সাহিত্য। নূতন পৃথিবীর খোঁজে এশিয়া আফ্রিকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লেন ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর মানুষরা। এখান থেকেই আধুনিক ইউরোপের যাত্রা শুরু। তারপর ফরাসী বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব ও রুশ বিপ্লব তার জীবন ও মননকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। ইউরোপীয় সাহিত্য জন্মেছে এসবের মিলিত প্রভাবে। দান্তে শেকসপীয়ার মলেয়ার গ্যয়টে ও তলস্তয়ের সৃষ্টির ইমারত দাঁড়িয়ে আছে এই পটভূমির ওপর।

স্যাকসন নর্মান জুট কেল্ট ভাইকিং, নানা জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত ও নানা ভাষাভাষী ছোট বড় বহুদেশের সমাহার হলেও, আর তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বৈষম্য ও যুদ্ধ বিগ্রহের অন্ত না থাকলেও, ইউরোপের জীবন এবং মননে যে গভীর একাত্মতা দেখা যায়, গ্রীকো রোমক এবং খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতিই সেই অন্তঃপ্রবাহী ঐক্য সূত্রটি গড়েছে। সভ্যতার আদি জন্মভূমি এশিয়ার সাংস্কৃতিক পটভূমিতে কিন্তু এরকম একাত্মতা দুর্লভ। আজকের পশ্চিম এশিয়া মূলত সেমিটিক এবং ঐস্লামিক ও পূর্ব এশিয়া মুঙ্গল জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত দুনিয়া, আর দক্ষিণ হল প্রধানত আর্য-অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ের বাসভূমি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, একদা পশ্চিমের ইরাণে উঠেছিল আহুর মাজদা উপাসক জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম, ইজরাইলে উঠেছিল জেহোভা-উপাসক ইহুদী ধর্ম, জুডিয়ায় জন্মেছিল খ্রীষ্ট ধর্ম, আর আরবে ইসলাম ধর্ম। পরবর্তীকালে ইরাণীরা স্বভূমি থেকে উৎখাত হয়ে ভারতে এসেছেন। ইহুদীরা ছড়িয়ে পড়েছেন ইউরোপের নানাদেশে। খ্রীষ্টধর্ম ব্যাপ্ত হয়েছে ইউরোপে। চীনে কংফুৎস প্রচারিত সর্বাত্মধর্ম এবং লাউৎজে প্রচারিত তাওধর্ম বহু কালাবধি যথাক্রমে উত্তরে ও দক্ষিণে সজীব থেকেছে, তারপর ভারত থেকে প্রবাহিত বৌদ্ধধর্ম গিয়ে তাদের সঙ্গে সমন্বয়িত হয়েছে। জাপানে শিন্টোধর্ম একক প্রভুত্ব করেছে বহুদিন, তারপর জাপান অংশত স্বাগত করেছে বৌদ্ধধর্মকে। ভারতে আর্য দ্রাবিড়ে সংঘাত ও সমন্বয়ের পর খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দ নাগাদ তৈরি হয়েছে হিন্দুধর্ম, তারপর উঠেছে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম, যা হিন্দু ধর্মেরই প্রশাখা স্বরূপ। অবশেষে ১২ শতকে এসেছে ইসলাম এবং হিন্দু বৌদ্ধ ইসলাম পরস্পর বিচ্ছিন্ন তিনটি ধারাই সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে, কোন সমন্বয়িত একাত্মতা গড়ে ওঠেনি। বিশাল এশিয়ার অপরাপার মুল্লুকগুলি, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েৎনাম, সিংহল, কোন না কোন ভাবে চৈনিক ভারতীয় ও

আরব্য প্রভাবেই সংহত হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে গ্রীক হূণ শক তুর্কী-মুঙ্গল আফগান, নানা জাতির সামরিক অভিযান হয়েছে এশিয়ার নানা অঞ্চলে। হয়েছে বৌদ্ধ ইসলাম ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের অভিযান। হয়েছে পশ্চিমী সাম্রাজ্য ও ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের পরিব্যাপ্তি

এশিয়ার সাহিত্যে তাই কোন কেন্দ্রানুগ একাত্মতা দেখা যায় না, যদিও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যেকটি সাহিত্যেই সৃষ্টি হতে দেখি পর্যাপ্ত ঐশ্বর্য, যার ধারা অব্যাহত থেকেছে প্রাক মধ্যযুগ পর্যন্ত। তারপরে আবার নব জীবনের স্পন্দন এসেছে এশিয়ার সাহিত্যে, উনিশ শতকে প্রতীচ্য প্রভাবে। সারা আফ্রিকায় লিখিত সাহিত্য প্রথম জন্মায় প্রতীচ্য জাতিগুলির সংস্রবে আসার পর এবং তার ভাষা হয় ফরাসী, নয় ইংরেজী। তবে মাসাই বান্টু হটেনটট প্রভৃতি জাতির লোকসাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ, যার পরিচয় ক্রমশ উদঘাটিত হচ্ছে এশিয়া ইউরোপে। অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতির সাহিত্য প্রকৃত পক্ষে ইংরেজী সাহিত্যের প্রতিফলিত দ্যুতিস্বরূপ, বৈশিষ্ট্য বা নিজস্বতা সামান্যই আছে তাতে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাষা ইংরেজী হলেও, তার সাহিত্য ইংরেজী সাহিত্যের অনুবৃত্তি বিশেষ নয়। উনিশ শতক থেকেই তা মার্কিনী স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি সাহিত্যিক কম ওঠেন নি আমেরিকায়। ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত কানাডায় সাহিত্য সামান্যই হয়েছে। স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ ভাষাভাষী দক্ষিণ আমেরিকায় দু-দশজন মহান লেখক দেখা দিলেও, সমগ্রভাবে দক্ষিণী দেশগুলির সাহিত্যিক দানও নগণ্য। প্রধানত বণিক ভূস্বামী ও জঙ্গীসর্দার ঔপনিবেশিকদের দেশে সজীব সংস্কৃতি জন্মাবে কি করে?

তিন ॥ সভ্যতার আলোকস্তম্ভ : ভাষা ॥

মুখের আওয়াজ ও অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে মনোভাব প্রকাশে অভ্যস্ত আদিকালের মানুষের মুখে কবে অর্থবহ ভাষা এসেছিল, কবে সেই ভাষাকে সে বিধিবদ্ধ হরফের মাধ্যমে স্থায়িত্ব দিতে শিখেছিল, তা কারোরই জানা নেই। প্রত্নেতিহাসবিদরা কতকগুলি অনুমান করেছেন মাত্র, যা থেকে ধরা হয় যে আগে গাছপালা নদী পাহাড় জল মাটি ও জীবজন্তুর পরিচয়ক কতকগুলি শব্দ অর্থাৎ বিশেষ্য পদ তৈরি হয়েছিল। তারপর সেই সব বিশেষ্যের গুণ বা বৈশিষ্ট্যবোধক শব্দ অর্থাৎ বিশেষণ পদ তৈরি হয়েছিল। ক্রমে এসেছিল বিভিন্ন কাজের পরিচায়ক শব্দ অর্থাৎ ক্রিয়াপদ। বিশেষ্যের বিকল্পরূপে সর্বনাম এবং ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞাপক ক্রিয়াবিশেষণ সৃষ্টি হয়েছিল তারপর, উত্তরোত্তর মনোভাব প্রকাশে নতুন নতুন শব্দ উদ্ভাবনের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। যে কোন ভাষার উৎপত্তি পুষ্টি ও সম্প্রসার হয়েছে মোটামুটি এই ধারা ধরে, যদিও জিনিসটা একই সময়ে একই স্থানে হয়নি এবং কোন একজন দুজনের চেষ্টাতেও হয়নি। বিভিন্ন আদি গোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ভূত হয়ে যাযাবর শিকারীরূপে যাত্রা শুরু করেছে। তারপর এক এক গোষ্ঠী এক এক জায়গায় স্থিতিশীল হয়েছে এবং আগুন জ্বালানর, ঘরবাড়ী তৈরির এবং কৃষিকার্য ও পশুপালনের পদ্ধতি শিখেছে। ক্রমে তার মধ্যে এসেছে সম্পর্ক, সম্পত্তি ও সংস্কার। অর্থাৎ সমাজবোধ গড়ে উঠেছে। ভাষা সম্ভবত মানবেতিহাসের যাযাবর অধ্যায় শেষ হবার পর সৃষ্টি হয়েছে এবং তা হয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে। লেখা এসেছে ভাষা জন্মানর অনেক পরে, কারণ আগুন আবিষ্কারের পর লেখা আবিষ্কারই হল আরণ্যক মানুষের সভ্য মানুষে বিবর্তিত হবার দ্বিতীয় ধাপ। ভাষা এবং লেখাই মানুষকে যুক্ত করেছে মানুষের সঙ্গে।

ভাষার উদ্ভব ও প্রসার সম্পর্কীয় আনুমানিক সিদ্ধান্তের কথা বলা হল। এবার প্রশ্ন উঠবে, পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা কোনটি বা কোনগুলি। এ প্রশ্নের উত্তরও জানা নেই কারো। প্রাচীনতম বর্ণমালার নিদর্শন যা খুঁজে পাওয়া

গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায়, তার মধ্যে অগ্রগণ্য হল পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের বাণমুখো লিপি, মিশর থেকে পাওয়া হায়ারোগ্লিফিক বা চিত্রলেখন এবং মহেঞ্জোদাড়ো ও হরাপ্পায় পাওয়া শীলমোহরে উৎকীর্ণ লিপি। এই শেষোক্ত শীলমোহরও সবই পোড়ামাটির চাক্তি। এর মধ্যে আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় লিপির এবং মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধার হয়েছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। সিন্ধু অর্থাৎ হরাপ্পা লিপি এখনো অপঠিতই রয়েছে। কিন্তু এই যে সুপ্রাচীন লিপির নিদর্শনগুলি, এর কোনটাই পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছরের বেশী পুরান নয়। ধরে নেওয়া যাক যে এইসব ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল আরো তিন চার পাঁচ হাজার বছর আগে। তাহলে পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলির বয়স দাঁড়াচ্ছে বড় জোর হাজার দশেক বছর। মানুষের হোমোসেপাইন বা মনুষ্যরূপে আবির্ভাবের অন্যূন লক্ষ বর্ষব্যাপী ইতিহাসে এই ঘটনা মাত্র সেদিনের ব্যাপার নয় কি? আজও পৃথিবীতে সুপ্রাচীন যে ভাষাগুলির নিদর্শন আছে, যেমন বৈদিক সংস্কৃত, জেন্দ বা আভেস্তার ভাষা, হিব্রু, গ্রীক, লাতিন, তার কোনটারই তিন সাড়ে তিন হাজার বছরের বেশী পুরান লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এরা সবাই সিন্ধু সুমের ও মিশর লিপিতে অনুলিখিত ভাষাগুলির অনুজ। লক্ষণীয় যে এদের অনেক পরে উদ্ভূত বহু ভাষারও পাঠোদ্ধারের চাবিকাঠি হারিয়ে গেছে, যার ফলে ঐ সব ভাষার লিখিত নিদর্শনগুলি আজ পর্যন্ত পড়া সম্ভব হয়নি। মধ্য আমেরিকার মায়া লিপি, মেক্সিকোর ইনকা ও আজতেক লিপি এখনো হেঁয়ালি হয়ে রয়েছে সভ্য মানুষের কাছে। আমাদেরও ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন প্রিন্সেপ, তা না হলে সাঁচিস্তূপের ফটকে এবং অশোক স্তম্ভে কি লেখা আছে, তা আমরা হয়ত জানতেই পারতাম না। এই হল সংক্ষেপে পৃথিবীর লিখিত ভাষাগুলির গোড়ার ইতিহাস। এ ছাড়া আছে বহু কথ্যভাষা, যার কোন বর্ণমালা নেই, ব্যাকরণ নেই। লিখিত ও কথিত মানব ভাষার মোট সংখ্যা প্রায় দু-হাজার বলে ধরা হয়।

সবশেষে আসছে আজকের জীবন্ত ভাষাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্ন। এক সময় মনে করা হত, পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলি সবই এক আদি উৎস থেকে উঠেছে। এটা মনে করার কারণও ছিল। উনিশ শতকে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা যখন প্রথম সংস্কৃত চর্চা শুরু করেন, তখন তাঁরা দেখলেন, গ্রীক লাতিন ফার্সি ও সংস্কৃতের মধ্যে শব্দ সম্ভার এবং ব্যাকরণ বিধিতে আশ্চর্য

একটি প্রাণগত ঐক্য রয়েছে। এ থেকেই একটি মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সম্পর্কীয় ধারণার সৃষ্টি হয়। ব্যাপকতর অনুসন্ধান ও পরীক্ষণের পর এই ধারণার আংশিক সততা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজ। দেখা যাচ্ছে ভারতীয় ইরাণীয় গ্রীক লাতিন টিউটনিক কেলটিক ও স্লাভনিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলো সত্যিই এক উৎস থেকে উঠেছে। আজ আমরা কে না জানি যে ভারতবর্ষের মুখ্য ভাষাগুলি সবই উঠেছে সংস্কৃত প্রাকৃত উৎস থেকে, যেমন পহলবী [জেন্দ] ফার্সি ও পুসতু ভাষা উঠেছে ইরাণীয় উৎস থেকে? ইউরোপের প্রধান ভাষা-গুলির মধ্যে ইতালিয়ান ফরাসী স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ উঠেছে লাতিন থেকে। ইংরেজী জার্মান ডাচ ড্যানিশ ও নরওয়েজীয় উঠেছে টিউটনিক থেকে। আইরিশ ও ওয়েলসীয় ভাষা উঠেছে কেলটিক থেকে। আর রুশ চেক পোলিশ ও বালগেরিয়ান উঠেছে স্লাভনিক থেকে। কিন্তু এখানেই ত সভ্য পৃথিবীর ভাষাপঞ্জী শেষ হল না। এর পরও আছে হিব্রু আরবী ও সিরীয় ভাষা, যা উঠেছে সেমিটিক উৎস থেকে। আছে চীনা জাপানী ভাষা, আফ্রিকার সোয়ালী ভাষা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ছোট বড় আরো কিছু কিছু ভাষা। তাহলেই দেখা যাচ্ছে একটি নয়, গোটা তিন চার আদি উৎস আছে, যা থেকে পৃথিবীর বেশীর ভাগ ভাষারই জন্ম হয়েছে। ভাষা-প্রবাহিনীর এই শতমুখী ধারা ধরে কটা ভাষার মূলে পৌছাতে পারি আমরা? কটা ভাষার শব্দসম্ভার ও রীতি প্রকৃতি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি? স্বভাবতই সর্বাধিক প্রচারিত ও সার্বভৌম ভাবে অধীত ও কথিত একটা দুটো ভাষার সহায়তাতেই বিশ্বের এই বৃহৎ ভাষা পরিবারের ইতিবৃত্ত সন্ধান করতে হয় আমাদের। আপাতত সে রকম ভাষা হল ইংরেজী, যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত তা ছিল ফরাসী, যে জন্যে সর্বজনবোধ্য ভাষাকে এখনো বলা হয় লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা।

২.

ভাষা আবিষ্কারের অনেক পরে লেখা আবিষ্কৃত হয়, আর লেখা আবিষ্কারের অনেক পরে জন্মায় সাহিত্য। আসলে সাহিত্য হল মানব মনের সুপরিণত চিন্তা আবেগ ও কল্পনার অভিব্যক্তি। তাই মানুষের যাযাবর অধ্যায় থেকে সভ্যতার অধ্যায়ে উন্নীত হবার আগে কোন সাহিত্য রচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। হয়ে থাকলেও হয়ত প্রবাদ প্রবচন আপ্তবাক্য ছড়া রূপকথা ইত্যাদি

মুখে মুখে তৈরি হয়েছে এবং এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়েছে তা পারিবারিক উত্তরাধিকার রূপে। সজাগ ভাবে মানুষ গান বেঁধেছে, কবিতা লিখেছে, কাব্য কাহিনী রচনা করেছে, নৈতিক অনুশাসন ও আচরণ বিধি ব্যাখ্যা করে, ঈশ্বর জগৎ জীবন ও জন্মমৃত্যুর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে শাস্ত্র গ্রন্থাদি লিখেছে, ইতিহাস লিখেছে, দর্শন ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে সন্দর্ভাদি লিখেছে, যখন সে সমাজবদ্ধ সভ্য ও শিষ্ট প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। অবশ্য জন্মলগ্নে সব সাহিত্যই ছিল মৌখিক, তারপর ক্রমশ তারা পেয়েছে লেখ্যরূপ। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন যা এ পর্যন্ত মানুষের হাতে এসেছে, তার কোনটাই তাই হাজার পাঁচেক বছরের বেশী পুরাতন নয়। মিশরীদের মৃতের পুঁথি, আসিরীয়দের গিলগামিস মহাকাব্য, বৈদিক আর্যদের বেদ, ইরাণীয়দের আবেস্তা, ইহুদীদের বাইবেল প্রাচীন পুঁথি ও তার তালমুদ নামক ভাষ্যগ্রন্থ, সব কিছুরই রচনাকাল এই সময় সীমার মধ্যে আবদ্ধ। এর মধ্যে মৃতের পুঁথি, গিলগামিস ও বাইবেল দূর অতীতেই লেখ্যরূপ পেয়েছিল। মিশরীয়েরা প্যাপিরাসে, আসিরীয়েরা মৃত্তিকা ফলকে এবং ইহুদীরা চামড়া থেকে তৈরি পার্চমেণ্টে স্থায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের এইসব আদিকালের সাহিত্য প্রয়াসকে। এ থেকে অনুমান করা হয় যে অক্ষর ও লিখন বিদ্যা তাঁরাই আগে আবিষ্কার করেছিলেন। ভারতীয় ও ইরাণীয়েরা কিন্তু দীর্ঘদিন যথাক্রমে বেদ ও আভেস্তা মুখে মুখে বহন এবং পুরুষানুক্রমে বিতরণ করে গেছেন। এই জন্যই বেদের অপর নাম হল শ্রুতি। প্রকৃতপক্ষে যে দেবনাগরী হরফে আজ বৈদিক ও বেদোত্তর কালের সংস্কৃত ভাষা লেখা হয়, তা ভারতের প্রাচীনতম বর্ণমালা নয়। আদিকালের বর্ণমালা আমাদের কি ছিল, হরাপ্পা শীলমোহরে উৎকীর্ণ বর্ণমালার সঙ্গে তাদের কোন গোত্র সম্পর্ক আছে কিনা, তা অদ্যাবধি জানার সুযোগ হয়নি মানুষের।

নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, মানুষ তার আদিম আরণ্যক জীবনে যখন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাস করত, তখন পাখীর গান শুনে, হরিণ ময়ূর প্রভৃতির নৃত্য দেখে, তারই অনুকরণে সে নৃত্যগীত অভ্যাস করে। যেমন সকাল সন্ধ্যায় গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ ও বসন্তে পৃথিবীর রূপ বদল দেখে, অথবা মানুষ ও জীবজন্তুর বিচিত্র আকার ও অঙ্গভঙ্গী দেখে সে অভ্যাস করে গিরিগাত্রে ধাতু ফলকে কাঠ ও হাড়ের ওপর রেখায় রঙে সে সবের প্রতিরূপ আঁকতে। এইভাবেই নাকি গোড়ায় জন্মেছে মানুষের নৃত্যগীত ও চিত্রবিদ্যা।

আর গানের প্রয়োজন থেকেই নাকি ক্রমে তার মনে জেগেছে কবিতা রচনার আগ্রহ। সুরের আরোহ অবরোহ থেকে শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করার জন্যে বিশেষ পদ্ধতিতে সে কথার পর কথা সাজিয়েছে। তারপর সেই কথায় আগে অর্থ, তারপর আবেগ ও অনুভূতি সংযোজন করেছে। অর্থাৎ গান থেকেই উঠেছে কবিতা, যেমন নৃত্য থেকেই উঠেছে নাটক। আর দুয়েরই উদ্ভব হয়েছে ধর্মায়তন থেকে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, সভ্যতার শৈশবে লিখন পঠন যেহেতু ছিল পুরোহিত রাজন্যবর্গ ও অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ, তাই আদিকালের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁরাই এবং তাঁরাই করেছেন নৃত্য গীত ও নাটকেরও পৃষ্ঠপোষকতা। তার মানে দেবায়তন ও রাজসভাই হল প্রাচীনতম নাট্যকলা ও সাহিত্যের সূতিকাগার। এ কথা যে অযথার্থ নয় তা বোঝা যায় প্রত্নেতিহাসের গোড়ার পর্বটি অনুসন্ধান করলেই। বিভিন্ন মুল্লুকে বিভিন্ন দেবদেবীর তর্পণ ও প্রতিবোধনে যেসব পূজো বা যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত, তাতে গাওয়া হত ছন্দোবদ্ধ নানা স্তোত্র ও বন্দনা গান, করা হত রকমারি নৃত্যানুষ্ঠান। এইসব স্তোত্র ও বন্দনাই পরে গ্রথিত হয়েছে মৃতের পুঁথিতে, নয়ত বেদ আবেস্তা ও বাইবেলের মহাসঙ্গীতে। আর এইসব মূক নৃত্যানুষ্ঠানকেই পরে মুখর করা হয়েছে পাত্রপাত্রীর সংলাপে গেঁথে, কোন না কোন পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে। তাই হল আদি নাটকের পটভূমি, যা পরে বিস্তার লাভ করেছে। এ ছাড়া রাজা রাজন্যবর্গ ও যোদ্ধাদের আকাঙ্ক্ষিত বীরগাথাও রচিত হত এবং তা গ্রামে নগরে গায়করা গেয়ে বেড়াতেন। গিলগামিস মহাকাব্য এই শেষোক্ত জাতের রচনা এবং এরই বিলম্বিত ধারা রক্ষা হল রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড ওডেসী। হয়ত এই রকম স্তোত্র সাহিত্য ও বীর কাহিনী আরো অনেক লিখিত হয়েছিল, মহাকালের প্রবল স্রোতে যা ভাসতে ভাসতে বিস্মৃতির অতলে তলিয়েছে। কারা এইসব সঙ্গীত নাটক ও কাব্য কাহিনীর রচয়িতা ছিলেন, কতদিন আগে এসবের জন্ম, তা কারো জানা নেই। আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণে এদের যে বয়স নির্ধারিত হয়েছে, তাতে খ্রীষ্ট জন্মের তিন হাজার বছর আগে পর্যন্ত বড় জোর পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কোন কোনটাকে।

এখানে বলে রাখা দরকার যে আজকের নিরিখে যে শ্রেণীর রচনাকে আমরা বিশুদ্ধ সাহিত্য বলি, আদিকালের কোন রচনাই তা ছিল না। তাতে কাব্যগুণ যেমন থাকত, তেমনি তার সঙ্গে থাকত মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক ম্যাজিক। থাকত

জীবন ও জীবিকা সংক্রান্ত রকমারি আদেশ নির্দেশ, যুদ্ধ বিগ্রহ ও কামকলা বিষয়ক নানা প্রসঙ্গ এবং অধুনা বিস্মৃত বিভিন্ন রাজকুল ও পুরোহিত কুলের নীরস বংশতালিকা। অর্থাৎ তা একই সঙ্গে ছিল সাহিত্য ও শাস্ত্র, তার মানে লিটারেচার ও লিটার্জি দুইই। এর কারণও ছিল। সাহিত্য তখন ছিল হস্তলিখিত পুঁথি বা পাণ্ডুলিপিতে বন্দী এবং সীমিত সংখ্যক মানুষ ছাড়া তা পড়তেই পারতেন না কেউ। জনগণের মধ্যে গানের আকারে তা ছড়ান হত, নয়ত নাটক আকারে প্রদর্শিত হত। তাই একাধারে রসবস্তু, তত্ত্বকথা ও প্রমোদ পরিবেশন করা হত সাহিত্যের ভিতর দিয়ে। লোকশিক্ষা সমাজ শাসন ও নীতি নিয়ন্ত্রণ এই জন্যেই সাহিত্য কর্মের অনুষঙ্গ বলে গণ্য করা হত। সাহিত্যের এই মিশ্র ভূমিকা অপরিবর্তিত ছিল প্রায় মধ্যযুগ পর্যন্ত এবং তা ছিল পৃথিবীর সমস্ত দেশেই। তারপর সামাজিক শ্রমবিভাগের মত জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্যেও এল শ্রমবিভাগ এবং তখনই ভাবের সাহিত্য ও বিষয়ের সাহিত্য দুই পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে গেল সাহিত্য কর্ম। ছাপাখানা আবিষ্কার ও জনশিক্ষা প্রসারের ফলে ইউরোপে এটা সম্ভব হয়েছিল যত তাড়াতাড়ি, এশিয়ায় হয়ত তা হয়নি। তবে যাত্রা পাচালী ও কথকতার মাধ্যমে সাহিত্য পরিবেশন করা হত বলে, প্রাচ্য দুনিয়ার মানুষও ক্রমশ যেমন রসোপভোগের সঙ্গেই শ্রেয় জ্ঞান আহরণে অভ্যস্ত হন, রচয়িতারাও তেমনি বোদ্ধা ও নিবিষ্ট শ্রোতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাহিত্যের নানা বিভাগ পৃথক পৃথক ভাবে সৃষ্টি করতে আগ্রহী হন। এই জন্যেই দেখি বেদ উপনিষদ সূত্র রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদির পর সংস্কৃত ভাষায় কাব্য নাটক ও কথাসাহিত্যের প্লাবন এসেছে ভারতবর্ষে। তা থেকেই ক্রমে সংস্কৃত প্রাকৃত-সম্ভূত একালীন ভারতীয় ভাষাগুলি মাথা তুলেছে এবং বিচিত্র সাহিত্য সম্ভার যেমন দিনে দিনে তাদের ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে, মানুষকেও তেমনি সেকাল থেকে তা একালের পথে নিয়ে এসেছে। ঠিক একই ভাবে ইউরোপেও রেনেসাঁস এনেছে যে নতুন জীবন চেতনা, তার প্রভাবে সঞ্জীবিত হয়েছে ইতালীয়ান ফরাসী স্প্যানিশ ইংরেজী ও জার্মান ভাষাগুলি এবং তারা যে নূতন সাহিত্য সম্পদ বিতরণ করেছে, তা থেকেই যাত্রা শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতির।

চার ॥ বিশ্বসাহিত্যে অনুবাদের ভূমিকা ॥

অনুবাদের পথে কোন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হলে, সেই সাহিত্যের অন্তর্লোককে কদাই ছোঁয়া সম্ভব হয়, এই কথা বলেন পণ্ডিত জন। তাঁরা বলেন, এক ভাষার চিন্তা কল্পনা অনুভূতি ও স্বপ্ন আর এক ভাষার আবরণে পুরোপুরি ব্যক্ত করা যায় না, কারণ প্রত্যেক ভাষার শব্দ সম্ভার আশ্রয় করে লোকমনে বিশেষ বিশেষ চিত্রপ্রতীক ও ভাবব্যঞ্জনার একাধিপত্য থাকে, যা ভাষান্তরিত করা সম্ভব নয়। কাজেই মোটা বক্তব্যটা হয়ত আনা যায় অনুবাদে, কিন্তু সূক্ষ্ম রসাবেশটুকু যা ষোলআনাই ভঙ্গীনির্ভর, খোয়া যায় ভিন্ন ভাষার পোশাকে আবৃত হলে। অর্থাৎ ভাষান্তরিত রচনা হল কাচের আধারে রক্ষিত মধুর মত। চোখে দেখা গেলেও বোতলের গা চেটে তার আস্বাদ কি করে পাবেন? কথাটা হয়ত মিথ্যা নয়, বিশেষ করে কবিতা সম্বন্ধে এ কথা ত খুবই প্রণিধানযোগ্য। তবু অনুবাদ ছাড়া উপায় কি আছে সম্বিৎসু মানুষের? এক জীবনে কটা ভাষা শেখা সম্ভব? কিন্তু ঐশ্বর্য ত আছে সব ভাষার ভাণ্ডারেই, যার প্রধান প্রধান নিদর্শনগুলোর সঙ্গে মোলাকাত ভিন্ন খাঁটি অর্থে শিক্ষিত বলে পরিগণিত হওয়ার দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই। বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত কালিদাস ভবভূতি কৌটিল্য ও বাৎস্যায়নের সঙ্গে ইউরোপের মানুষ পরিচিত হতেন কি করে, ইংরেজী ফরাসী বা জার্মান একটা কোন নিজেদের ভাষার অনুবাদ হাতে না পেলে? কি করে বাইবেল কোরান আভেস্তা তালমুদ পড়তেন, পড়তেন হাফেজ সাদী ওমর খৈয়াম প্রমুখের লেখা? আমরা এশিয়ার মানুষরাই বা কি করে পড়তাম এইসব জিনিস? কি করে পরিচিত হতাম হোমার ঈস্কাইলাস ভার্জিল দান্তের সঙ্গে? ইংরেজী ফরাসী ও জার্মান না জানা মানুষরা কি করে পড়তেন শেকসপীয়ার মলেয়ার ও গ্যয়টের রচনা? অর্থাৎ অনুবাদের অসম্পূর্ণতা মেনে নিয়েও, এ কথা বলতেই হবে যে একদেশ থেকে আর একদেশের মনোলোকে পৌছতে মাঝখানে পড়ে যে দুস্তর ভাষা সমুদ্র, তা পারের একমাত্র উপায় হল অনুবাদ এবং এটা মানুষ বুঝতে শুরু

করে মধ্যযুগ থেকেই। তাই সব দেশে সব ভাষাতেই তখন থেকে অনুবাদকে মর্যাদার সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

একথা বোধ হয় না বললেও চলবে যে শুধু সৃষ্টিমূলক সাহিত্য, কাব্য নাটক উপন্যাস ও ছোটগল্প পড়ার জন্যেই অনুবাদ অত্যাবশ্যক নয়। অনুবাদ প্রয়োজন জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলী অনুধ্যানের উপায় হিসাবেও। বরং সেটাই হল বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নিত্য যে সমস্ত মূল্যবান বই পুঁথি প্রকাশিত হচ্ছে, হচ্ছে দর্শন ইতিহাস অর্থনীতি রাজনীতি ও কলাকৃষ্টির নানা বিভাগে, তার প্রধান প্রধান অংশকে স্ব-স্ব মাতৃভাষার অবরোধ ভেঙে অন্যান্য ভাষার ভাণ্ডারে নিয়ে আসা ভিন্ন মানব জাতি সমগ্রভাবে কোন দিনই সমৃদ্ধ হতে বা জ্ঞান ও কর্মের পথে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। এই জন্যেই সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশিষ্ট প্রবক্তারা বলেন, মধ্যযুগের শেষদিকে যখন থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ভারত চীন ও আরব পারস্যের দর্শন ধর্মশাস্ত্র গণিত এবং কাব্য ও কথাসাহিত্য ইউরোপে এসে পৌঁছায় এবং অনুবাদ ও অনুসরণের মাধ্যমে তা প্রতীচ্যের বিদ্বৎ সমাজে ব্যাপ্ত হতে শুরু করে, তখন থেকেই তত্রত্য মানুষের মনে প্রাচ্য দুনিয়া সম্বন্ধে একটি ধারণা দানা বাঁধতে থাকে। উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত পঞ্চতন্ত্র হোক, আভেস্তা কোরান ও বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র হোক, আর কংফুৎস লাউৎজে আভিসেনা এভেরেস প্রমুখের বই পুঁথি হোক, ইউরোপ এশিয়ার মধ্যে তখনি অলক্ষ্যে একটি মৈত্রীর সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে থাকে। তারপর এল সাম্রাজ্য ও ঔপনিবেশিক সম্প্রসারের যুগ এবং এশিয়া আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূভাগে ইউরোপীয় মানুষরা চেপে বসলেন প্রশাসক বণিক ও শিক্ষা বিধাতা রূপে। তখন একদিকে যেমন প্রাচ্য সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পূর্ণ পরিচয় ব্যাপ্ত হল ইউরোপে, অন্যদিকে তেমনি ইউরোপের দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস এবং সাহিত্যও এল প্রাচ্য ভুবনে। তখন থেকে আমরা ভারতবাসীরা একাগ্রনিষ্ঠায় পড়ছি দেকার্ত স্পীনোজা লাইবেনিজ কাণ্ট হেগেল ডারউইন লামার্ক হার্বার্ট স্পেন্সার মার্ক্স এঙ্গেলস ফ্রয়েড আইনস্টাইন রাসেল হোয়াইটহেড স্পেংলার কিয়ের্কেগার্ড ম্যাক্সপ্লাঙ্ক রাদারফোর্ড। এক কথায় ইউরোপীয় মনীষার প্রতিনিধি স্থানীয় সকলের রচনাবলী। ওঁরাও পড়েছেন বেদান্ত সাংখ্য বৈশেষিক, পড়েছেন রামায়ণ মহাভারত গীতা, তিরুকুরল গ্রন্থসাহেব তুলসী রামায়ণ। অথবা বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী রচনাবলী। অনুবাদ ছাড়া এই বিরাট আদান প্রদান সম্ভব হত কি করে?

কিন্তু অনুবাদের ঐশ্বর্যে ইংরেজী ফরাসী জার্মান ও রুশ ভাষা যত সমৃদ্ধ, ভারতবর্ষ চীন জাপান ও মধ্যপ্রাচ্যের কোন ভাষা কি ধারে কাছেও পৌঁছায় তার? বলা বাহুল্য এ প্রশ্নের উত্তর নৈরাশ্যব্যঞ্জক। আমাদের মাতৃভাষা বাংলার কথাই ধরুন। কোন যথার্থ সন্ধিৎসু ব্যক্তি যিনি শুধু বাংলাই জানেন, অন্য কোন ভাষা জানেন না, তিনি যদি সভ্যতার যাত্রাপথে যুগে যুগে মনুষ্য-জাতি যত জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্পদ দিয়েছেন, যত বিচিত্রধারায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তার মোটামুটি পরিচয় লাভ করতে চান, তাহলে পারবেন কি বেশী দূর সাফল্যের সঙ্গে আগুয়ান হতে? কে না জানেন যে, বেশী ত নয়ই, সামান্য পথও পৌঁছে দেবার সম্বল নেই আমাদের ভাষায়। বলে দিতে হবে না যে এ জন্যে বিচ্ছিন্নভাবে লেখক ও প্রকাশক সমাজকে দায়ী করে লাভ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত এবং পরিচালিত সর্বভারতীয় একটি অনুবাদ সংস্থা যদি থাকত এবং তাঁরা ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি যদি অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বে প্রচার করতেন আমাদের দূতাবাসগুলির মাধ্যমে এবং বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধ্যান ধারণার সম্পদগুলি পূর্বাপর ধারাবাহিকতায় তুলে ধরতেন আমাদের সামনে, অগ্রণী ভারতীয় ভাষাগুলিতে প্রামাণ্য অনুবাদ-মাধ্যমে, একমাত্র তাহলেই এ কাজ যথোচিতভাবে হতে পারত। দুঃখের বিষয় সে পথে আমাদের চিন্তা অদ্যাবধি নিয়োজিত হয়নি, আর তা হয়নি বলেই ইংরেজীর প্রয়োজন এখনো অপরিহার্য হয়ে রয়েছে আমাদের দেশে, আন্তর্জাতিক বিদ্যা বৈদগ্ধ্য আহরণের চাবিকাঠি রূপে। এই চাবি হাতছাড়া করলে আমরা অকূল সমুদ্রে পড়ব। অবশ্য সবশেষে বক্তব্য যে অনুবাদ কর্ম শুধু ভাষান্তর বিধান নয়, যেন তেন প্রকারে এক ভাষার বক্তব্য অন্য ভাষায় আমদানিতেই তার দায়িত্ব খতম হয় না। অনুবাদকেও প্রকাশ ও প্রসাধন সৌকর্যে সাহিত্য হয়ে উঠতে হবে। ইংরেজী বাইবেলে আমরা যে প্রাঞ্জলতা ও শৈল্পিক অনুপমতা দেখি, গ্রীক নাট্য-সাহিত্যের অনুবাদে গিলবার্ট মারের, ফরাসী কবিতার অনুবাদে সাইমনসের এবং তলস্তয় রচনাবলীর অনুবাদে মড দম্পতির যে বলিষ্ঠতা ও স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হতে দেখি, তাই হল অনুবাদের আদর্শ। অবশ্য চিকিৎসা মনস্তত্ত্ব অর্থনীতি পদার্থবিদ্যা বা গণিত গ্রন্থের অনুবাদে এই শ্রেণীর শিল্প সুষমা প্রত্যাশিত নয়, কিন্তু তাও সরল ও সুখপাঠ্য হওয়া চাই।

পাঁচ ॥ বিশ্বের পুরানো বইগুলি ॥

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাচীনতম লেখার নিদর্শন যা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়েছে ও হচ্ছে, তার অনেকটুকুই প্রচলিত অর্থে যে শ্রেণীর রচনাকে আমরা আজ সাহিত্য বলি, তা নয়। তার ভেতর রাজা ও রাষ্ট্রনায়কদের প্রশস্তি আছে, জনগণের উদ্দেশে প্রচারিত রাজকীয় ঘোষণা আছে, ধর্ম কর্ম ও আচার সংস্কার সংক্রান্ত বিবিধ বিধি-বিধান আছে, আছে গ্রহ নক্ষত্র কৃষিকার্য ওষুধ ও দৈনন্দিন কৃত্যাকৃত্য সম্বন্ধীয় বিচিত্র তত্ত্ব ও তথ্যের নির্দেশ। অবশ্য বিশুদ্ধ সাহিত্যও আছে, যার মধ্যে পাওয়া যায় বিভিন্ন দেব দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত স্তোত্র ও বন্দনা গান, পাওয়া যায় জীবন ও জন্ম মৃত্যুর রহস্য নিয়ে রচিত টুকরো কবিতা এবং সুপ্রাচীন কালের কোন যুদ্ধ বা দিগ্বিজয় সম্পর্কীয় দীর্ঘ কাব্যগাথা। বর্তমান নিবন্ধে আমরা এই শেষোক্ত পর্যায়ের রচনাগুলি নিয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করব। আমরা জানি সিন্ধু তীরবর্তী মহেঞ্জোদাড়োতে, নীলনদ বিধৌত মিশরে এবং তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস বেষ্টিত মেসোপটেমিয়ায় [পরবর্তী কালের আসিরিয়া ও ব্যাবিলনে] মানুষ সভ্যতার আলো জ্বেলেছিল। এর মধ্যে মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত বর্ণমালা এখনো পড়াই যায়নি, তাছাড়া সেখান থেকে কোন সাহিত্য নিদর্শনও পাওয়া যায় নি। কিন্তু মিশর আসিরিয়া ও ব্যাবিলনে শুধু সাহিত্যই পাওয়া যায়নি, যে সাহিত্য পাওয়া গেছে, তা সজীব ও সুন্দর এবং বেশীর ভাগই সুপরিণত সভ্যতার স্বাক্ষর বহন করে। পিরামিডের গর্ভে রক্ষিত প্যাপিরাসে লেখা মিশরীদের যে দ্য বুক অব দ্য ডেড বা মৃতের পুঁথি পাওয়া গেছে, তার বয়স পাঁচ হাজার বছর ত বটেই, আরো বেশীও হতে পারে। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দে রচিত এই সংকলনের কবিতা এবং গানগুলিতে একদিকে যেমন পার্থিব জীবনের আনন্দ বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অপরূপ অভিব্যক্তি দেখা যায়, অন্যদিকে তেমনি পাওয়া যায় মরণোত্তর আর একটি মহত্তর জীবনের বার্তাও। আদি দেবতা আমন রা এবং অসিরিস আইসিস প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত এইসব স্তোত্রের অনেকগুলিতে বৈদিক স্তোত্রাদির ধরণটি লক্ষ্য করার মত। এই পিরামিড

সাহিত্য ছাড়াও প্রাচীন মিশরে অন্য নানা শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হয়েছে, যার মধ্যে আনপু ও বাট্টু নামক দুই ভাইয়ের গল্প, মন্দিরে অভিনয়ের জন্য রচিত দিব্যদৃষ্টি লাভ বিষয়ক নাটকের খণ্ডিতাংশ এবং কিছু সংখ্যক প্রেম কবিতা অনুবাদের মাধ্যমে আজকের মানুষের হাতে এসেছে। বলা বাহুল্য এ সবই সম্ভব হয়েছে, শাঁপলিয়ঁ নামক ফরাসী পণ্ডিত মিশরী হায়ারোগ্লিফিক বা চিত্রলিপি পড়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন বলে।

মিশরী সাহিত্যের মতই আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের সাহিত্যও পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্যের তালিকাভুক্ত এবং একই রকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এরও অনেকটাই সম্রাট আসুর বনিপালের পাঠাগার থেকে আবিষ্কৃত। পোড়া মাটির ফলকে উৎকীর্ণ কিউনিফর্ম বা সূচীমুখ লিপিতে লেখা গিলগামিস মহাকাব্যটি এর মধ্যে সবচেয়ে গণণীয়। এছাড়া এখানেও পাওয়া গেছে আনু এনলিল প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত বন্দনা গান এবং বেশ কিছু সংখ্যক লৌকিক প্রেম সঙ্গীত, যার একটিতে ঋগ্বেদে গ্রথিত যম যমীর কাহিনীর মত ভ্রাতাভগিনীর অজাচারী প্রেমের অকুণ্ঠ প্রকাশ নজর করার মত। গিলগামিস মহাকাব্য অলৌকিক ঘটনা সম্বলিত প্রাচীন বীরগাথা হলেও, তার অন্তর্লোকে নিহিত আছে নিগূঢ় একটি রূপক, যা হোমারের অন্যূন দেড় হাজার বছর এবং বেদের এক হাজার বছর আগের অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের মানুষ ভাবতে পেরেছিলেন। উরুক দেশের রাজা গিলগামিস ও তাঁর সুহৃদ এনকীডু বের হলেন অমৃতের সন্ধানে। বিশাল এক বৃষরূপী অসুর শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে এনকীডুর মৃত্যু হল। গিলগামিস কিন্তু পৃথিবীর অন্তর্লোকে যেতে এবং উতনাপিস্তিমের সহায়তায় মৃত্যু বিজয়ী ওষধি সংগ্রহ করে আনতে পারলেন। এই লতার সাহায্যে সমস্ত আত্মীয় বন্ধু ও প্রিয় পরিজনদের অমরত্বে উন্নীত করবেন ভাবলেন তিনি। কিন্তু এক ঝরনার ধারে এটি রেখে জল খেতে গেলেন যেই, ইতিমধ্যে এক সাপ এসে এটি গলাধঃকরণ করে ফেলল। এই কাব্যের বক্তব্য বোধ হয় এই যে মৃত্যু জীবনের অনতিক্রমণীয় পরিণতি এবং মানুষ তার সংগ্রাম ও তপস্যা দিয়ে যত পথই অগ্রসর হোক, শেষ মুহূর্তে তাকে পরাভব মানতেই হবে। মানব জাতির এই আদি মহাকাব্যে এমন কতকগুলি প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতে মহাপ্লাবনের যে কাহিনী আছে, তার সঙ্গে বাইবেলে বর্ণিত নোয়ার প্লাবনের এবং শতপথ ব্রাহ্মণে মনুর প্লাবনের আশ্চর্য মিল দেখা যায়।

গিলগামিসের প্রেতলোক যাত্রার সঙ্গে অডেসী বর্ণিত ইউলিসিজের হেডস যাত্রার এবং রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্রের প্রেতপুরী ভ্রমণের কাহিনীর যে মিল দেখা যায়, তাও কম লক্ষণীয় নয়। দান্তের প্রেতপুরী ভ্রমণের কথাও মনে করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। তাছাড়া পাপরূপী সাপের ধূর্ততায় মানুষ অমরত্বের অধিকারে বঞ্চিত হল, এ থেকেই কি বাইবেলে শয়তান বেশী সাপের কাহিনী পরিকল্পিত হয়নি? এই বাণমুখো লিপি পড়ার কৌশল আবিষ্কার করেন রলিনসন নামক ইংরেজ পণ্ডিত। সভ্যতার শৈশবে যখন মানুষের নৈতিক বোধ আজকের মত ছিল না, জগৎ ও জীবনের বহু রহস্যই ছিল তার কাছে অনাবিষ্কৃত, সেই সময় মিশর ও মেসোপটোমিয়ায় মানুষ এমন উন্নত জাতের সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন, এ কম বিস্ময়ের কথা নয়। একই রকম বিস্ময়কর হল আমাদের বেদ, যার কথা এবার বলা হচ্ছে।

নৈষ্ঠিক সমাজ বেদকে ঈশ্বরের মুখে নিঃসৃত নিত্যকালের বাণী বলে গণ্য করলেও এবং তাকে সাহিত্যের কোঠায় এনে বিচারের পক্ষপাতী না হলেও, আমরা সাহিত্য হিসাবেই দেখব বেদকে। চার বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই প্রাচীনতম এবং তার বয়স মোটামুটিভাবে খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দ থেকে ধরা হয়। পরবর্তী দুটি বেদ, সাম ও যজু, খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যেকার রচনা এবং অথর্বও প্রায় ঐ সময়েরই সংগ্রহ। এর ভেতর ঋগ্বেদে আছে বিভিন্ন নিসর্গ দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত স্তোত্র ও বন্দনা গান। সাম বেদে সন্নিবিষ্ট হয়েছে এইসব গানেরই গায়ন পদ্ধতি, আর ঋজু ও অথর্বে যথাক্রমে যাগযজ্ঞ ও অভিচার, অর্থাৎ মারণ উচাটন ইত্যাদির প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। এই শেষোক্ত কারণে অথর্বকে অনেকে প্রাগার্যদের বেদ বলে মনে করেন এবং বলেন, আর্য অনার্যে সংমিশ্রণের পর অথর্ব কুলীন বেদের পদবী লাভ করেছে। বস্তুত একথার কোন ভিত্তি আছে কিনা, তা এখনো প্রমাণিত হয়নি। আদিম সমাজে যাগযজ্ঞ ও ম্যাজিক পরস্পরের পরিপূরক ছিল যেহেতু, সেই হেতু একই আর্যগোষ্ঠীর বেদও হতে পারে অথর্ব। তবে পরবর্তী কালের তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে মিল দেখে প্রাগার্য একটি উৎসের কথাও ভাবা যেতে পারে অথর্ব বেদের। বৈদিক ধর্মে আদিতে বহু দেবদেবী ছিল এবং সব দেবতাই প্রায় তাঁদের পিতৃ-দেবতা ছিলেন। পরে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এক পরম দেবতার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই পরম দেবতাই উপনিষদে এসে ব্রহ্ম হয়েছেন। বেদের স্তোত্রগুলো গীতিকবিতা হিসাবে মিশরী ও আসিরীয় নিসর্গ গীতিগুলির মতই

সরল সুন্দর ও কাব্যগুণ সম্পন্ন। কিন্তু পরবর্তী কালের পুরোহিত মণ্ডলী বিভিন্ন বেদকে বেষ্টন করে সূত্রগ্রন্থাদি লিখে, তার মধ্যে জটিল নানা দার্শনিক তত্ত্ব প্রক্ষেপ করেছেন। তার ফলেই বেদভিত্তিক বিরাট এক সাহিত্য বলয় সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যাখ্যাত্মক রচনাবলীর মধ্যে উপনিষদ কাব্যগুণে অবশ্যই সুন্দর এবং বেদাশ্রিত হলেও, তা নিজস্ব ভাবেই একটা সাহিত্য পর্যায় রূপে গ্রহণীয়। কিন্তু সূত্রগ্রন্থগুলি একমাত্র পণ্ডিতী বিচারের জন্যে পঠনীয় হলেও, সাধারণ নরনারীর তাতে আগ্রহান্বিত হবার বিশেষ কিছু নেই। বৈদিক কবিতায় আদিকালের যাযাবর মানুষ যাঁরা মধ্য এশিয়ার ভল্গা তীর থেকে উত্তর ভারতে আসেন, তাঁদের জীবন ও মননের ছবি ফুটেছে। তবে মিশরী সাহিত্য গোল করে পাকান প্যাপিরাসে এবং আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সাহিত্য পোড়া মাটির চাক্তিতে খোদিত আকারে পাওয়া গেলেও, বৈদিক সাহিত্য কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত মুখে মুখেই বেঁচে থেকেছে। মধ্যযুগে প্রথম তাদের লিখিত রূপ দেওয়া হয় যখন, তখন বৈদিক হরফ হারিয়ে গেছে। সে-জন্যেই দেবনাগরী হরফ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২.

এবার বলব জেন্দাভেস্তার কথা। আভেস্তা বৈদিক আর্যদের জ্ঞাতি জ্যোতি উপাসক পারসিকদের আদি গ্রন্থ। জোরোয়াস্তার বা জরথুষ্ট্র তাঁদের আদি আচার্য এবং নৈষ্ঠিকরা মনে করেন, আভেস্তা স্বয়ংপ্রকাশ ঐশীবাণী, যার সংগ্রাহক হলেন জরথুষ্ট্র। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই আলোচনায় আমরা বেদের মত আভেস্তাকেও সাহিত্য হিসাবেই দেখব। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ অব্দে অর্থাৎ বুদ্ধের সমসাময়িক কালে জরথুষ্ট্রের জন্ম বলে ধরা হয়। কাজেই আভেস্তার বয়স আড়াই হাজার বছরের বেশী নয়। বাইবেলের প্রাচীন বিধান বা ওল্ড টেষ্টামেণ্ট এর চেয়ে নিঃসন্দেহে অনেক আগের রচনা, তবু বেদের সহধর্মী এবং বৈদিক আর্যদেরই এক শাখার সৃষ্টি বলে, আমরা আভেস্তার কথাই প্রথমে বলছি। আভেস্তা মোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যশ্ন বন্দিদাদ গাথা বিস্পারদ ও খোরদা। চারটি ভিন্ন ভিন্ন শাখা যেমন একযোগে বেদের দেহায়তন গঠন করেছে, এই পাঁচটি বিচ্ছিন্ন শাখাও তেমনি একযোগে তৈরি করেছে আভেস্তার কলেবর। এসবের মধ্যে আছে যজ্ঞ ও পূজা বিধি, আছে জগৎ জীবন ও জন্মমৃত্যুর তত্ত্ব নিয়ে নানা প্রসঙ্গ, আর আছে প্রার্থনা ও স্তোত্র। এই শেষোক্তগুলি গাথা

নামে পরিচিত। সংখ্যায় মোট ছয়টি গাথার এই অংশটাই জরথুষ্ট্রের রচনা বলে গৃহীত। বস্তুত রচনা যাঁরই হোক, ছন্দে ও সুরে তালে যেমন, বক্তব্যে তেমনি, এরা বৈদিক স্তোত্রের খুবই কাছাকাছি যায়। মনে করলে ক্ষতি নেই যে একই মূল উৎস থেকে উভয়ের উৎপত্তি। তবে প্রত্যয় ও আচরণবিধিতে জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম ও বৈদিক ধর্মে মিলের চেয়ে গরমিলই বেশী। তাঁরা মঙ্গলের প্রতীকরূপী জ্যোতির্ময় অহুর মাজদা ও অমঙ্গলের প্রতিভূরূপী অহ্রিমান দুইয়ের যুগপৎ অস্তিত্বে বিশ্বাসী। বিশ্বের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত ভালমন্দ ও শুভাশুভ যা কিছু হচ্ছে, সবই হচ্ছে উভয়ের পারস্পরিক সংঘাতের ফলে। প্রজ্ঞার শক্তিতে পাপের অন্ধকার অপসারিত করে আলোর স্বর্গে উপনীত হলেই হয় মুক্তি, অর্থাৎ মাজদার সান্নিধ্য লাভ। ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে অবিরাম সংঘাতে ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং মুসলমানরাও বিশ্বাসী। স্বর্গ নরকের পরিকল্পনাতেও তাঁরা অভিন্ন। হিন্দুদের সঙ্গে গরমিলের কথা অবশ্য সকলেরই সুবিদিত। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে হিন্দুদের অসুর দানব শক্তির প্রতিভূ, কিন্তু জরথুষ্ট্রীয়দের অহুর বা অসুর পরম কারণিক পরমেশ্বর। যাই হোক জেন্দ বা পহলবী ভাষায় রচিত আভেস্তার গাথাগুলি আর্তি আকুলতা ও আত্মসমর্পণের গাম্ভীর্যে অনুপম কবিতা সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্যান্য অংশে কাব্যের চেয়ে তত্ত্ব বস্তুই বেশী এবং তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে পণ্ডিতরা প্রচুর মাথা ঘামিয়েছেন, ঠিক বৈদিক ভাষ্যকারদের মতই।

অতঃপর আসছে বাইবেল। গোড়াতেই বলা দরকার যে বাইবেল একখানি বই নয়, তা হল একগুচ্ছ বইয়ের সংগ্রহ এবং দীর্ঘ সময় ধরে তার রচনা ও গ্রন্থনার কাজ চলেছে। এর মধ্যে ওল্ড টেষ্টামেণ্ট বা প্রাচীন বিধান হল ইহুদী-দের আদি গ্রন্থ এবং তা লেখা হয়েছিল হিব্রু ভাষায়। আর নিউ টেষ্টামেণ্ট বা নববিধান হল খ্রীষ্টানদের আদিগ্রন্থ এবং গোড়ায় তা লেখা হয়েছিল গ্রীকে। কিন্তু যেহেতু ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের উৎপত্তি একই উৎস থেকে এবং একই সৃষ্টিতত্ত্ব ও বংশবৃত্তান্তে উভয়ে বিশ্বাসী, তাই পরবর্তীকালে দুই পর্যায়ের রচনাকে এক গ্রন্থপরিবারে বাঁধা হয়েছে। এর মধ্যে প্রাচীন বিধান খ্রীষ্টের অন্যূন এক হাজার বছর আগে রচিত হয়, আর নববিধান লিখিত হয় খ্রীষ্টের ক্রুশাবসানের পর, এক থেকে তিনশো বছরের মধ্যে। প্রাচীন বিধানে ইতিহাস পুরাবৃত্ত ধর্মতত্ত্ব নীতিকথা অনেক কিছুর সমাবেশ হলেও, সাহিত্য সম্পদে তা সত্যিই খুব উন্নত। তার ভেতর আশ্চর্য হৃদয়াবেগ সমৃদ্ধ গল্প আছে, নাটকীয়

সংঘাতময় কাহিনী আছে। অনুপম সঙ্গীত ও গীতিকবিতা আছে। স্যামসন রুথ ও জোসেফের গল্প বহু কবিতা নাটক ও উপন্যাসের অনুপ্রেরণা স্বরূপ হয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। সলোমনের প্রেমসঙ্গীতের এবং সামস বা বন্দনা গীতির সঙ্গে সুফী ও বৈষ্ণবদের রচনার তুলনা করেছেন বহুজন। প্রবাদ প্রবচন সংগ্রহের অনেক উক্তিও ভাসতে ভাসতে বহুদূর পর্যন্ত চলে এসেছে। তাছাড়া মহাপ্লাবন কাহিনী এবং স্বর্গোদ্যানে সাপরূপী শয়তানের ইভকে পথভ্রষ্ট করার কাহিনীর সঙ্গে গিলগামিস কাব্য কাহিনীর আংশিক মিল যেমন দেখা যায়, তেমনি যায় আভেস্তা বর্ণিত মঙ্গল ও অমঙ্গলকারী দুই শক্তির নিরন্তর সংঘাতের সঙ্গে বাইবেলে উপস্থাপিত ঈশ্বর ও শয়তানের নিত্য দ্বন্দ্বের কল্পনাতেও কিছুটা সাদৃশ্য। নব বিধান সাহিত্য গৌরবে এত উন্নত নয়। তাছাড়া তা খ্রীষ্টের জীবন কাহিনী ও খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যানেই বেশী মনোনিবেশ করেছে। এই গ্রন্থমালা ম্যাথু মার্ক লুক ও জন প্রমুখ প্রথম আমলের খ্রীষ্টানুরাগীদের লেখনী নিঃসৃত বলে কথিত হলেও, অলৌকিকতা বর্জিত প্রামাণ্য ইতিহাস নয় কোন গ্রন্থটিই, আবার প্রাচীন বিধানের পেণ্টাটিউক নামক প্রথম গ্রন্থ পঞ্চকের, অর্থাৎ জেনেসিস, এক্সোডাস, লেভিটিকাস, নাম্বার্স ও ডিউ টেরেনমির মত প্রাণবন্ত সাহিত্যিক রচনাও নয়। তাই অখ্রীষ্টানদের অধিকতর আকর্ষণ দেখা যায় প্রাচীন বিধানের প্রতি। অবশ্য বৈদিক সূত্র গ্রন্থগুলোর মত তালমুদ নামক প্রাচীন বিধানের, যে বিশাল ভাষ্য রচনা করে যান ইহুদী আচার্যেরা তা প্রাচুর্য ও দুর্বোধ্যতা, দুই কারণেই শিক্ষিত ইহুদীদেরও টানতে পারেনি বিশেষ। তালমুদ গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের মধ্যে রচিত হয় এবং তারপর আরো যে সব ভাষ্য রচিত হয় এবং যা ডেড সী স্ক্রল বা মৃত সমুদ্রে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি নামে প্রকাশিত হয়েছে, তার অনেকটাই ইহুদী ধর্মতত্ত্ব ও জীবন দর্শনের মূল্যবান ব্যাখ্যা রূপে যেমন, অতুলনীয় প্রত্নসামগ্রী রূপে তেমনি সর্বত্র আদৃত হয়েছে।

বাইবেলের পর আলোচ্য কোরান প্রসঙ্গ। কোরান ইসলামের আদিগ্রন্থ এবং প্রায় দেড় হাজার বছর আগে, প্রভু মোহম্মদের জীবনান্তের পর, তিনি জীবন কালে যে প্রত্যাদেশগুলি লাভ করেছিলেন, তা এতে তাঁর শিষ্য ও অনুগামীদের দ্বারা সংকলিত হয়। ১১৪টি সুরা বা অধ্যায়ে বিভক্ত আরবী ভাষায় রচিত এই গ্রন্থে ইতিহাস ধর্মতত্ত্ব সমাজনীতি লৌকিক আচরণবিধি অনেক কিছুর সঙ্গেই স্থান পেয়েছে দান উপবাস প্রার্থনা ও পাপপুণ্য সম্পর্কীয় নানা তত্ত্বকথা। ইহুদী

ও খ্রীষ্টধর্মের মতই ইসলাম রোজকেয়ামতে বিশ্বাসী এবং এক ও অদ্বিতীয় আল্লা তার মতে যেমন অন্যায়ের অধিশাস্তা, তেমনি সৎকার্যের পুরস্কারদাতা। ইসলাম জন্মান্তর মানে না, তার মতে মৃত্যুর পর সবাই কবরে শুয়ে থাকে কল্পান্ত অবধি। তারপর রোজকয়ামতের দিন জেগে ঈশ্বরের সামনে এসে দাঁড়ায় কৃতকর্মের প্রাপ্য নেবার জন্যে। তখন পুণ্যবানের জন্যে নির্ধারিত হয় অক্ষয় স্বর্গ, আর পাপীর জন্যে অনন্ত নরক। রাজনীতিক ও সামাজিক দর্শনে ইসলাম তার পূর্ববর্তী অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ঢের বেশী আধুনিক এবং তা হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কারণ বুদ্ধ ও জরথুষ্ট্র জন্মেছিলেন খ্রীষ্টের ছশো বছর আগে এবং মোহম্মদ জন্মেছিলেন ছশো বছর পরে। তাই পূর্বের ধর্মমতগুলি জীবন ও কর্মের যে যে বিভাগে আলোকপাত করেছিল, তিনি তারপরও অনেক দূর অগ্রসর হতে পেরেছেন। তাই আত্মা পরমাত্মা বা মোক্ষের সূক্ষ্মতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামানর চেয়ে পার্থিব শ্রী-শৃংখলা শান্তি ও কল্যাণের উপরই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। ফলে, তাঁর প্রচারিত ধর্মমত এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূমিভাগে ব্যাপ্ত হয়েছে। স্পর্শ করেছে তা ইউরোপকেও। কিন্তু ও কথা আমাদের বর্তমান আলোচনায় গৌণ। এখানে কোরানকে আমার নেবো সাহিত্য গ্রন্থ রূপে। তা নিলেও দেখি কোরান অতি বলিষ্ঠ পদ্য ও ছন্দায়িত গদ্যের স্বাক্ষর বহন করে। বাইবেল প্রাচীন বিধানে মোজেসকে প্রদত্ত ঈশ্বরের দশবিধ প্রত্যাদেশ যেমন প্রাঞ্জলতার গুণে প্রসিদ্ধ, বহু দেববাদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে হজরত নবীকে প্রদত্ত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশও তেমনি বা তার চেয়েও প্রসিদ্ধ। নারীর প্রতি মানবিক কর্তব্য সম্বন্ধে কোরানে যে আয়াৎটি আছে, তার অনুরূপ মহান উক্তি বোধ হয় পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্যে কমই মিলবে। কোরানের পরিপূরক রূপে প্রচারিত হাদিশের কথাও একটু বলা দরকার। আধ্যাত্মিক সামাজিক ও নৈতিক কৃত্যাকৃত্য সম্বন্ধে কোরানের আদেশ নির্দেশ যা সর্বজনবোধ্য আকারে ব্যাখ্যা করেছিলেন স্বয়ং প্রভু মোহম্মদ, তাই গ্রথিত হয়েছে এতে তাঁর প্রয়াণের পর। তাই হাদিশই হল কোরানের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য ভাষ্য এবং অদ্যাবধি তার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রয়েছে মুসলীম সমাজে। বিশ্বের সব চেয়ে প্রাচীন ও সর্বসম্মানিত ছ-খানি পুস্তকের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। এর মধ্যে এক গিলগামিস মহাকাব্য ছাড়া সবগুলিই এক সঙ্গে ধর্ম ও সাহিত্য গ্রন্থ এবং সবগুলিরই বিশদ ও বিস্তৃত টীকা-ভাষ্য লিখিত হয়েছে পরবর্তীকালে।

ছয়॥ গ্রীক সাহিত্য ॥

পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এশিয়া আফ্রিকাতেই যে প্রথম সভ্যতার আলো জ্বলেছিল এবং ধর্ম সংস্কৃতি ও শিল্প সাহিত্যের পথে মানব প্রতিভার প্রথম বিকাশ হয়েছিল, একথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। এবার তাকান যাক ইউরোপের দিকে। ইজিয়ান সাগর তীরবর্তী ক্ষুদ্র দেশ গ্রীসে প্রথম হয়েছিল ইউরোপীয় সভ্যতার অরুণোদয়, খ্রীষ্টের প্রায় আটশো বছর আগে এবং একটানা তিন চার শো বছরে সেখানে দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য ও কলাকৃষ্টির যে বিশাল ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়েছিল, তারই প্রভাবে আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছিল ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বনিয়াদ। কিন্তু পাঁচশো বছরের বেশী স্থায়ী হয়নি গ্রীক সভ্যতার গৌরব। তারপর মাথা তোলে রোম এবং তার সভ্যতা যদিও মূলত গ্রীক সভ্যতার ছাঁচ ধরেই গড়ে উঠে, তবু ইউরোপ ও এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূমিভাগ যেমন আসে তার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে, তেমনি বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প বাণিজ্যেও তার ভূমিকা হয় রীতিমত গণনীয়। রোমক সভ্যতার শেষ ধাপে ওঠেন যীশু খ্রীষ্ট এবং রোম অধিকৃত পশ্চিম এশিয়ায় তাঁর জন্ম হলেও, তাঁর ধর্ম ব্যাপ্ত হয় ইউরোপে। তাঁর ক্রুশাবসানের অল্প পরে এবং রোমক সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রীষ্টান হবার ফলেই খ্রীষ্টধর্ম সর্বত্র ব্যাপ্ত হয় রাজধর্মরূপে। কিন্তু রোমক সভ্যতাও পাঁচ ছশো বছরের বেশী সগৌরবে টিঁকে থাকে নি। উত্তর ইউরোপ থেকে আগত বর্বর জাতিদের আক্রমণে তা তছনছ হয়ে যায়। এরপর ৬ শতকে শার্লেমাঁ একটা নকল রোমক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন বটে, কিন্তু তাও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এই হল আদি খ্রীষ্টীয় ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে অগ্রসরমান মুসলীম সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার যে বহুদিনব্যাপী যুদ্ধ হয়, ইতিহাসে তারই নামে ক্রুজেড। ক্রুজেডে সম্মিলিত ইউরোপের জয়ই তাকে প্রথম আত্মস্থ হতে সাহায্য করে। কিন্তু সে ইউরোপ ছিল সামন্ত প্রভু ও গির্জাধীশ পাদ্রী শাসিত সংস্কৃতি বর্জিত মুল্লুক। এই অন্ধকারের রাজত্ব একাদিক্রমে সাত আটশো বছর অব্যাহত থাকে। তারপর ১৫ শতকে আসে নব জাগরণ বা রেনেশাঁস। মানুষ নতুন

করে গ্রীকো-রোমক সভ্যতার মধ্যে জীবনের বাণী খুঁজে পায় যেমন, তেমনি খ্রীষ্টবাণীরও নতুন তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে থাকে। এর ফলে একদিকে সাহিত্যে ও কলা কৃষ্টির রাজ্যে আসে সৃষ্টির জোয়ার, অন্যদিকে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের চেতনা জাগ্রত হয়। দিগ্বিজয়ের নেশা অধিকার করে মানুষের মন। নতুন ইউরোপ জন্মগ্রহণ করে, আর এখান থেকেই হয় ইতালীয়ান ফরাসী স্প্যানিশ ইংরেজী জার্মান প্রভৃতি একালীন ইউরোপীয় সাহিত্যের যাত্রা শুরু, যার অগ্রগতি আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে এবং সমগ্র মানবজাতিকেই যা প্রভাবিত করেছে বিশেষ ভাবে। এর আগের অধ্যায়ে পথ-প্রদর্শকরূপে দাঁড়িয়ে আছে গ্রীক সাহিত্য আর রোমানদের সৃষ্ট লাতিন সাহিত্য, যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবো এবার। বলা দরকার যে গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের উৎস থেকেই জন্মেছে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও জীবন চর্যার মূল কাঠামোটি এবং তার জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধ্যান ধারণার গোড়ার ভিত্তি। কাজেই তার পরিচয় জানা চাই ভাল করে, ইউরোপীয় সাহিত্য জানার জন্যেই।

আমাদের সংস্কৃতের মত গ্রীক ভাষাতেও দর্শন ইতিহাস গণিত জ্যোতিষ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে যেমন অনেক মূল্যবান বই লেখা হয়েছে, তেমনি লেখা হয়েছে মহাকাব্য গীতিকাব্য নাটক এবং উপকথাও। সাধারণ ভাবে এর সবটুকুই যদিও সাহিত্য নামের অধিকারী, তবু সাহিত্য বলতে প্রকৃত পক্ষে আমরা বুঝি প্রাণধর্মী রচনা এবং এখানে সেই শ্রেণীর রচনার কথাই বলব আমরা। গ্রীক ভাষার প্রাচীনতম লেখক হলেন হোমার, যাঁর ইলিয়াড ও ওডেসী মহাকাব্য দুটির কাহিনীর সঙ্গে কমবেশী সকলেরই পরিচয় আছে। কিম্বদন্তী অনুসারে হোমার অন্ধ ছিলেন এবং নাকি শহরে গ্রামে স্বরচিত কাব্য গাথা গান করে অন্ন সংগ্রহ করতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন অঞ্চলের মানুষ বা কবেকার মানুষ, তা কারো জানা নেই। দুখানি মহাকাব্য একই লোকের লেখা কি না তা নিয়েও তর্ক আছে। মোটামুটি ভাবে তাঁকে খ্রীষ্টের আটশো বছর আগের মানুষ বলে ধরা হয়। হেলেন হরণ ও ট্রয়ের যুদ্ধ নিয়ে লেখা হয় ইলিয়াড এবং যদিও আদিম সমাজোচিত লাম্পট্য ও দুর্নীতির ঘটনা দিয়ে তার সূচনা, তবু শৌর্য সত্যনিষ্ঠা এবং দেশপ্রেমের মহিমান্বিত প্রকাশ হয়েছে তাতে। ছয় মাত্রার বিলম্বিত লয়বিশিষ্ট সুরেলা ছন্দ এবং জমজমাট গাম্ভীর্যময় বর্ণনাও তার প্রধান বিশেষত্ব। ওডেসীর মধ্যে পাওয়া যায় মনোরম একটি গার্হস্থ্য প্রসন্নতার ছবি, যা ইলিয়াড থেকে স্বতন্ত্র। এলিজাবেথীয় যুগে ইংরেজ কবি

চাপম্যান হোমারের মহাকাব্য দুটির যে অনুবাদ করেন, বহু কালাবধি তাই ছিল মানুষের প্রধান আশ্রয়। অষ্টাদশ শতকে তারপর পোপ করেন বই দুটির অনুবাদ। এখন গদ্যপদ্য বহু নূতন অনুবাদ হয়েছে হোমারের।

হোমারের সমসাময়িক কালে বা অল্প পরেই ওঠেন কবি হেসিয়ড। তাঁর ওয়ার্কস এণ্ড ডোজ বা কাজ ও সময় নামক কাব্যে আছে ঋতু বৃত্তান্ত এবং চাষ-বাসের প্রসঙ্গ, যা ছন্দে লিখিত হলেও কাব্য নয়। এরপর খ্রীঃ পূঃ ৬ অব্দে পরের পর দেখা দেন তিনজন কবি, যাঁরা সত্যিকার মহৎ কবি। এঁরাই লেখেন গীতিকবিতা, যা লায়ার বা বীণা সহযোগে গাওয়া হত বলেই লিরিক নামে অভিহিত হত আদিতে। এঁরা হলেন স্যাফো, এলকিয়াস ও এনাক্রিয়ন। স্যাফো, লেসবস দ্বীপের বিখ্যাত মহিলা কবি, যাঁর নামে সমকামিতার অভিযোগ আছে, যা থেকে লেসবিয়ানিজম কথাটার উৎপত্তি। এলকিয়াস তাঁর প্রতিবেশী এবং অনেকে বলেন তাঁর এক সময়ের প্রেমিক। এঁরা দুজন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মত শুধুই প্রেমসঙ্গীতের রচয়িতা। আর এনাক্রিয়ন গেয়েছেন সুরার গান, অনেকটা হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের মত। এর মধ্যে স্যাফো ও এলকিয়াসের কবিতা প্রায় সবই লুপ্ত হয়েছে, যৎসামান্য ভগ্নাংশ যা পাওয়া গেছে, তা থেকেই তাঁদের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করা হয়। গ্রীক ভাষায় লিরিক ছাড়া অন্য জাতের খণ্ড কবিতাও লেখা হয়েছে অনেক। তার মধ্যে ওড বা প্রশস্তি, এলিজি বা শোক গাথা এবং প্যাষ্টোরাল বা পল্লী সঙ্গীত হল প্রধান। ওড লেখক পিণ্ডার, এলিজি লেখক বিয়ন ও মস্কাস এবং প্যাষ্টোরাল লেখক থিওক্রিটাস বিশেষ প্রসিদ্ধ, যদিও বিশ্ব বন্দিত নন কেউ তাঁরা, স্যাফো এলকিয়াস বা এনাক্রিয়নের মত। সবাই তাঁরা খ্রীঃ পূঃ ৩০০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ২৫০ এর মধ্যে জীবিত ছিলেন এবং উনিশ শতকে ইংরেজ রোমাণ্টিক কবিদের হাতে অনূদিত হয়ে তাঁদের কবিতা আমাদের কাছ পর্যন্ত চলে এসেছে। এছাড়া গ্রীসে আরো ছোট বড় অনেক কবি ওঠেন নানা সময়ে। তাঁদের রচনা একত্র করে সুপ্রাচীন কালেই একখানি এন্থলজী বা কাব্যসংকলন তৈরি হয়, যার মধ্যে অনেক অসাধারণ কবিতা পাওয়া যায়।

কাব্য ও কবিতার মত নাটকেও গ্রীকরা ছিলেন অসাধারণ। পৃথিবীতে তাঁরাই বোধ হয় প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও অভিনয় যোগ্য নাটক লেখেন। ডায়োনিসাস দেবতার উৎসবে মুখোস পরে নৃত্যগীত করতেন তাঁরা। তা থেকেই ক্রমে পালা লেখা শুরু হয় এবং তা বিশেষ বিশেষ পর্বে মঞ্চে অভিনীত হতে থাকে।

ট্রাজেডী বা বিষাদান্ত এবং কমেডী বা মিলনান্ত দুরকম নাটকই তৈরি হয়েছে তাঁদের হাত দিয়ে। নাটকে দুটি, বড় জোর তিনটি চরিত্র আনতেন তাঁরা এবং আমাদের সাবেকী যাত্রায় যেমন সশরীরে বিবেক বা নিয়তির আবির্ভাব হত, কোন দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের ভেতরকার তত্ত্বটি তুলে ধরতে, ওঁরা তেমনি আনতেন কোরাসকে। সে এসে ঘটনার পরিণাম নির্দেশ করত। তিনজন প্রসিদ্ধ ট্র্যাজেডী লেখক জন্মান গ্রীসে: ঈস্কাইলাস [খ্রীঃ পূঃ ৫২৫—৪৫৬], সোফোক্লিস [খ্রীঃ পূঃ ৪৯৫—৪০৬], আর ইউরিপিডিস [খ্রীঃ পূঃ ৪০০—৪০৭] এবং এঁরা পরের পর বহু নাটক রচনা করেন, যার সামান্যই হাতে পৌঁছেছে আজকের মানুষের। ঈস্কাইলাসের প্রধান বইয়ের নাম বন্দী প্রমিথিয়াস। প্রমিথিয়াস স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে আনেন মানুষের জন্যে। এর দণ্ড হিসাবে দেবতাদের আদেশে তাঁকে সীথ মরুভূমিতে এক পাহাড়ে শৃংখলিত করে রাখা হয়। একদিকে লোকহিতে মানুষের স্বাধীন প্রয়াস, অন্যদিকে নিয়তির নিষ্ঠুর বিধান, দুইয়ের দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন তিনি এতে অতুলনীয় কাব্যের ভাষায়। এছাড়া পারসিকরা, থিবসের বিরুদ্ধে সাতজন এবং তিন খণ্ডে বিভক্ত অরেষ্টিয়া নাটক লেখেন তিনি।

সোফোক্লিস তাঁর অল্প পরবর্তী। মানুষের স্বাধীন প্রয়াসের ওপর নিয়তির অলঙ্ঘ্য প্রতিপত্তি তিনিও চিত্রিত করেছেন তাঁর নাটকে এবং কাব্যভাষা তাঁরও অপূর্ব। আন্তিগোনে, ইলেকট্রা ও ঈডিপাস তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা। শেষোক্ত নাটকটিতে তিনি নিয়তির বিধানে অজাচারী মাতৃগমন ও তার দণ্ড কি নিদারুণ হতে পারে, তা দেখিয়েছেন। ঈডিপাস কুটৈষণার তত্ত্বটি মনোবিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়েছে একালে এই নাট্য-কাব্যের প্রভাবেই। তৃতীয় নাট্যকার হলেন ইউরিপিডিস। তিনি নেমিসিস বা নিয়তির প্রাধান্য মানেন নি। তাঁর ইফিগিনিয়া মিডিয়া প্রভৃতি নাটকে মানুষের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হিংসা দ্বেষ লালসা ও অবিবেচনারই ছবি ফুটেছে। জীবনের ভালমন্দ সব কিছুরই মূল নিহিত এসবের মধ্যে, এই হল তাঁর বক্তব্য। এই কারণেই তিনি একালীন পাঠকের বেশী কাছের মানুষ। কমেডী লেখক হিসাবে সর্বাধিক খ্যাত এরিষ্টোফিনিস [খ্রীঃ পূঃ ৪৫০—৩৮৬] এবং ভেকগণ ও মেঘ নাটকে সমসাময়িক কালের বিখ্যাত ব্যক্তিদের ওপর চূড়ান্ত ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছেন তিনি। প্রথমটিতে তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন ঈস্কাইলাস ও সোফোক্লিস, দ্বিতীয়টিতে সক্রেটিস। সমকালীন রাগ রোষ ও

বিরক্তির অভিব্যক্তি বইগুলিতে অনিবার্যভাবেই ছায়াপাত করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একই সঙ্গে হৃদ্য কৌতুকরস ও কাব্যগুণ বইগুলিকে একান্ত উপভোগ্য করেছে। গ্রীক ট্র্যাজেডী বৈচিত্র্যহীন একঘেঁয়েমির এবং নিয়তির অনতি-ক্রমণীয়তা সম্বন্ধে অন্ধ প্রত্যয়ের দরুণ অনেক সময় হয়ত একটু অসুখপাঠ্য মনে হয়। বিশেষ করে কোথাও অণুমাত্র হাসি বা তারল্যের ছোঁয়া না থাকাতেই বোধ হয় আরো এমনটা হয়। কিন্তু কমেডীতে তাঁদের কলম সত্যিই আকর্ষণীয় রসের সৃষ্টি করেছে। তাই ট্র্যাজেডী লেখক ত্রয়ের সঙ্গেই একত্র গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে আছেন এরিষ্টোফিনিস, যাঁর পূর্বোক্ত বই দুটির মত আর একটি বই হল শান্তি, যাতে এথেন্সের সমর-নায়কদের তিনি বিদ্রূপ করেছেন এবং যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি ও কল্যাণকেই জয়মাল্য দিয়েছেন।

২.

আগের অধ্যায়ে গ্রীকদের কাব্য কবিতা ও নাটক নিয়ে আলোচনা করেছি। তাঁদের গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধেও দু-চার কথা বলা দরকার, কারণ তাঁদের পাণ্ডিত্য ও মননশীলতা ফুটেছে সাহিত্যের এই বিভাগেই। দর্শনে হিন্দুরা তাঁদের চেয়ে প্রাচীন এবং গভীরতর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু ইতিহাসে তাঁরাই অগ্রগণ্য। পারস্য ও গ্রীসের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তার ইতিহাস লেখেন হেরোডোটাস [খ্রীঃ পূঃ ৪৮৪—৪১৮]। কিন্তু তাঁর রচনা লুপ্ত হয়েছে, শুধু তার কিছু অংশ পাওয়া গেছে পরবর্তীকালের লেখকদের বইপত্রে। তাতে সুমের ও ব্যাবিলনের পুরাবৃত্ত পাওয়া যায়। স্পার্টা ও এথেন্সের যুদ্ধ নিয়ে থুকিডিডিস লেখেন তাঁর পেলোপনিসিয়ার যুদ্ধকাহিনী নামক বই। ইনি হেরোডোটাসের অল্প পরের মানুষ। সক্রেটিস শিষ্য জেনোফোন [খ্রীঃ পূঃ ৪৩০—৩৫৪] হলেন আর একজন বিখ্যাত ইতিহাসকার। ঐ স্পার্টা ও এথেন্সের যুদ্ধেই দশ হাজারের পশ্চাদপসরণ কাহিনী লিখেছেন তিনি মহা-কাব্যোচিত গাম্ভীর্য ও কাব্যময় ভাষায়। সক্রেটিস নিজে কোন বই রচনা করেন নি। কিন্তু তিনি বিশ্ববন্দিত তাঁর প্রধান শিষ্য প্লেটোর জন্যে। প্লেটো [খ্রীঃ পূঃ ৪২৮—৩৪৭] তাঁর সঙ্গে তাঁর গুরুর কথোপকথনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন ডায়ালগ গ্রন্থে। এই গ্রন্থে সক্রেটিসের জীবনদর্শন এবং গ্রীক সমাজের মনন চিন্তনে তাঁর প্রভাব সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া প্লেটো লেখেন রিপাবলিক গ্রন্থ, যাতে আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা কি হওয়া

উচিত, তার একটা ছক তুলে ধরা হয়েছে। প্লেটোর মতে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ন্যস্ত হওয়া উচিত দার্শনিকদের হাতে। প্লেটোর আগে হেরাক্লিটাস [খ্রীঃ পূঃ ৫৪৪—৪৮৩] ও পরে আরিস্টটল [খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪—৩২২] দার্শনিক হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। হেরাক্লিটাস ছিলেন বস্তুবাদী। তিনি বলেন জগতে সর্বদা সবকিছুর পরিবর্তন হচ্ছে, তাই জগতের সত্যরূপ কি তা কেউ জানেন না। প্লেটো বলেন সব জিনিসই আছে ভাব রূপে আমাদের মনে। বাইরে আমরা যা দেখি তা খাঁটি দেখা নয়, তা আমাদের অজ্ঞানতারই প্রতিফলন মাত্র। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে হিন্দু বেদান্তেরই অনুরূপ কথা। আরিস্টটল দর্শন বিজ্ঞান শিল্পতত্ত্ব, সর্বশাস্ত্রে অসামান্য ছিলেন। তাঁর ইস্থেটিক্স বা নন্দনতত্ত্ব এবং প্লেটোর রিপাব্লিক বা সাধারণতন্ত্র বই আজও উচ্চ শিক্ষার্থীরা পড়েন। গ্রীকরা আর একটি জিনিস দিয়েছেন পৃথিবীকে। তা হল আমাদের পঞ্চতন্ত্রের মত জীবজন্তু নিয়ে লেখা ফেবল বা উপকথা। ঈশপ রচিত ফেবলস সভ্য জগতের সর্বত্র অদ্যাবধি সাদরে পঠিত হয়। বাগ্মী ডেমোস্থিনিসের বক্তৃতা, লুসিয়ানের ব্যঙ্গরচনা বিলাসিনীর সংলাপ এবং লঙ্গাস রচিত ড্যাফনিস ও চোলে নামক আখ্যায়িকাও গ্রীক গদ্য সাহিত্যের প্রসঙ্গে আলোচনীয়। খেলাধুলো সঙ্গীত অভিনয় ও বক্তৃতা গ্রীকদের শিখতে হত বিদ্যা হিসাবে। ভাষার কারুকার্যে ও আবেগের তীব্রতায় ডেমোস্থিনিসের বক্তৃতা সত্যিই অসাধারণ। পুবা পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ বক্তা নাকি কোনদিন কেউ হন নি। শেষোক্ত দুজন গ্রীক সভ্যতার অবক্ষয় কালের মানুষ এবং এঁরাই ইউরোপে প্রথম উপন্যাস সাহিত্যের আদি কাঠামো তৈরি করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে এছাড়া প্লুটার্ক নামক আর একজন গ্রীক লেখেন গ্রীক ও রোমান মহৎ ব্যক্তিদের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে প্যারালাল লাইভস্ বা তুলনীয় জীবন-কথা, যা থেকে বিষয় আহরণ করেছেন স্বয়ং শেকসপীয়ার পর্যন্ত। নর্থকৃত তার ইংরেজী অনুবাদ কলকাতাতেও পড়ান হত।

সাত ॥ লাতিন সাহিত্য ॥

ইতিপূর্বে বলেছি খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকেই গ্রীকদের পতন শুরু হয়। কিন্তু তার আগেই ওঠেন রোমানরা। তাঁরাই এবার হন ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাঁদের ভাষা ছিল লাতিন। এই ভাষাতেই তাই অতঃপর লেখা আরম্ভ হয় কাব্য নাটক ইতিহাস ও বিচিত্র জ্ঞান বিজ্ঞানের বই। প্রকৃতপক্ষে গ্রীক আর লাতিন সাহিত্যই হল ইউরোপীয় সংস্কৃতির আদি উৎস, তাই মানুষকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধ্যান ধারণার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করেছে! গ্রীকদের হোমারের মত ভার্জিল [খ্রীঃ পূঃ ৭০—১৯] হলেন লাতিন ভাষার জাতীয় মহাকবি। তাঁর ইনিড মহাকাব্যে রোমান জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ইতালীর মানটুয়া শহরে ভার্জিলের জন্ম। রোমে তিনি যখন আসেন উচ্চ শিক্ষার জন্যে, সীজার তখনো জীবিত। সীজার নিহত হবার পর অগাস্টাস সম্রাট হলে, তাঁর আদেশেই নাকি মহাকাব্যটি লেখা হয়। গ্রীকরা যখন ট্রয় আক্রমণ করেন, ইনিয়াস তখন ছিলেন একজন ফিনিসীয় যোদ্ধা। যুদ্ধান্তে তিনি দেশ ছেড়ে সমুদ্রে পাড়ি জমান এবং ঘুরতে ঘুরতে আফ্রিকার উপকূলে এসে হাজির হন। কার্থেজের রাণী ডিডোর সঙ্গে এখানে হয় তাঁর আগে দেখা সাক্ষাৎ, তারপর প্রণয়। ডিডো তাঁকে ধরে রাখতে চাইলেন। কিন্তু অশান্ত হৃদয় ইনিয়াস আবার নৌকা ভাসালেন এবং টাইবার নদীতীরে ল্যাটিয়াম শহরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানকার রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করে তিনিই পরে হলেন রাজা এবং রোমনগরী এই ল্যাটিয়ামেরই পরবর্তীরূপ। অন্তর্দ্বন্দ্ব চিত্রণে ও প্রকৃতি বর্ণনায় বৈচিত্র্যের অভাব না থাকলেও ইনিড মহাকাব্যে ইলিয়াডের প্রাণবেগ নেই। তার গাঁথুনিও ঠিক অতটা জমজমাট নয়। তবে কাহিনীর মধ্যে আছে স্বচ্ছন্দ গতিবেগ এবং চমৎকার উপমা ও শব্দ প্রয়োগের কারুকর্ম। মহাকাব্য ছাড়া ইকোলোগ এবং জিওর্জিক নামে দুখানি খণ্ড কবিতার সংগ্রহও আছে ভার্জিলের। এ দুইয়ে পল্লী প্রকৃতির শোভা সুষমা ও মানব হৃদয়ের আবেগানুরাগ বর্ণনাতেও তাঁর লেখনীর নৈপুণ্য লক্ষণীয়। ভার্জিলের কিছু আগে জন্মান কবি লুক্রেসিয়াস [খ্রীঃ পূঃ ৯৪-৫৫]

এবং একই সময়ে ক্যাতুলাস [খ্রীঃ পূঃ ৮৪-৫৪] ও হোরেস [খ্রীঃ পূঃ ৬৫-?] নামে আরো দুজন কবি। লুক্রেসিয়াস আসলে ছিলেন দার্শনিক এবং রেরাম ন্যাচুরা নামক কাব্যে তিনি জগৎ ও জীবনের সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন। ক্যাতুলাস প্রসিদ্ধ গীতিকবিতা লেখক এবং তাঁর প্রেম কবিতাগুলি স্যাফো এলকিয়াস ও এনাক্রিয়নের কথা মনে ক'রিয়ে দেয়। হোরেসের ওডস বিখ্যাত এবং তা এখনো আদর্শ লাতিন রচনা হিসাবে পড়ান হয়। হোরেস আরস পোয়েটিকা নামে নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধেও পদ্যে একখানা বই লিখেছিলেন। হোরেসের অল্প পরবর্তী কবি হলেন ওভিড [খ্রীঃ পূঃ ৪৩-খ্রীঃ অঃ ১৮]। হিরোয়িক ইপিসল্স্ বা বীরাঙ্গনাদের পত্র নামক বইয়ে ইনি বিখ্যাত মহিলাদের জবানীতে বহু মনোরম পত্রকবিতা লেখেন। মাইকেল মধুসূদন এখান থেকেই পান তাঁর বীরাঙ্গনার প্রেরণা। এই সঙ্গে মেটামরফসিস বা রূপান্তর নামে কতকগুলি উপভোগ্য কাহিনীও লেখেন তিনি কবিতার আকারে। এছাড়া খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে জুভেনাল ও মার্শাল নামে দুজন কবি ওঠেন, যাঁরা উভয়েই স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গকবিতা লিখে বিখ্যাত। কিন্তু মহাকাব্যে হোক, আর গীতিকাব্যে হোক, গ্রীকদের মত সৌন্দর্য সৃষ্টি, জীবনবোধ বা কল্পনার প্রাচুর্য রোমানদের ছিল না। তাই অসামান্য কবিতা বা কাব্য তাঁরা লিখতে পারেননি। হোরেস ওভিড জুভেনাল আজকের মানুষকে খুব আনন্দ দিতে পারে কি না সন্দেহ। লুক্রেসিয়াসের কবিতার প্রাণধর্মিতা অবশ্য মনকে স্পর্শ করে, আর জুভেনালের ব্যঙ্গকবিতা পড়ে কৌতুকলাভ হয়। কিন্তু সেও যথেষ্ট পরিমাণে নয়। একমাত্র ক্যাতুলাসই লাতিন ভাষায় অদ্বিতীয় কবি। তাঁর চোখে ছিল জগৎ ও জীবনের অন্তর্লোকের ছবি, হাতে ছিল জাদুকরের কলম। চিরকালের মহাকবিদের সঙ্গে তাই তিনি একাসনে অধিষ্ঠিত আছেন, সেকাল একাল দুই কালেই।

গ্রীকদের অনুসরণে রোমানরা নাটকও লেখেন। তাঁদের প্রথম গণণীয় নাট্যকার হলেন প্লটাস [খ্রীঃ পূঃ ২৫৪-১৮৪], তিনি কমেডী বা মিলনান্তক নাটকের জন্যে খ্যাত। তাঁর মিনেকমি নাটকের ছায়া নিয়ে শেকসপীয়ার কমেডী অব এরার্স বা ভ্রান্তিবিলাস লেখেন, আর মলেয়ার তাঁর মাইজার বা কৃপণ নাটক লেখেন পট অব গোল্ডের অনুকরণে। জগতের দুজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের অনুপ্রেরণাদাতা হিসাবে তিনি যতটা খ্যাত, নিজের রচনার জন্যে তত নন। টেরেন্স [খ্রীঃ পূঃ ১৯৫-১৫৯] তাঁর পরের নাট্যকার এবং তাঁর কমেডীগুলি ঢের বেশী হৃদ্য, এনড্রিয়া ও ব্রাদার্স তাঁর সুপরিচিত বই। শেষোক্ত বইটিতে

তিনি কঠোর শাসনের মধ্যে মানুষ হওয়া এবং শাসনহীন শৈথিল্যের মধ্যে মানুষ হওয়া দুটি সহোদর ভাইয়ের চরিত্র এঁকে দেখিয়েছেন যে ফল দুইয়ের সমান, কেউই ঠিক মানুষ হতে পারেনি। বলা দরকার যে মধ্যযুগীয় ইউরোপের নাট্য সাহিত্যে এই দুজনের রচনাই যথেষ্ট প্রভাব ও অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিল। স্বয়ং শেকসপীয়র পর্যন্ত এই প্রভাব এড়াতে পারেন নি। যাই হোক কাব্য এবং নাটকে গ্রীকদের সমকক্ষ না হলেও, রোমানরা কিন্তু গদ্য রচনায় অসামান্য ছিলেন। শিল্প, বাণিজ্য, প্রশাসন ও বৈষয়িক জ্ঞানে অসাধারণ ছিলেন বলেই বোধ হয় ইতিহাসে, পত্রসাহিত্যে, তত্ত্ব বিচারমূলক প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় তাঁরা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা আর কেউ দেখাতে পারেন নি। রোমান ইতিহাসকারদের মধ্যে প্রথম নাম করতে হয় স্বয়ং জুলিয়াস সীজারের [খ্রীঃ পূঃ ১০০-৪৪], যিনি গ্যালিক যুদ্ধের ইতিবৃত্ত লেখেন কমেণ্টারি নামক বইয়ে। তাঁর সমসাময়িক স্যালাষ্ট লেখেন প্রাচীন রোমের ইতিহাস। লিভি [খ্রীঃ পূঃ ৫৯-খ্রীঃ অঃ ১৭] এবং ট্যাসিটাস [খ্রীঃ পূঃ ৫৫-খ্রীঃ অঃ ১১] ঐ একই বিষয়ে লেখেন অধিকতর বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ বই। ট্যাসিটাসের এনালস এবং জারমেনিয়া প্রাচীন ইউরোপের জাতীয় ইতিহাস হিসাবে সত্যিই অতুলনীয়। রচনাও তাঁর বলিষ্ঠ ও সাহিত্য গুণসম্পন্ন। থুকিডিডিস ও জেনোফোনের সার্থক উত্তরাধিকারী বলা যায় তাঁকে। সিসেরো [খ্রীঃ পূঃ ১০৬-৪৩] ছিলেন তদানীন্তন কালের এবং বোধ হয় সর্বকালেরই শ্রেষ্ঠ বক্তা। একমাত্র গ্রীক বক্তা ডেমোস্থিনিসের নাম করা হয় তাঁর সমকক্ষ হিসাবে। কিন্তু প্রবন্ধকার রূপেও তিনি বিখ্যাত। তাঁর বন্ধুত্ব বা দ্য এমিটিকা কে না পড়েছেন ? জ্যেষ্ঠ প্লিনি ছিলেন বিশিষ্ট বাগ্মী। তাঁর পত্রাবলীও সাহিত্য হিসাবে অপূর্ব। সম্রাট মার্কাস আরেলিয়াসের আত্মচিন্তা দার্শনিক নিবন্ধ হিসাবে চমৎকার, তবে তা লাতিনে নয়, গ্রীক ভাষায় লেখা। রোমক জাতি ও রোমান সাহিত্যের গৌরব তার এই গদ্য সম্পদ। একজন পণ্ডিত এই জন্যেই বলেছেন, গ্রীক মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডী, লাতিন গদ্য, হিব্রু ও খ্রীষ্টীয় বাইবেল, শেকসপীয়ার মলেয়ার গ্যয়টে তলস্তয়, এই হল ইউরোপীয় সংস্কৃতির আট স্তম্ভ। এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ধর্মকর্ম ও আচার সংস্কারের ইমারত। সত্যিই জ্যেষ্ঠ প্লিনির মত পণ্ডিত, ট্যাসিটাস ও লিভির মত ইতিহাসকার, সিসেরোর মত বক্তা ও প্রাবন্ধিক এবং মার্কাস অরেলিয়াসের মত নীতিবিদ দুহাজার বছর আগে জন্মেছিলেন, এ ভাবতেই বিস্ময় বোধ হয়, একালের মানুষের।

আট ॥ নূতন ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য ॥

পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং তারপর থেকে একটানা প্রায় হাজার বছর জুড়ে ইউরোপের ইতিহাসে চলে অন্ধকার যুগ। ভ্যাণ্ডাল, গথ ও অন্যান্য বর্বর জাতির আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে টুকবো টুকরো হয়ে। আস্তে আস্তে সারা ইউরোপে ছোট বড অসংখ্য নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় এবং গ্রীক ও লাতিনের বদলে তাঁদেব নিজ নিজ মাতৃভাষাগুলি মাথা তুলতে থাকে। এই ভাবেই তৈরি হয় আধুনিক ইউরোপের দেশগুলি। ধর্মে সবাই এঁরা খ্রীষ্টান ছিলেন, সেই কারণে পোপ ছিলেন এঁদের কর্তা। কিন্তু আসলে এঁরা কাটাকাটি মাবামারি করেই দিন কাটাতেন। গ্রীক ও রোমানদের জীবন যাত্রা ছিল সহজ, ধর্মবিশ্বাসও তাঁদের ছিল বেশ সরল। তাঁদের সভ্যতাকে বলা হয় পেগান সভ্যতা। খ্রীষ্টান সভ্যতা থেকে এই সরলতা অন্তর্ধান করল। গির্জার হাতে চলে গেল জ্ঞানবিস্তার সমস্ত কর্তৃত্ব এবং পাদ্রীরাই হলেন সর্বেসর্বা। সাধারণ মানুষের লেখাপডা বন্ধ হল এবং তাঁরা সামন্ত প্রভুদের তাঁবেদার নিরক্ষব চাষী ও পেশাদার সিপাহী হয়ে রইলেন। গ্রীক ও রোমানদেব মত মহৎ সাহিত্য রচনা করার লোক তাই কেউ রইলেন না। পাদ্রীরা এবং তাঁদের অনুগামীরা লাতিনে বই পুঁথি লিখতেন, যা সাধারণ মানুষরা পড়ে বুঝতেন না। এই জন্যেই এ সময়কে বলা হয় অন্ধকার যুগ। তবে মানুষের আবেগ অনুরাগ ও কল্পনা ত থেমে থাকে না। তা আত্মপ্রকাশের পথ যেমন করে হোক তৈরি করে নেয়। এই হাজার বছরেও ইউরোপে তৈরি হয়েছে এক জাতের সাহিত্য, যা সাধারণ মানুষরা লিখেছেন। তাঁরা লিখেছেন অনেক গান, বীরগাথা ও কাহিনী। লেখা বললে হয়ত ভুল হবে। মুখে মুখেই রচিত ও প্রচলিত হয়েছে এই সাহিত্য। আগেই বলা হয়েছে ইতালীয়ান, ফরাসী, স্প্যানিশ, জার্মান প্রভৃতি একালীন ভাষাগুলির জন্ম হয় এই সময় এবং এসব ভাষাতেই গ্রাম্য কবিরা সাহিত্য সৃষ্টিতে উদ্যোগী হন। ইংরেজরা লেখেন আর্থারের কাহিনী, ফরাসীরা রোলাণ্ডের এবং স্প্যানিশরা কীডের। আর্থার রোলাণ্ড কীড, সবাই কল্পকথার রাজা এবং তাঁদের সিপাহী সামন্তদের শৌর্য-

বীর্য ও ত্যাগের কাহিনী পুষ্ট করেছে এই ব্যালাড বা কাব্যগাথাগুলিকে। এইসব গাথা অনেকটা রাজস্থানের চারণগীতি ও বাংলার মঙ্গলকাব্যের মত। এছাড়া আরো এক জাতের সাহিত্য রচিত হয়েছে এ সময়ে। তা হল প্রেম সঙ্গীত। ভ্রাম্যমাণ চারণরা তা গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াতেন। ফ্রান্সে এই গাইয়েদের বলা হত ক্রবাদুর, জার্মানীতে মিনেসিঙ্গার বা জংগুলিয়ার। এক সময় খুব আদর ছিল এই সব গানের। উত্তর ইউরোপে অর্থাৎ নরওয়ে সুইডেন ও আইসল্যাণ্ডে সাগা নামে তৈরি হয়েছিল আর এক ধরনের কাব্যকাহিনী। সিগুর্ড নামক কোন অর্ধপৌরাণিক বীরের কাহিনী নিয়ে রচিত হয় ভোলসাং সাগা। এ ছাড়া বিচিত্র দুঃসাহসিক অভিযান ও প্রেমের গল্প একত্র করা হয় এড্ডা নামক সংগ্রহ পুস্তকে। এড্ডার একটা আদি বা প্রাচীন রূপ ছিল। পরে আর একটা নূতন ছাঁচ বানান হয়। এই বড় এড্ডা ও ছোট এড্ডা দুই-ই অপূর্ব কাহিনী সংগ্রহ রূপে বেঁচে আছে, যা আজও সানন্দে পড়া যায়। ইংরেজী অনুবাদে আমরা সবাই তা পড়েছি আমাদের ছাত্র বয়সে।

উত্তরের এইসব কাহিনীর কিছু কিছু এসেছিল জার্মানীতে এবং তা নিয়ে জার্মানরা তৈরি করেছিলেন তাঁদের বিখ্যাত নিবলানজেন নামক লোক-মহাকাব্য। বর্তমান ইংরেজী ভাষার আদি কাঠামো যে এংলো স্যাকসন ভাষা, তাতে লেখা হয়েছিল বিউলফ নামক কাব্যকাহিনী এবং বিউলফ কর্তৃক গ্রথগার দৈত্যের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ ও নিধনের কাহিনী বর্ণিত হয় এতে। প্রাচীন গিলগামিস কাব্যের মতই হিংস্র দৈত্যবধের কাহিনী এটা, যদিও গিলগামিসের অনুরূপ কোন রূপকের কঙ্কাল অন্তর্নিহিত নেই এতে। বিউলফ ছাড়াও ডিওরের বিলাপ, পথচারী ইত্যাদি আরো কতকগুলি খণ্ড কবিতা পাওয়া গেছে এংলো স্যাকসন ভাষায়, যা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পড়ুয়ারা এখনো পড়েন। এই রকম কাহিনী কাব্য তৈরি হয়েছিল ফ্রান্সেও। ফরাসীদের ভাষায় তার নাম চাসোঁ দ্য গেস্ত। রেনার্দ নামক এক শৃগালের কাহিনী নিয়ে আছে প্রসিদ্ধ একটি চাসোঁ। এই হল সংক্ষেপে আজকের ইউরোপীয় সাহিত্যের গোড়ার পর্ব এবং এই সাহিত্য রচিত হয়েছিল রাজধানী শহর থেকে দূরে অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত গ্রামের মানুষদের হাত দিয়ে। আগেই বলা হয়েছে যে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যার চর্চা বিশেষ ছিল না মধ্যযুগে। পাদ্রী ও মঠাধ্যক্ষেরাই ছিলেন সর্ববিদ্যার অধীশ্বর। তাঁরা ও তাঁদের শিষ্য সেবকেরা লাতিনেই বই পুঁথি লিখতেন। প্রথমত লোকভাষাগুলি সম্বন্ধে ছিল তাঁদের নিদারুণ

অশ্রদ্ধা। দ্বিতীয়ত তাঁরা মনে করতেন সাধারণ মানুষরা বেশী লেখাপড়া শিখলে ধর্মদ্বেষী হবেন এবং ঈশ্বরের নামে শাস্ত্রের নামে প্রচারিত যে কোন আদেশ নির্দেশ নতশিরে পালন করতে গররাজি হবেন। আমাদের দেশেও মধ্যযুগে পণ্ডিতদের মনোভাব অনেকটা একই ছিল। মাতৃভাষার পরিবর্তে সংস্কৃতেই তাঁরা দর্শন জ্যোতিষ ব্যাকরণ ও আয়ুর্বেদের বই লিখেছেন। কেউ কেউ লিখেছেন কাব্য নাটকও। যাই হোক ইউরোপে উচ্চ জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাষা রূপে লাতিনের চল অনেকদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাই দেখি এলিজাবেথের যুগেও ইংল্যাণ্ডে বেকন তাঁর নোভাম অর্গানাম লাতিনে লিখেছিলেন। তাঁর ঢের পেরেও নিউটন লাতিনে লিখেছিলেন তাঁর প্রিন্সিপিয়া। ফ্রান্সে দেকার্ত এবং জার্মানীতে লুথার ও হল্যাণ্ডে ইরাসমাসের বেশীর ভাগ লেখাই লাতিনে। কায়েমি স্বার্থের আজ্ঞাবাহী পাদ্রী ও পণ্ডিতদের এই চক্রান্ত ভেদ করেই সাধারণ মানুষরা সাহিত্য সংস্কৃতি এবং জ্ঞান বিজ্ঞানকে সর্বজনের হাতে পৌঁছে দেন, সে ইউরোপেও, এদেশেও। সবাই জানেন আশা করি যে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস যথাক্রমে রামায়ণ ও মহাভারত বাংলা মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করার দরুণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কি রকম বিরাগভাজন হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা এবং মঙ্গলকাব্য রচয়িতারাই যে বর্তমান বাংলা ভাষার স্রষ্টা, একথা ভুলে গেলে চলবে না।

যাই হোক এই অবস্থা দীর্ঘদিন অব্যাহত গতিতে চলার পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে হঠাৎ নূতন আলো ফুটল ইউরোপে। খ্রীষ্টান গির্জার প্রভুত্ব ঝেড়ে ফেলে মানুষ হারান গ্রীকো-রোমক সংস্কৃতিকে নূতন করে ফিরে পেলেন। তার ফলে এল মানুষের মনে স্বাধীন চিন্তা এবং এই চিন্তার প্রভাবে তাঁরা খোলা চোখে জগৎ ও জীবনের দিকে তাকাতে শুরু করলেন। মানুষ যেন দীর্ঘ মোহনিদ্রা অন্তে জেগে উঠলেন এবং তাঁর বুদ্ধি ও কর্মশক্তিকে দিকে দিকে প্রসারিত করে দিলেন। এইভাবে মুক্ত বুদ্ধির হঠাৎ উজ্জীবন হল বলেই এর নাম রেনেশাঁস বা নবজাগরণ। এই বুদ্ধির স্বাধীনতা এক দিকে যেমন শিল্পে ও সাহিত্যে শতমুখে বিচ্ছুরিত হল, অন্যদিকে তেমনি বিজ্ঞানে দর্শনে ও জীবন চিন্তায় নূতন পথে পা বাড়ানর প্রেরণা জোগাল মানুষকে। একদিকে তাই রাফায়েল, মাইকেল এঞ্জেলো, দান্তে, শেকসপীয়ার, অন্য দিকে গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস, নিউটন নতুন যুগকে তাঁদের কর্ম ও চিন্তায় মূর্ত করতে এগিয়ে এলেন। এই যে রেনেশাঁস বা নব জাগরণ, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস

এখান থেকেই যাত্রা শুরু করে। আগেই বলেছি যে মধ্যপ্রাচ্য থেকে অগ্রসরমান মুসলীম সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দফায় দফায় প্রায় পাঁচশো বছরকাল লড়াই চালিয়ে অবশেষে সম্মিলিত ইউরোপের বাহুবল জয়ী হলেও, ক্রুজেডোত্তর ইউরোপ খুব অগ্রসর হতে পারে নি, অশিক্ষিত পাদ্রী ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষক অধিকতর অশিক্ষিত সামন্ত প্রভুদের অভ্যুদয়ের ফলে। সর্বগ্রাসী অজ্ঞতা ও কুসংস্কার কবলিত করে ফেলেছিল ইউরোপের সমাজ সংস্কৃতি তথা জ্ঞান বিজ্ঞানের দুনিয়াকে। রেনেশাঁস উদ্ধার করল তাকে এই অন্ধকারের দাসত্ব ঘুচিয়ে। এরপর থেকে কলাকৃষ্টি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার যে ইতিহাস, তাতে বিগত পাঁচশো বছরে আর ছেদ পড়েনি। ইউরোপের গৌরব ও গরিমার এই বিস্ময়কর ব্যাপ্তির সঙ্গেই অবশ্য স্মরণ করতে হবে মস্ত একটি অগৌরবের অধ্যায়ও। আমেরিকা আবিষ্কার এবং এশিয়া আফ্রিকার সঙ্গে ইউরোপের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শুরু হয় এই সময়ই, আর দুর্জয় আগ্নেয়াস্ত্র ও উন্নত জলযান সম্বল করে দুনিয়ার দিকে দিকে ইউরোপের ছোটবড় দেশ বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ গড়ে তোলেন। একে একে আসতে আরম্ভ করেন পর্তুগীজ ওলন্দাজ ফরাসী ও ইংরেজরা এবং মানব জাতির প্রায় দুই তৃতীয়াংশকে ছলে বলে পদানত করে ও তাঁদের দেশের সম্পদ আহরণ করে নিজেরা স্ফীত হতে থাকেন। অষ্টাদশ শতকের শেষে বাষ্প বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হলে, তা গতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে তাঁরা অমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। কিন্তু ঔপনিবেশিক শোষণের এই কলঙ্ক মোচনে তাঁদের চেতনা বিশ শতকের চতুর্থ দশকের আগে জাগেনি, আর তা জেগেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে ভগ্ন মেরুদণ্ড হবার পর, একথা তিক্ত হলেও না বলে উপায় নেই।

নয় ॥ ইতালীয় সাহিত্য ॥

ইউরোপে রেনেশাঁস বা নবজাগরণ শুরু হয় প্রথম ইতালীতে। সেখান থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং পরবর্তী তিনশো বছরে তার প্রভাবেই গড়ে ওঠে ইউরোপীয় সভ্যতার ইমারত। ইতালীতে এই সময় লিওনার্দো দা ভিঞ্চি মাইকেল এঞ্জেলো রাফায়েল প্রমুখ মহাশিল্পীর যেমন আবির্ভাব হয়, তেমনি হয় দান্তে পেতরার্ক ও বোক্কেচিও প্রমুখ মহান কবি সাহিত্যিকদেরও। প্রাচীন মহাকবিদের প্রয়াণের পর এঁরাই হলেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি এবং ইতালীয় মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করলেও, গোটা মহাদেশেই এঁরা স্বীকৃতি পান রচনার গুণে। এঁদের মধ্যে অগ্রণী হলেন দান্তে। দান্তে আলেঘিয়েরী [১২৬৫-১৩২১] বিখ্যাত তাঁর ডিভাইন কমেডি মহাকাব্যের জন্যে। স্বর্গ, নরক ও রসাতল, এই তিন খণ্ডে বিভক্ত কমেডি মধ্যযুগের এক অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি। দান্তে এই কাব্যে তাঁর অভিপ্সিতা বিয়াত্রিচের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মার সন্ধানে ত্রিভুবনে ঘোরেন, ভার্জিলের ছায়ানুসরণ করে। এই তিন ভুবনের প্রসঙ্গই হল কাব্যের তিনটি খণ্ড। এই যাত্রাপথে বিভিন্ন লোকে অবস্থানকারী ভালমন্দ যত মানুষের সাক্ষাৎ পান কবি, তাঁরা সবাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ। প্রকৃত পক্ষে তাঁদের জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন করেছেন তিনি এবং জীবন মৃত্যু, পাপ পুণ্য ও ধর্মাধর্মের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন এই সূত্রে। খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব ও বাস্তব জীবনবোধ দুইয়ের আশ্চর্য সমীকরণ হয়েছে এই কাব্যে। শাশ্বত কামনার অধিশ্বরী পরমা প্রকৃতি রূপিনী বিয়াত্রিচকে এই কাব্যে যে মহিমান্বিত মূর্তিতে এঁকেছেন কবি, তার তুলনা একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব কাব্যে পাওয়া যায় রাধিকায়। দান্তে ছিলেন ইতালীর টসকানী অঞ্চলের বাসিন্দা। সেই আঞ্চলিক টসকানেই তিনি লেখেন কমেডি, যার ফলে তা গোটা ইতালীর সাহিত্যিক ভাষা হয়ে ওঠে। ভিটানুভা বা নবজীবন নামে আরো একখানি কাব্য আছে তাঁর। তবে কমেডির লেখক রূপেই তিনি কবিগুরুর আসন লাভ করেছেন। দান্তের পর করা দরকার পেতরার্ক ও বোক্কেচিওর নাম। এঁরাও বিশ্বসাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ফ্রান্সিসকো পেতরার্ক [১৩০৪-১৩৭৪]

সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার আদি সংগঠকদের একজন এবং সনেট লেখক হিসাবে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না, যদিও তাঁর আগে পরে ইতালীতে সনেট লিখেছেন অনেকেই। এই জন্যেই মধুসূদন তাঁর চতুর্দশপদী সংগ্রহের গোড়ায় তাঁর নামে জয়ধ্বনি নিয়েছেন। ল্যরা ছিলেন কবির বাঞ্ছিতা, তাঁরই উদ্দেশে নিবেদিত তাঁর সনেটগুলি, যার প্রত্যেকটাই নিটোল নিখুঁত সুন্দর ফুলের মত। গিওভান্নী বোক্কেচিও [১৩২৩-১৩৭৫] বিখ্যাত ডেকামিরন বা দশ রাত্রি নামক গল্প সংগ্রহ লিখে। গল্পগুলি এঁর নানা জাতের, নানা সুর ও রসের। করুণে কৌতুকে, কোমলে কঠোরে, শ্লীলে অশ্লীলে অনবদ্য এইসব গল্পই একালীন ছোটগল্পের আদি পুরুষ এক হিসাবে।

লুডোভিকো আরিয়াস্তো [১৪৭৪-১৫৩৩] এবং তরকোয়াতো তাসো [১৫৪৪-৯৫] অন্য দুজন কবি দেখা দেন এঁদের পরে এবং তাঁরাও আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। রোলাণ্ডের বীরত্ব ও দুঃসাহসিক কার্যকলাপের কাহিনী নিয়ে আরিয়াস্তো লেখেন অরল্যাণ্ডো ফিউরিয়োসো নামক কাব্য। আর জেরুজেলামে অবস্থিত যীশুখ্রীষ্টের কবর সারাসেনদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্যে খ্রীষ্টান রাজা ও রাজন্যবর্গ যে ক্রুজেড পরিচালনা করেছিলেন, সেই ধর্ম-যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে তাসো লেখেন জেরুজেলাম ডেলিভার্ড বা জেরুজেলামের মুক্তি। এই দুটি বইকে সাধারণভাবে মহাকাব্য নামেই অভিহিত করা হয় যদিও, কিন্তু মহাকাব্য বলতে যে শ্রেণীর গাম্ভীর্যপূর্ণ ও আঘাত সংঘাতময় বৃহৎ ঘটনাশ্রিত কাব্য বোঝায়, অরল্যাণ্ডো তা নয়। তাকে তাই রোমান্স বা রম্য কাহিনী বলাই শ্রেয়। তাসোর বই অবশ্য মহাকাব্যই, সে বিষয় এবং রচনা দুদিক থেকেই। পরবর্তীকালে ওয়াল্টার স্কট ইংরাজীতে কুইন্টিন ডারওয়ার্ড নামে যে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন, তার অনুপ্রেরণা সম্ভবত তিনি পান তাসো থেকেই। মিলটনও তাসোর অনুরাগী ছিলেন, যদিও তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী তিনি গ্রহণ করেন নি। মধুসূদনও মেঘনাদবধে তাসো থেকে কিছু কিছু অংশ নিয়েছেন। দান্তে আলেঘিয়েরির সমসাময়িক, তাঁর অল্প বয়োজ্যেষ্ঠ, আরো দুজন কবি ছিলেন, গুইদো গুইনিজেলী [১২৪০-৭৬] এবং গুইদো ক্যাভালকান্তি [১২৬০-১৩০০], যাঁদের প্রভাব অল্পবিস্তর পড়েছিল দান্তের ওপর। দুই গুইদোই প্রেমের কবি, তার মধ্যে প্রথম জন স্মরণীয় বোলোনার আঞ্চলিক ভাষাকে প্রথম কাব্যের মাধ্যম করার জন্যে, আর দ্বিতীয় জন স্মরণীয় অতীন্দ্রিয় প্রেমের উপলব্ধিকে প্রথম কাব্যে রূপ দেওয়ার জন্যে।

ইতালীয় সাহিত্যে কিন্তু রেনেশাঁসের প্রভাবে শুধু কাব্য ও কবিতাই লেখা হয়নি, হয়েছে নাটকও এবং বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থও। গদ্যে শিল্পী ও শিল্পরসিক বেনভেনুতো সেলিনীর [১৫০০-৭১] আত্মজীবনী ও নিকোলো মিকিয়াভেলীর [১৪৬৯-১৫২৭] প্রিন্স বা রাজকুমার নামক রাজনীতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত বইটিতে রাষ্ট্রশাসনে কূটবুদ্ধি ও কৌশল কেমন করে প্রয়োগ করতে হয় তার অনেক সুচিন্তিত নির্দেশ আছে, যা আজও অর্থহীন হয় নি। আমাদের দেশের কৌটিল্যের সঙ্গে এই জন্যে তাঁর তুলনা করা হয়। নাটকে রেনেশাঁসী ইতালীয়দের খুব প্রশংসনীয় কাজ বিশেষ নেই। কবি আরিয়াস্তো নেকরোমেন্সার বা ভূতুড়ে জ্যোতিষী নামে একখানা প্রহসন লিখেছিলেন। মিকিয়াভেলীও লিখেছিলেন একখানা মিলনাত্মক নাটক, তার নাম ম্যানড্রেক। জিরালডী সিনথিও, ত্রিসিনো প্রভৃতি আরো অনেক নাট্যকার ছিলেন। এক সময় রঙ্গমঞ্চে তাঁদের সমাদরও ছিল। কিন্তু আজ তাঁরা শুধু নামেই বেঁচে আছেন, নাট্যসাহিত্যের গবেষকদের আলোচনার বস্তু হয়ে। ব্যভিচার গুণ্ডামি ও বীভৎস খুনোখুনির কাহিনীতে পূর্ণ এইসব নাটক অনেকটা আমাদের বাহাদুর মার্কা হিন্দী ফিল্মি কাহিনীর মত। এরা যে কালের সমুদ্র পার হতে পারে নি, সে এ জন্যেই।

রেনেশাঁসের জোয়ারে ইতালীতে সাহিত্য শিল্প ও বিজ্ঞানের যে উদ্দীপনা এসেছিল, আড়াই শো তিনশো বছরেই তা ফুরিয়ে নিস্তেজ হয়ে গেল। তার রাজনীতিক গৌরবও যেমন ম্লান হল, সাংস্কৃতিক গরিমাতেও তেমনি ভাঁটা পড়ল ধীরে ধীরে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি এসে আবার আমরা পাই শ্রেষ্ঠ ইতালীয় সাহিত্যিক ও সংস্কৃতির নায়কদের দেখা। অন্তর্বর্তী এই সময়টাতে অবশ্য লেখাপড়া চলেছে, সাহিত্যও রচিত হয়েছে। কিন্তু তা দেশের চতুঃসীমা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে ছড়ায়নি। কারণ তত বড় লেখক ওঠেননি কেউ। কার্লো গোল্ডী [১৭২০—১৮০৬], ভিটটোরিও আলফিয়েরী [১৭৪৯—১৮০৩], গিয়াকিমো লিওপার্দি [১৭৯৮—১৮৩৭], ভিনসেনজো মনটি [১৭৫৬—১৮২৮] প্রমুখ অল্প কয়েকজন কবি ও নাট্যকারের রচনা হাতে পাই আমরা এই দীর্ঘ সময়ের সাহিত্য হিসাবে। এর মধ্যে একমাত্র আলফিয়েরী ও লিওপার্দির একদা কিছুটা ইউরোপীয় খ্যাতি ছিল। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুতে তারপর জিওসু কার্দুচি [১৮৩৫—১৯০৭] গ্যাব্রিয়েল দ্যনানজিও [১৮৬৩—১৯৩৮], গিওভান্নী প্যাসকোলে [১৮৫৫—১৯১২], দিনো কাম্পানা

[১৮৮৫—১৯৩২] প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের উদ্ভব হয়। এঁদের মধ্যে কার্দুচি আধুনিক ইতালীর জাতীয় কবিরূপে সম্মানিত ছিলেন এবং নোবেল প্রাইজ প্রবর্তিত হলে, তাঁকে তা দেওয়া হয়। দনানজিও কবি, নাট্যকার ও রোমান্টিক স্বপ্নদ্রষ্টা। একদা সখের সেনাদল গঠন করে তিনি ফিউম দ্বীপ দখলে অগ্রণী হয়ে রীতিমত চমক সৃষ্টি করেছিলেন। প্যাসকোলে ও কাম্পানা ফরাসী সিম্বলিষ্টদের অনুগামী কবি এবং তাঁদের কবিতায় চিরন্তন জীবনতৃষ্ণার সঙ্গেই যুগ ও জীবনের বার্তাও প্রতিধ্বনিত হয়েছে ইতস্তত। এঁদের পিছু পিছু দেখা দেন নাট্যকার ও কথা সাহিত্যিক লুইগি পিরেন্দেল্লো, ঔপন্যাসিকা গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা এবং ঔপন্যাসিক ইগনেজিও সিলোনি। পিরেন্দেল্লোর নাটক নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র এবং দেলেদ্দার উপন্যাস মা বাঙালী পাঠকের অপরিচিত নয়। দুজনই এঁরা নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। পিরেন্দেল্লোর গল্প সংগ্রহ নেকেড ট্রুথ বা নগ্নসত্যও চমৎকার বই। সিলোনির ফন্তামারা চাষী জীবনের কাহিনী এবং বামপন্থী ধারার উৎকৃষ্ট রচনা। নন্দন তত্ত্বের পণ্ডিত বেনিদেত্তো ক্রোচে এবং প্রাচ্য বিদ্যাবিদ তুচ্চির নামও ভারতে সুপরিচিত। এঁরা রবীন্দ্রনাথের সংস্রবে এসেছিলেন। উনিশ শতকে মাৎসিনী ও গারিবলডী ভারতের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের নায়করা আজিমুল্লা খাঁর মাধ্যমে গ্যারিবলডীর কাছে সহায়তা চেয়েছিলেন। মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত স্বৈরশাসন এই বিরাট ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ইতালীর সর্বনাশ করেছিল বিশ শতকের মধ্যপর্বে। আজ আবার নূতন করে ইতালী জাগছে, জাগছে তাই তার সাহিত্য ও কলাকৃষ্টি।

রেনেশাঁসের ঢেউ ইতালী থেকে ফ্রান্সে ও তার পাশের দেশ স্পেনে পৌছায়। সাগর পার হয়ে তা যায় ইংল্যাণ্ডে। সর্বত্র তার ফলে আসে নব জাগরণের জোয়ার। নাটকে সাহিত্যে চিত্রকলায় নতুন চেতনা আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। অন্যান্য দেশের চেয়ে ফ্রান্সের ভূমিকা এ জায়গায় বেশ একটু অগ্রসর। আগেই বলেছি শার্লেমঁা ও রোলাণ্ডের বীরত্ব কাহিনী, অর্থাৎ চাসেঁা দ্য গেস্ত, রেনার্দ শৃগালের কাহিনী এবং ক্রুবাদুর সঙ্গীত দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল মধ্যযুগীয় ফরাসী সাহিত্যের যাত্রা। তারপর খাঁটি অর্থে যাঁদের সাহিত্যিক বলা যাবে, একে একে উঠলেন সেরকম মানুষরা। এই দলের মধ্যে র‍্যাবলে, মতেঁ, ভিয়োঁ, রসাঁর্দ এই চারটি নাম অগ্রগণ্য। ফ্রাঁকোইস র‍্যাবলে [১৪৯৬—১৫৫৩] লেখেন গরগনতুয়া ও পেঁতাগ্রুয়েল নামে এক ব্যঙ্গ উপন্যাস। এতে তদানীন্তন পণ্ডিত সমাজ, পাদ্রী সমাজ, সৌখীন সামন্ত শ্রেণী ও বিলাসিনী নারীদের আচার আচরণের দোষত্রুটি নিয়ে তীব্র ভাষায় বিদ্রূপ করা হয়েছে। সারভান্তিসের বিখ্যাত ডন কুইকসোট বইয়ের অগ্রদূত বলা যেতে পারে এই বইকে। যে জাতের রচনাকে এখন আমরা এস্সে বা প্রবন্ধ বলি, তার সূত্রপাত করেন মিশেল ইয়েকোয়েম দ্য মতেঁ [১৫৩৩—৯২]। লঘুগুরু নানা বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লেখেন তিনি, যাতে তাঁর অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জীবনের বিচিত্র চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও অদ্যাবধি তাঁর প্রবন্ধমালা পড়ে উপভোগ করা যায়। ফ্রাঁকোইস ভিয়োঁ [১৪৩১—৭২] মধ্যযুগীয় ফ্রান্সের প্রথম গণনীয় কবি এবং অসাধারণ কবিই তিনি, যদিও তিনি মানুষ হিসাবে ছিলেন চোর ও দুশ্চরিত্র অপরাধী। আর এই অপরাধের দরুণ একবার তাঁর ফাঁসির হুকুমও হয়েছিল। তাঁর এই সময়ের অভিজ্ঞতা ফাঁসি কাঠের গান বা ব্যালাড অব দ্যা জিবেট কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। ভিয়োঁর পেতিত টেষ্টামেণ্ট বা জীবনের দলিল প্রসিদ্ধ রচনা। অকপট আন্তরিকতার জন্যে তা আজও পড়তে ভাল লাগে। পিয়েরে দ্য রসাঁর্দ [১৫২৫—৮৫] তারকামণ্ডলী নামক কবিগোষ্ঠীর নেতারূপে যেমন প্রসিদ্ধ,

তেমনি প্রসিদ্ধ অতুলনীয় প্রেমকাব্য রচয়িতা রূপে। ওড, সনেট ও গীতি কবিতাতে তিনি সমান সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং তাঁর আমর্স সংকলনটি ক্যাতুলাসের লেখনীর যোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন সমালোচকেরা। কাব্যের মত নাটকেও ফরাসী সাহিত্যে বিরাট শক্তিমান লেখকদের আবির্ভাব হয়। প্রথম দেখা দেন কর্ণেঈ, তারপর মলেয়ার এবং সব শেষে রাসিন। পিয়েরে কর্ণেঈ [১৬০৬—৮৪] এবং জাঁ রাসিন [১৬৩৯—৯৯] দুজনেই গ্রীক ছাঁদের ট্র্যাজেডী বা বিষাদান্ত নাটকের লেখক। কর্ণেঈ-এর কীড নাটক এক সময় খুব প্রসিদ্ধ ছিল। রাসিনের ইফিগেনিয়া, ফ্রেদিয়া প্রভৃতি নাটক ইউরিপিডিস ও সেনেকার বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা হলেও, তাতে পড়েছে রেনেশাঁসী মানবতার ছায়া। তাই সেগুলি হয়েছে অপরূপ সাহিত্য গুণসম্পন্ন ট্রাজেডী। তিনজন নাট্যকারের মধ্যে মলেয়ার ছদ্ম নামধারী জাঁ বাপ্তিস্তে পোকেলোঁ [১৬২২—৭৩] সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ছদ্মনামে তিনি লেখেন সমাজের বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত মানুষদের মুখোস খুলে দেবেন বলে। তদানীন্তন কালের ভণ্ডামি, মূর্খতা, কার্পণ্য ও অসাধুতাকে ব্যঙ্গের আলোয় উদ্ঘাটিত করেছেন তিনি তাঁর নাটকে। কৃপণ [মাইজার] এবং বোকা বড়লোক ত্ত বুর্জোয়া জেণ্টলম্যান তাঁর বিখ্যাত বই। তার্তুফ বইয়ে তিনি এক ভণ্ড প্রবীণের চরিত্র এঁকেছেন, যার ছায়া হয়ত মধুসূদন নিয়েছিলেন তাঁর বুড়ো শালিকে। মলেয়ার আসলে কমেডির লেখক এবং তিন শতাধিক বৎসর পরে আজও মঞ্চস্থ হলে তাঁর নাটককে সমান উজ্জ্বল মনে হয়। জীবনবেত্তা শিল্পী ও স্রষ্টারূপে তাঁকে তাই শেকসপীয়ারের সমকক্ষ মনে করেন ফরাসীরা। সত্যিই তিনি ব্যঙ্গরসের অতুলনীয় জাদুকর।

সৃষ্টিমূলক রচনায় যেমন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাতেও তেমনি ফরাসীদের প্রতিভা মধ্যযুগ থেকেই পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। দার্শনিক প্যাসকাল [১৬২৩—৬২], প্রাবন্ধিক মন্তেস্ক প্রমুখের বহু মূল্যবান বই বেরুতে থাকে। তাছাড়া যাঁদের রচনা ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবে উদ্দীপনা জোগায়, সেই ভলতেয়ার [১৬৯৪-১৭৭৮], রুশো [১৭১২-৭৮] এবং দিদেরো [১৭১৩-৮৪] ওঠেন অল্প পরেই। ভলতেয়ারও ছদ্মনাম। আসল নাম তাঁর ফ্রাঁকোইস মারি অরোয়েত। নাম যাই হোক তাঁর, ভলতেয়ার ছিলেন অসামান্য প্রতিভাধর পুরুষ। একদিকে যেমন তিনি জাঁদিগ ও কাঁদিদের মত দ্বন্দ্ব প্রধান উপন্যাস লেখেন, অন্যদিকে তেমনি লেখেন ইতিহাস দর্শন ও সমাজতত্ত্ব নিয়ে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ, যাতে

মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী সর্বাধিক সোচ্চার। জঁ৷ জ্যাক রুশো নিউ হেলইস্ নামক উপন্যাস লেখেন, আবার লেখেন সামাজিক সম্পর্ক নামক প্রসিদ্ধ সমাজ বিজ্ঞানের বইও। তাঁর আত্মজীবনীও অকপট সত্য ভাষণ ও অকুণ্ঠিত আত্মবিশ্লেষণের জন্যে একই সঙ্গে নিন্দা ও প্রশংসা পেয়েছে প্রচুর। দেনিস দিদেরো বহু জনের সহযোগিতায় সম্পাদন করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত বিশ্বকোষ এবং এ থেকেই ঐ দলটির নাম হয় এনসাইক্লোপিডিষ্ট বা বিশ্বকোষ-বাদী। রুশো ভলতেয়ার ও দিদেরো প্রমুখের সম্পাদনায় প্রকাশিত এই বিশ্বকোষে নিরীশ্বর সত্য সন্ধিৎসাকে ভিত্তিস্বরূপ নিয়ে সাধারণ মানুষের সামাজিক ও আর্থনীতিক অধিকারকে যে ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তা ফরাসী বিপ্লবের নেতাদের অনুপ্রেরণা জোগায় প্রচুর পরিমাণে। ফরাসী বিপ্লবের পর ফরাসী সাহিত্যে আসে কথাসাহিত্যের বান এবং একে একে দেখা দেন অনরে দ্য বালজাক [১৭৯৯-১৮৫০], ভিক্তর হুগো [১৮০২-৮৫], তিয়োফিয়েল গতিয়ে [১৮৯৯-৭২], গুস্তাভ ফ্লবেয়ার [১৮২১-৮০], এমিল জোলা [১৮৪০-১৯০২], আলফঁাস দোদে [১৮৪০-৯৭], গী দ্য মোপাসাঁ [১৮৫০-৯৩]। বালজাক মানুষের পাপ তাপ ও স্খলন পতনের বিচিত্র কাহিনী নিয়ে লেখেন হিউম্যান কমেডী নামে বহু খণ্ডে বিভক্ত মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস। ভিক্তর হুগোর লা মিজারেবল যদিও দারিদ্র্যের মর্মান্তিক কাহিনীরূপে বিশ্ববিখ্যাত, কিন্তু তাঁর নত্রদম গির্জার কুঁজো মানুষটি এবং সমুদ্রের শ্রমিকরাও অসামান্য রচনা। তাঁর হারনানি নাটক এবং সন্ধ্যা সঙ্গীত কবিতা গ্রন্থও বহুখ্যাত। জোলার জার্মিনল গ্রন্থে অতুলনীয় দরদের সঙ্গে আঁকা হয়েছে নীচুতলার শ্রমজীবী মানুষদের জীবন। ফ্লবেয়ারের মাদাম বোভারী, গতিয়ের মাদমোয়েজেল দ্য মোপাইন এবং দোদের সাফো উপন্যাসও একসময় সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জটিল মনোবিশ্লেষণাত্মক রচনা হিসাবে আদৃত ছিল। মোপাসা লিখেছেন অজস্র ছোট গল্প। তাঁর গল্পে মানুষের বিচিত্র স্বভাবের ছবি যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় বিচিত্র মানুষ এবং পরিবেশের ছবিও। তাঁর বেশীর ভাগ গল্পেরই জন্ম ফ্রাংকো-প্রুশীয় যুদ্ধের পটভূমিতে। জমজমাট ঘটনা প্রধান কাহিনী লিখে বিখ্যাত আলেকজান্দার ডুমা [১৮০২—৭০]। তাঁর থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, ব্ল্যাক টিউলিপ, কাউণ্ট অব মণ্টিক্রেষ্টো ও কর্সিকান ব্রাদার্স ছোট বয়সে রুদ্ধশ্বাস কৌতূহলে কে না পড়েছেন? স্তঁাদাল, প্রসপার মেরিমি, গোঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় এডমণ্ড ও জুল এবং

মহিলা ঔপন্যাসিক জর্জ সাঁদের কথা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলা সম্ভব হল না। শুধু তাঁদের নামোল্লেখ করেই এখন বলছি কবিদের প্রসঙ্গ।

কথা সাহিত্যিকদের পাশাপাশি দেখা দেন বিরাট শক্তিশালী কবিরাও। উনিশ শতকের শুরুতেই আমরা পাই জাঁ পেয়ারে বেরেঙ্গা [১৭৮০-১৮৫৭], আলফোঁস দ্য লামার্টিন [১৭৯০-১৮৬৯] ও আঁদ্রে সেনিয়াকে [১৭৬২-৯৪], যাঁরা পারনেসীয় বা মহিমান্বিত গোষ্ঠীর অগ্রণী স্বরূপ। ভিক্তর হুগো এই দলের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, একাধারে কবি নাট্যকার ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক, যদিও বাইরের দুনিয়ায় তাঁর উপন্যাসই বেশী খ্যাত' রোমান্টিক আবেগ ও স্বপ্নে ভরা তাঁর গীতিকবিতাগুলি। এই ধারা ধরেই একে একে ওঠেন একেবারে বিশ শতকের সূচনা পর্যন্ত, আলফ্রেড দ্য মুসে [১৮১০—৫৭], লেকঁৎ দ্য লিল [১৮১৮—১৮৯৪], চার্লস বোদলেয়ার [১৮২১—৬৭], স্তেফান মালার্মে [১৮৪২—৯৮], পল ভার্লেন [১৮৪৪—৯৬] আর্থার রাবোঁ [১৮৫৪—৯১] প্রমুখ। দ্য মুসে ও ভার্লেন তীব্র হৃদয়াবেগের কবি। কবি মালার্মে জগতের নৈরাশ্য, বেদনা ও নশ্বরতাকে কাব্যে গ্রথিত করেছেন। দ্য মুসের ইতালী ও স্পেনের কাহিনী এবং ভার্লেনের স্যাটার্নাইন পোয়েমস যথার্থ গীতধর্মী কবিতার সংগ্রহ। দ্য মুসের কবিতা ব্যঞ্জনা প্রধান, ভাষাও অন্তর্মুখী। ভার্লেন তাঁর বিপরীত, তাঁর কবিতা প্রাঞ্জল এবং সুরেলা। মালার্মে এলবাম অব ভার্স এণ্ড প্রোজ নামক সংকলনে তাঁর সর্বোত্তম রচনাগুলি গ্রথিত করেছেন। এছাড়া আছে আফটার নুন অব এ ফন নামে তাঁর আরো একখানি বিখ্যাত বই। অপূর্ব হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর কবিতা একটু অস্পষ্ট। কিছু বোঝা যায়, কিছু ধরে নিতে হয়। এঁরা সিম্বলিষ্ট বা প্রতীকবাদী নামে পরিচিত। আর চার্লস বোদলেয়ার ও রাবোঁ পাপ, অন্যায় ও ঘৃণাকেই কাব্যের ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। তাই তাঁদের বলা হয় পঙ্কলোকের শিল্পী। প্রথমের দ্যা ফ্লাওয়ার অব ইভিল বা পাপের ফুল এবং দ্বিতীয়ের এ সিজন ইন হেল বা নরকে এক ঋতু প্রসিদ্ধ রচনা। বিশ শতকে এসে ফরাসী কবিতার ধরণ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়, যার কথা পরের অংশে বলা হবে। ফরাসী গদ্য লেখকদের কথা এখানে একটু বলা দরকার। প্রথম গণণীয় গদ্য লেখক হলেন নিকোলাস বৈলো [১৬৩৮—১৭১১], তাঁর দ্যা আর্ট অব পোয়েট্রি কাব্যতত্ত্বের চমৎকার ব্যাখ্যা। তাঁর পর উল্লেখ্য হলেন সাহিত্য সমালোচক এবং ভিক্তর হুগোর বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বী সাঁত বুভ। তিনিই প্রথম

সাহিত্য সমালোচনার সর্বজনগ্রাহ্য এমন একটা মানদণ্ড বেঁধে দেন, যা পরবর্তীকালের লেখকরা সবাই কমবেশী মেনে নেন। যীশুখ্রীষ্টের জীবন নামক গ্রন্থের লেখক সংশয়বাদী আর্নষ্ট রেনান [১৮২৩—৯২], ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা হিপোলাইট তেঁ [১৮২৮—৯৩], ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসকার জুল মিচেলেৎ [১৭৯৪—১৮৭৪] প্রভৃতির নামও এই সঙ্গে স্মরণীয়। সমসাময়িক ইউরোপের চিন্তা জগতে এঁদের প্রভাব একদিন বিশেষ ভাবে কাজ করেছিল। দার্শনিক আগুস্ত কোঁৎ [১৭৯৮—১৮৫৭] আর একটি অবিস্মরণীয় নাম। এঁর পজিটিভিজম থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র যে আহরণ করেন তাঁর অনুশীলন তত্ত্ব, এ কে না জানেন ?

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে যে ফরাসী সাহিত্যিকদের আবির্ভাব হয়, এখানে তাঁদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে, তারপর আমরা স্পেনীয় ও পর্তুগীজ সাহিত্যের প্রসঙ্গে আসব। যে সময়টুকুর কথা বলা হচ্ছে, তার মধ্যে পৃথিবীর ওপর দিয়ে দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ চলে গেছে। তার ফলে দুনিয়ার রাজনীতিক ও আর্থনীতিক জীবনে যেমন ঘটেছে প্রচণ্ড ভাঙা-গড়া, তেমনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার রাজ্যে অভাবনীয় উন্নতির ফলে মানুষের আয়ত্তে এসেছে গতি ও উৎপাদনের নব নব উপকরণ, যা সব দেশেই দিয়েছে সমাজ বিন্যাসের ছাঁচ বদলে। এই ক্রান্তিকালের সাহিত্যকে তাই বিগত ও অনাগত দুই দিনের সংযোগ সেতুরূপে দেখতে হবে। এই অধ্যায়ে ফ্রান্সে দেখা দেন রোমা রলাঁ, আনাতোল ফ্রাঁস, মার্শাল প্রুস্ত, রোশার মার্তা দুগা প্রমুখ দিকপাল ঔপন্যাসিক। আনাতোল ফ্রাঁসের বিখ্যাত বই হল সিলভেস্তার বোনার্দের অপরাধ, দেবদূতদের বিদ্রোহ এবং তেই। ধর্মের নামে ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে নির্বিচারে অন্ধতাকে কঠিন বিদ্রূপ করেছেন তিনি প্রথম বইটিতে। দ্বিতীয়টিতে দেখিয়েছেন আদর্শের বড়ত্ব কি দুর্দম অনিবার্যতায় ভেঙে পড়ে, বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাত ঘটলে। রলাঁ যৌবনে ১৪ই জুলাই, দাঁতঁ ও রোবসপীয়ের এই তিন খণ্ডে বিভক্ত ফরাসী বিপ্লবভিত্তিক নাটকমালা লেখেন। তারপর লেখেন বহু খণ্ডে বিন্যস্ত জাঁ ক্রিস্তফ উপন্যাস, যাতে ক্যাথলিক খ্রীষ্টীয় প্রত্যয়ের পরিবেশে এক সঙ্গীত সাধকের জীবনমুক্তির কাহিনী চিত্রিত হয়। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ব্যাখ্যাতা রূপে তিনি ভারতে বেশী সম্মানিত হন যদিও, কিন্তু তাঁর প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা পূর্বোক্ত রচনাগুলির জন্যেই। মার্শাল প্রুস্ত মার্তা দুগা

দুজনেই বহু খণ্ডে ব্যাপ্ত মহা উপন্যাসের রচয়িতারূপে প্রসিদ্ধ। প্রথমের অতীতকে স্মরণ করা এবং দ্বিতীয়ের থিবো পরিবার একদা খুব সমাদৃত বই ছিল। এঁদের পর ওঠেন অস্তিত্ববাদী লেখক গোষ্ঠী। তাঁদের মধ্যে অগ্রণী হলেন জাঁ পল সার্তর, আলবেয়া কামু, আঁদ্রে মালরো। এই ত্রয়ীর মধ্যে প্রথমের নোংরা হাত এবং সম্মানিত বিলাসিনী নাটক, দ্বিতীয়ের প্লেগ ও বহিরাগত উপন্যাস এবং তৃতীয়ের আশার দিন উপন্যাস বহু আলোচিত গ্রন্থ।

জীবনের কি কোন অর্থ আছে, না জীবন যেমন স্বয়ং ওঠে, তেমনি স্বয়ং শেষ হয়, শুধু মাঝের অধ্যায়টুকুতে বেঁচে থাকি বলেই মননশীল প্রাণী আমরা কর্তব্য নামে কতকগুলো কৃত্রিম জিনিস সৃষ্টি করেছি। অকৃত্রিম জীবন হল প্রকৃতির অনুগমন করা, অতএব পাপ পুণ্য, ভাল মন্দ, সবই তৈরি করা জিনিস, এই তত্ত্ব তুলে ধরেছে অস্তিত্ববাদ। এ হল পূর্ববর্তীয়দের ন্যাচারালিজম বা স্বভাববাদের পরের ধাপ। স্বভাববাদের আনুগত্যও করতে দেখা যায় অবশ্য কিছু লেখককে, যাঁদের মধ্যে জুল রমাঁ এবং আঁদ্রে জিদ সুখ্যাত। প্রথমের দেহের স্পন্দন এবং দ্বিতীয়ের সময় হয় নি কে না পড়েছেন? জিদের আত্মকথা বা জার্নালও বিশ্ববিখ্যাত। এই সময়ের মধ্যে যে মহান কবিদের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের মধ্যে সল্যে প্রুধোঁ, ফ্রেদারিক মিস্ত্রাল ও পল ভেলেরি অব্যবহিত আগের সিম্বলিষ্ট বা প্রতীকবাদী কবিদেরই পন্থানুসারী। প্রুধোঁকে প্রথম বারের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, ইউরোপের প্রবীণতম জীবিত দার্শনিক কবি বলে। মিস্ত্রাল প্রভেন্সের লোকভাষায় মিরিও নামক কাহিনী কাব্য লেখেন, যা পরে ফরাসীতে তিনি নিজেই অনুবাদ করেন। এই প্রেমকাব্য লোকভাষায় লিখেছিলেন; শোনা যায় তাঁর বান্ধবী এক কৃষক কন্যার পড়ার সুবিধা হবে বলে। ভেলেরী প্রকৃতপক্ষে মালার্মের উত্তর পুরুষ স্বরূপ। একই রকম মাধুর্য ও জীবন বেদনার কবি তিনি। জ্যাক প্রেভার, লুই আরাগঁ, পল এলুয়ের প্রমুখ বামপন্থী শিবিরের কবিদের কথাও এখানে উল্লেখ্য। বিশেষ করে এলুয়ের সত্যিই যুগ ও জীবন সচেতন মহৎ কবি। তাঁর কবিতা সারা জগতেই আদৃত হয়েছে।

ইতালী ও ফ্রান্সের মত স্পেনেও রেনেশাঁস নব জীবনের সূচনা করে এবং নাটকে গানে সাহিত্যে চিত্রকলায় তা শত মুখে উৎসারিত হতে থাকে। ইতালী ও ফ্রান্সের সঙ্গে এক জায়গায় কিন্তু স্পেনের তফাৎ ছিল। স্পেনে আরবরা বহুদিন বাস করার ফলে খ্রীষ্টীয় ও আরব সংস্কৃতিতে সেখানে বেশ কিছুটা মেশামেশি হয়েছিল। স্পেনের লোকগাথা ও চারণ গানে তাই একদিকে যেমন কীডের কাহিনী ও স্পেনীয় প্রেম সঙ্গীতের প্রাধান্য হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক কাহিনী এবং উপকথাও এসে মিশেছিল তার সঙ্গে। স্পেনের লোকসাহিত্যকে তাই অনেকে খুব মূল্যবান মনে করেন। কিন্তু বিদ্বজ্জনের সাহিত্য যা রচিত হয় স্পেনে রেনেশাঁসের প্রভাবে, তার গৌরবই হল সর্বাধিক। এই সময় ওঠেন দুই বিখ্যাত নাট্যকার, লোপ দ্য ভাগা [১৫৬২-১৬৩৫] ও কলদেরণ দ্য লা বার্কা [১৬০০-৮১]। দুজনেই এঁরা শেকসপীয়ারের শুধু সমসাময়িক নন, বহুজনের মতে প্রতিভাতেও তাঁর সমকক্ষ। লোপ দ্য ভাগা লেখেন অজস্র নাটক, তার মধ্যে ভেড়ার কুয়ো ও মালীর কুকুর সবচেয়ে নামকরা। ফোয়ান্তা অভিজুয়ানা নামে চাষী জীবন নিয়ে তিনি আর একখানি নাটক লেখেন, যাতে গোটা গ্রামকেই চিত্রিত করেছেন তিনি নাটকের পাত্র-পাত্রীরূপে। কলদেরনের জীবনটাই স্বপ্ন গুণীজনের বিচারে হ্যামলেটের মত অদ্বিতীয় কাব্য নাটক। ইংরেজ কবি শেলী এর কিছু অংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। এঁদের সঙ্গেই দেখা দেন লুই দ্য গনগোরা [১৫৩১-১৬২৭] এবং মিগুয়েল দ্য সারভেন্তিস [১৫৪৭-১৬১৬]। প্রথম জন হলেন বিখ্যাত কবি। একদিকে তিনি যেমন লিখেছেন গভীর ভাবাবেগ পূর্ণ গান ও কবিতা, অন্যদিকে তেমনি সোলেদাদেস বা আত্মার গভীরে নামে আছে তাঁর সুবৃহৎ কাব্য। এই কাব্যে প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য ও জীবনের দার্শনিক উপলব্ধি অপূর্ব কাব্যভাষায় রূপ পেয়েছে, যদিও এর অনেকাংশ এত জটিল যে বড় বড় পণ্ডিতও তার মর্মভেদ করতে পারেন না। সারভেন্তিস জগৎজোড়া নামের অধিকারী তাঁর ডন কুইকসোট বইয়ের জন্যে।

ডন কুইকসোট [প্রকৃত উচ্চারণ ডন কিহোটী] একটি ব্যঙ্গ উপন্যাস। তখনকার দিনে নাইটরা যে ধরনের মিথ্যা বীরত্বের ভড়ং করতেন, তা নিয়ে বিদ্রূপ করার জন্যেই সারভেন্তিস এতে এঁকেছিলেন কিহোটি ও তাঁর অনুচর সাংকো পাঞ্জার চরিত্র। উদ্ভট ও অসম্ভব নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে মানব প্রকৃতির দুর্বলতার দিকগুলো ফোটান হয়েছে এতে এত নিখুঁতভাবে যে আজও পর্যন্ত বইটি পুরান হয়নি। র‍্যাবলের গরগনতুয়া যে ধরণের বই, এও অনেকটা সেই রকম। কুয়েভেদো [১৫৮০-১৬৪৩] স্বয়েনস বা স্বপ্ন দর্শন নামে যে বই লেখেন অল্প পরে, তাও ব্যঙ্গরচনা। তবে তা ডন কুইকসোটের মত সরস ও সাহিত্য গুণ সম্পন্ন নয়, বিদ্রূপের সুর তাতে অতিশয় তীব্র ও দরদহীন।

কিন্তু রেনেশাঁসের প্রভাব স্পেনে স্থায়ী হল না। ইনকুইজিশনের নামে তীব্র ধর্ম কলহ, খ্রীষ্টানদের স্বগৃহ বিরোধ ও খুনোখুনি, মুরদের সদলবলে বিতাড়ন, আরমাদার যুদ্ধে ইংলণ্ডের হাতে পরাজয়, বিচিত্র ঘটনা পরম্পরায় স্পেনের রাজনীতিক গৌরব অস্তমিত হল। তার সাহিত্য ও সংস্কৃতির গৌরবও পড়তে শুরু করল সেই সঙ্গে। মধ্য সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতকে স্প্যানিশ সাহিত্যে এল জটিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার হাওয়া। পুরান আমলের সেই আবেগপূর্ণ গীতি কবিতা ও কাব্য নাটক আর তৈরি হল না। তার স্থানে এল ব্যক্তিগত আক্রমণ পূর্ণ ব্যঙ্গরচনা, নয়ত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিক নিবন্ধ, কিংবা বিশেষত্বহীন নাটক উপন্যাস। এলকো গ্রেসিয়ান [১৭০১-৫৮], পাদ্রে ইসলা [১৭০৩-৫৮], লিয়েনদ্রো ফারনানদেজ দ্য মোরাতেন [১৭৬০-১৮২৮] প্রমুখ লেখক উঠতে থাকেন পরের পর। মানুষের অধিকার নামে গ্রেসিয়ান একখানি মূল্যবান প্রবন্ধ পুস্তক লিখেছিলেন। ইসলার ফ্রে গেরুন্দিয়া উপন্যাস এবং মোরাতেনের এল লাসনিনাস বা সবইত খেলা নাটক এই সময়ের নামকরা রচনা। কিন্তু আজ এদের কথা কজনেরই বা মনে আছে? প্রখ্যাত সমালোচক আইয়ো লুজান [১৭০২-৫৪] তাঁর পোয়েটিকা নামক আলোচনা গ্রন্থটিও লেখেন এই সময়ে। এই বইয়ে সাহিত্যের আদর্শ বিশ্লেষণ করে তিনি সৎকাব্য ও নাটক কি তা বুঝিয়েছেন। শিল্প থেকে যে বারোক পদ্ধতি অর্থাৎ অলঙ্কার বহুল রচনারীতি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, লুজান তার ব্যাখ্যাতা রূপে প্রসিদ্ধ। ইতালীতে ক্রোচে এবং ইংল্যাণ্ডে বোসাঙ্কে ও ল্যাসেল এবারকুম্বে পরবর্তী কালে একই রকম খ্যাতিমান কাব্যতত্ত্ব ব্যাখ্যাতা

রূপে। উনিশ শতকে দেখা দেন বিখ্যাত কবি গুস্তাভ এদলফো বেকার [১৮৩৬-৭০], তারপর এন্তোনিও মেচেদো [১৮৫৭-১৯৩৯]। বেকারকে বলা হয় দুঃখবাদের কবি। জীবনের নশ্বরতা ও দুঃখের অনিবার্যতাকে ভাষা দিয়েছেন তিনি মনোরম গীতিকবিতায়। মেচেদো স্বপ্নাবেশের কবি। প্রেম প্রীতি ও আনন্দের গান ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। একজন মহিলা কবিও ছিলেন, তাঁর নাম রোজালিয়া [১৮৩৭-৮৫]। এই কবিরা সবাই শেলী ওয়ার্ডসওয়ার্থ বাইরন প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত। কেউ কেউ অনুবাদও করেছেন তাঁদের রচনা। আধুনিক কালেও স্পেনে শক্তিমান লেখকদের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের মধ্যে নাট্যকার জোসে এচেগ্যারে ও জেসিন্তো বেনাভাঁতে এবং ঔপন্যাসিক ব্লাস্কো আইবেনেজ ও বেনিতো পেরজ গ্যালদোস সারা ইউরোপে খ্যাতিসম্পন্ন। এচেগ্যারের সন অব ডন জুয়ান এবং বেনাভাঁতের তাঁর স্বামীর বন্ধু নাটক ইংরেজী অনুবাদে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে। একালের সন্দেহ ঘৃণা ও জিজ্ঞাসা দুজনেরই লেখায় ছায়াপাত করেছে। আইবেনেজের নিঃসঙ্গ পথিক এবং গ্যালদোসের অমিতব্যয়ী উপন্যাসও গভীর মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের পটভূমিতে যুগজীবনকে রূপ দিয়েছে। এই সঙ্গেই ওঠেন প্রখ্যাত কবি ও কাব্য-নাট্য রচয়িতা ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা [১৮৯৯-১৯৩৬], যিনি স্পেনে সাধারণতন্ত্র উচ্ছিন্ন এবং ফ্রাঙ্কো-শাসন প্রবর্তিত হলে ফ্যাসিষ্টদের হাতে নিহত হন। তাঁর হাঘরের গান কবিতা গ্রন্থ এবং রক্তাক্ত বিবাহ কাব্যনাট্য অতুলনীয় সৃষ্টি। সারা ইউরোপেই তিনি বিপ্লব ও গণমুক্তির কবিরূপে স্মরণীয়।

বার ॥ জার্মান সাহিত্য ॥

জার্মান সাহিত্যও যাত্রা শুরু করে মধ্যযুগেই মিনেসিংগার বা চারণদের গান এবং নিবলানজেন লোককাব্য দিয়ে। মিনেসিংগাররা সবাই ছিলেন অনামা। কিন্তু জনশ্রুতিতে ভর করে একজনের নাম ইতিহাসের পাদপীঠে এসে পৌঁছেছে, তিনি হলেন ওয়ালটার ফন ফোগেলভেড, যাঁর গান এখনো জার্মান মুল্লুকে বেঁচে আছে। এছাড়া উত্তর অঞ্চলের সাগাগুলি এবং ব্রুনহিল্ড ও সিগুর্ড প্রভৃতি পুরাণকথার বীরদের কাহিনীও ছড়াতে থাকে কাব্যগাথার আকারে। কিন্তু ইতালী, ফ্রান্স, স্পেন ও ইংল্যাণ্ডের মত জার্মানীতে সত্যিকার একটা বিদগ্ধ সাহিত্য গড়ে ওঠেনি রেনেশাঁসের প্রভাবে। বরং তার পর এসেছে যে রিফরমেশন বা সংস্কারের আন্দোলন, তার প্রভাবে জার্মানিতে জেগেছে নৈতিক বিশুদ্ধির চেতনা এবং গান, নাটক ও কাব্যাদির পরিবর্তে ধর্ম ও নীতি শাস্ত্র চর্চার দিকে পড়েছে শিক্ষিত মানুষের ঝোঁক। তার ফলে আদর্শ গদ্য লেখা আরম্ভ হয়েছে এই সময়। মার্টিন লুথারই [১৪৮৩-১৫৪৬] ভালগেট বা লঘু লাতিন ছেড়ে শুদ্ধ জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। আর এখান থেকেই গদ্যের বিস্তার শুরু হয়। আসলে জার্মান সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন ভলফগ্যাং ফন গ্যেটে [১৭৪৯-১৮৩২] এবং শুধু জার্মানির নন, গোটা জগতের ইতিহাসেই এক অদ্বিতীয় পুরুষ তিনি। রবীন্দ্রনাথ ও তলস্তয় ছাড়া তাঁর মত প্রতিভাধর মানুষই হননি কোন দেশে। কবি নাট্যকার ঔপন্যাসিক দার্শনিক বিজ্ঞানী শিল্পী রাষ্ট্রনায়ক, কি নন তিনি? সাহিত্যে গ্যেটের দান অজস্র। অপূর্ব গীতিকবিতা সংগ্রহ দীওয়ান, তরুণ ভের্টরের দুঃখ উপন্যাস, ফাউস্ট নাট্যকাব্য, আত্মজীবনী এবং আরো বহু অমূল্য রচনা সমৃদ্ধ করেছে তাঁর গ্রন্থাবলী। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল ফাউস্ট। আলকেমি বিদ্যাবিশারদ ডাঃ ফাউস্ট কি করে প্রেতাত্মাকে বশীভূত করে তার সাহায্যে বহু অবিশ্বাস্য ব্যাপার সম্ভব করেন, তারপর কি ভাবে তার হাতে আপন আত্মা বিসর্জন দেন, তার কাহিনী বলা হয়েছে দুই খণ্ডে বিভক্ত এই কাব্যনাট্যে। বৈজ্ঞানিক শক্তি ও আত্মিক শক্তির দ্বন্দ্ব দেখান হয়েছে এতে,

অতুলনীয় কাব্য ভাষায়। গ্যেটের পাশাপাশি ছিলেন তাঁরই বন্ধু ফ্রেডরিক শিলার [১৭৫৯-১৮০৫]। তিনিও কালজয়ী নাট্যকার। দস্যু দল, মেরী ষ্টুয়ার্ট, উইলিয়াম টেল প্রভৃতি বই লেখেন তিনি। গ্যেটের নেতৃত্বে জার্মানিতে ষ্টর্ম এণ্ড ড্রাং বা ঝড় ও বিক্ষোভ নামে যে সাহিত্যিক আন্দোলন হয়, শিলার এবং তাঁদের সমসাময়িক জোহন গটফ্রীড হার্ডার [১৭৪৪-১৮০০] তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। হার্ডার লোকগাথা-সংগ্রাহক ও সংস্কৃতি-বিজ্ঞান ব্যাখ্যাতা রূপে প্রসিদ্ধ। তাঁর নানা জাতির কণ্ঠ নামক বই এখনো প্রামাণ্য সংকলন'রূপে সম্মানিত। হেনরিক হাইনে [১৭৯৭-১৮৫৬] ও জোহান ক্রশচান হেল্ডারলিন [১৭৭০-১৮৪৩] এঁদের পরবর্তী কবি। হাইনে গীতিকবি রূপে শেলী'ও ভার্লেনের মতই যশস্বী। রেশমের মত নরম তাঁর ভাষা, সুর ও স্বপ্নে ভরপুর তাঁর প্রতিটি কথা। কোন কোন কবিতায় তাঁর ভারতীয় দর্শন ও জীবনচিন্তার ছাপ দেখা যায়। হাইনে ছিলেন ইহুদী এবং একদা তাঁর ব্যক্তিত্বও তাঁর প্রতিভার মতই সম্মানার্হ ছিল। রোমান্সেরো এবং শেষ কবিতা তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা। হেল্ডারলিন ছিলেন শহুরে কবি এবং তাঁর রচনায় ভাবাবেগের চেয়ে বুদ্ধির প্রাধান্য বেশী দেখা যায়। ক্ল্যাসিকপন্থী হাইপেরিয়ানের গান তাঁর বিখ্যাত রচনা। ডেটলেভ লিলিয়েনকর্ন [১৮৪৪-১৯০৯], উগো হফম্যানসতাল [১৮৭৪-১৯২৪], রেইনার মারিয়া রিলক্যে [১৮৭৫-১৯২৬], রিচার্ড ডেহমেল [১৮৬২-১৯২০], স্তেফান জর্জ [১৮৬৮-১৯১৩] প্রমুখ কবি এই শতাব্দীতেও বিশেষ যশস্বী হয়েছিলেন। হফম্যানসতাল ও রিলক্যে অবশ্য অস্ট্রিয়ান, যদিও একালীন জার্মান কবি রূপে পাঁচজনই, বিশেষত রিলক্যে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। তাঁকে বলা যেতে পারে হাইনে ও রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী। বাঙালীর তিনি প্রিয় কবি।

অবশ্য কাব্য নাটক যেমন একদিকে জার্মান সাহিত্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে, অন্যদিকে তেমনি দর্শন বিজ্ঞান এবং ইতিহাসেও জার্মানরা মানবজাতিকে অসীম ঋণে আবদ্ধ করেছেন। কাণ্ট হেগেল লেসিং শোপেনহাউয়ার নীটশে প্রমুখ দার্শনিক এবং স্পেংলার হাউসোফার ভিলথাই মমসেন প্রমুখ ইতিহাস-বিদ একদিকে, অন্যদিকে মার্কস এঙ্গেলস ফ্রয়েড আইনষ্টাইন মিলিকান প্রমুখ বিজ্ঞানী যে চিন্তার পরিমণ্ডল রচনা করেন, সমগ্র মানবসমাজই তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং তাঁদের চিন্তাধারা অনুসরণ করেই পৃথিবীর দিকে দিকে বিরাট সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্পদ তৈরি হয়েছে আজ। কাণ্টের চিন্তার সঙ্গে

ভারতীয় অদ্বৈততত্ত্বের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। শোপেনহাউয়ার অনুরাগী ছিলেন উপনিষদের। নীটশে প্রচার করেন অতিমানববাদ, যা আশ্রয় করে একনায়ক হিটলারের আবির্ভাব হয়। স্পেংলার পশ্চিমী সভ্যতার ক্ষয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। ফ্রয়েড দেন অবচেতন লোকের বন্ধ দ্বার খুলে। মার্কস উদ্‌ঘাটন করেন সামাজিক দারিদ্র্যের আদি উৎস। আইনষ্টাইন বদলে দেন গোটা জগৎচিন্তার মূল কাঠামো। প্রত্যক্ষত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হলেও, সবগুলি মতই স্পর্শ করেছে কোন না কোন ভাবে এ যুগের জীবন ও সাহিত্যকে। সেই জন্যই এদিকে একটু তাকান দরকার। কিন্তু ও কথা থাক। বিশুদ্ধ সাহিত্যও এ যুগে জার্মানিতে রচিত হয়েছে প্রচুর এবং উপন্যাসে ছোট গল্পে ও নাটকে অসামান্য লেখক উঠেছেন অনেক। উপন্যাসে জেকব ভেসারমান [১৮৭৩-১৯৩৪], টমাস মান [১৮৭৫-১৯৫০], হেরমান হেস [১৮৭৭-১৯৬২], ফ্রাঞ্জ কাফকা [১৮৮৩-১৯২৪] প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত লেখকের আবির্ভাব হয়। ভেসারমানের জগতের মায়া এবং হংসমানব তীব্র জীবন দ্বন্দ্বের কাহিনী। ফরাসী সাহিত্যে ব্যালজাক ও রুশ সাহিত্যে দস্তয়েভস্কী যে পর্যায়ের ঔপন্যাসিক, ভেসারমান অনেকটা সেই পর্যায়ের। টমাস মানও অসাধারণ লেখক। তাঁর জাদুর পাহাড়, কালো হংসী এবং মাথা বদল অদ্বিতীয় রচনা। মান ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর কাহিনীর মধ্যে তাই গল্পবস্তুকে ছাপিয়ে পদে পদে গভীর জ্ঞানের কথা এসে পড়ে। তাঁর ম্যাজিক মাউন্টেন বা জাদুর পাহাড় উপন্যাসে সুইজারল্যাণ্ডের আরোগ্য নিবাসে আগত এক ব্যক্তির সঙ্গে বহু নরনারীর আলাপ পরিচয় ও ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে একটি সার্বভৌম উপলব্ধিকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে। ব্যাখ্যানে বিশ্লেষণে অসাধারণ বই এটি। ইহুদী হওয়ার অপরাধে হিটলারী আমলে তাঁকেও ফ্রয়েড ও আইনষ্টাইনের মত দেশছাড়া হতে হয়। হেসের সিদ্ধার্থ সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থ হলেও, বিপর্যয় আসছে বই-ই অনেকের মতে তাঁর যুগান্তকারী রচনা। ভবিষ্যবাদী দার্শনিক লেখক তিনি। কাফকার দ্যা কাসল বা দুর্গ এবং আমেরিকা আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস, যদিও কাফকা জীবনকালে এর কোনটাই ছাপিয়ে যাননি এবং মৃত্যুর আগে সবই পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলিষ্ঠ রচনাভঙ্গীর অধিকারী হলেও, ছিলেন চরম নৈরাশ্যবাদী লেখক এবং মনে করতেন, বিশ্বসৃষ্টির মূলে আগাগোড়াই নিহিত আছে এমন সব অসঙ্গতি, যা কোন জীবনকেই সুস্থ

পরিণতিতে যেতে দেয় না। হেরমান জুডারমান [১৮৫৭—১৯২৮] এবং পল হেজে [১৮৩০—১৯১৪] প্রমুখ লেখকও একসময় বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। জুডারমানের সং অব সংস বা মহাসঙ্গীত উপন্যাস এবং ইণ্ডিয়ান লিলি গল্পসংগ্রহ মনোরম রচনা। হেজের লারাবেতিয়া বা রণচণ্ডী নামক গল্প জার্মান সাহিত্যের অতুলনীয় গল্পগুলির একটি। এক তরুণ মাঝি কি করে বদরাগী একটি মেয়েকে বশ্যতা স্বীকার করিয়ে বিবাহ করল, তারই করুণ মধুর কাহিনী বলা হয়েছে এতে।

কথাসাহিত্যের মত নাটকে ও আধুনিক জার্মানির দানের পরিমাণ অল্প নয়। একালীন নাট্যকার গোষ্ঠীর উল্লেখ করতে হলে, একে একে বলা দরকার গেরহার্ট হাউপ্টমান [১৮৬২—১৯২৬], বার্টোলট ব্রেখট [১৮৯৮—১৯৫৬], আর্নষ্ট টলার [১৮৯৩—১৯৩১], আর্থার সিনৎ জেলার [১৮৬২—১৯৩১] প্রমুখের নাম। হাউপ্টমানের ডুবো ঘণ্টা এবং তাঁতী নাটকই প্রথম বাস্তববাদী নাটকের জমি তৈরি করে। তাঁর নিঃসঙ্গ জীবন দাম্পত্য অসমন্বয়ের নাট্যভাষ্য হিসাবেও তুলনাহীন। নিগৃহীত নীচু তলার মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল এই নাট্যকার নোবেল প্রাইজ পান। ব্রেখট ছিলেন মানব মুক্তি আন্দোলনের নায়ক, মার্কসপন্থী কবি ও নাট্যকার রূপে বিশ্বখ্যাতির অধিকারী। তাঁর মাদার কারেজ, গ্যালেলিও এবং প্রাইভেট লাইফ অব মাষ্টার রেস বা প্রভু জাতির গুপ্তজীবন হিটলারী আমলে বিপজ্জনক বই বলে বিবেচিত হয় এবং তাঁকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। সারা পৃথিবীতেই তিনি প্রতিরোধ সাহিত্যের অন্যতম অগ্রনায়ক রূপে আজও সম্মানিত। ম্যান এণ্ড মাসেস বা মানুষ ও জনতা এবং অন্ধ দেবী প্রভৃতি নাটকের লেখক টলারও অনাচার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধরেই অমর হন। দেশে ঠাঁই হয় নি তাঁরও, যেমন হয়নি পশ্চিম সীমান্তে সব শান্ত বা অল কোয়ায়েট অন দ্যা ওয়েষ্টার্ন ফ্রণ্ট উপন্যাসের লেখক এরিয়া রেমর্ক এবং সুপ্রসিদ্ধ জীবনীকার প্রাবন্ধিক স্তেফান জুইগ [১৮৮১—১৯৪২] প্রভৃতিরও। টলার এবং জুইগ ও তাঁর পত্নী অশান্ত সমাজ পরিবেশে বাঁচা অসম্ভব বুঝে আত্মহত্যা করে জীবন শেষ করেন। সিনৎ জেলারও এই সময়ের একজন মননশীল নাট্যকার। তাঁর দোলনা, অধ্যাপক বার্নার্ড প্রভৃতি বইয়ে যুগ ও জীবন সমস্যার নানাদিক প্রতিফলিত হয়েছে। বলা দরকার যে জুইগ ও সিনৎ জেলারও অষ্ট্রিয়ার অধিবাসী ছিলেন। জার্মান ভাষায় অপেরা বা গীতপ্রধান

নাটক উনিশ শতকে প্রথম প্রবর্তন করেন রিচার্ড ভাগনার [১৮১৩—১৮৮৩] এবং তখন থেকে অদ্যাবধি অপেরায় জার্মানির বৈশিষ্ট্য অব্যাহতই আছে। যেমন ব্রেখট প্রবর্তিত এপিক থিয়েটারের ছাঁচ এখন সারা পৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। শিশু সাহিত্যেও জার্মানির দান নগণ্য নয়। গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের [জেকব লুডভিগ ও উইলহেলম কার্ল] রূপকথা বা ফেয়ারী টেলস সারা বিশ্বের শিশুচিত্ত আজও মোহিত করে রেখেছে। বাংলাতেও এঁরা বিশেষ আদৃত। সকলেই অবশ্য একথা জানেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে জার্মানিতে ওঠেন এক নায়ক এডলফ হিটলার। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তিনি শুরু করেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। হিটলার ছিলেন একই সঙ্গে ইহুদী বিদ্বেষী এবং সাম্যবাদ ও শিল্প সাহিত্যের পরম শত্রু। তার ফলে সমৃদ্ধ জার্মান সাহিত্য ও তার মহান সেবকদের কি দুর্দশা হয়, তা ত আমরা আগেই দেখিয়েছি। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধেও জার্মানী হেরেছে এবং বঙ্গভূমির মত বিরাট জার্মানভূমিও দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। তার সাহিত্য সংস্কৃতির সাম্প্রতিক খবর তাই আমরা এখনো খুব বেশী পাই না। গুণ্টার গ্রাস প্রমুখ দু-একজনের লেখা অবশ্য হাতে এসেছে আমাদের।

তের ॥ ইংরেজী সাহিত্য ॥

এবার ইংরেজী সাহিত্যের প্রসঙ্গ। যে ইংরেজী ভাষা আমরা এখন পড়ি ও লিখি, আদিতে তার রূপ এ রকম ছিল না। ইংল্যাণ্ডের সাবেকী ভাষা ছিল এংলো-স্যাক্সন। যে বিউলফ কাব্যের কথা গোড়ায় বলেছি, তা লেখা হয়েছিল সেই ভাষায়। এংলো-স্যাক্সন ভাষায় আরো অনেক রচনা পাওয়া যায়, যার মধ্যে ক্যাডমন-কৃত বাইবেলের অংশ বিশেষের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। ধীরে ধীরে ঐ ভাষা বদলাতে বদলাতে বর্তমান ইংরেজী ভাষায় রূপ নেয়, যেমন ভাবে চর্যাপদের ভাষা থেকে আমাদের বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে। প্রথমে ইংরেজী ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হয়, তাতেও লোকগাথা গান ও বীরকাহিনীর প্রাধান্য দেখা যায়। এসবের মধ্যে রাজা আর্থার ও তাঁর বীর নাইট গ্যালাহাড গাওয়েন প্রভৃতির কথা আছে। আছে রবিন হুডের কথা, আর আছে বাইবেলের ঘটনা নিয়ে রচিত অভিনয়যোগ্য পালা, যাকে বলা হত মিরাকল প্লে। এই সব পালা থেকেই পরে ইংরেজী নাটক তৈরি হয়। রেনেশাঁস বা নব জাগরণের প্রভাবে যে নূতন জীবনচেতনা এল রাণী এলিজাবেথের সময়কার ইংল্যাণ্ডে, তার ফলে জ্ঞানবিজ্ঞানের যেমন হল অসাধারণ উন্নতি, তেমনি ইংরেজের প্রভাব প্রতিপত্তিও পৃথিবীর দিকে দিকে ব্যাপ্ত হল। এই সময়ে যে সাহিত্য রচিত হল, প্রকৃত পক্ষে ইংরেজী সাহিত্যের সেখান থেকেই যাত্রা শুরু হয় এবং এই নূতন সাহিত্যের স্রষ্টা যাঁরা, তাঁদের মধ্যমণি হলেন মহাকবি শেকসপীয়ার, যাঁকে শুধু ইংরেজ নয়, জগতের সকল জাতিই সর্বকালের মহান স্রষ্টা বলে মানেন। কিন্তু শেকসপীয়ারের আগেও ইংরেজীতে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। ল্যাংল্যাণ্ড নামক এক কবি লেখেন পিয়ার্স প্লাউম্যান কাব্য, যাতে ১৩ শতকের কৃষক বিদ্রোহ বর্ণিত হয়েছে। তারপর একে একে উঠেন জিওফ্রে চসার [১৩৪০—১৪০০], এডমণ্ড স্পেন্সার [১৫৫২—৯৯] এবং আরো দুচার জন কবি। চসারের শ্রেষ্ঠ বইয়ের নাম ক্যাণ্টারবেরী টেলস। টারবাড সরাইখানা থেকে একদল যাত্রী রওনা হয় ক্যাণ্টারবেরীতে। পথে তারা যেসব গল্পগুজব করে, তাই হল এ কাব্যের বিষয়। এই অসমাপ্ত কাব্যের

প্রস্তাবনাতে চসার লোকচরিত্র অংকনে অসামান্য সূক্ষ্মদৃষ্টি ও কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। স্পেন্সার ফেয়ারী কুইন কাব্যে রাণী এলিজাবেথের জীবন কেন্দ্র করে এক মন্থর কাহিনী রূপকাকারে উপস্থিত করেছেন। ইনিও অসাধারণ কবি। এঁর লেখা এপিথেলমিয়ান সনেটগুচ্ছ সুন্দর। সনেট এই সময় লেখনে ফিলিপ সিডনি আর্ল অব সারে প্রভৃতিও। এঁরা ছিলেন সবাই এলিজাবেথের সভাসদ।

আগেই বলেছি উইলিয়াম শেকসপীয়ার [১৫৬৪-১৬১৬] হলেন ইংল্যাণ্ডের তথা জগতের মহত্তম কবি। সব শুদ্ধ ছত্রিশখানি নাটক, দুখানি কাব্য-কাহিনী এবং একগুচ্ছ সনেট লিখেছেন তিনি, যার সবটুকুই সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার যোগ্য। মানব চরিত্রজ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ, তত্ত্বদৃষ্টি, শিল্প-কৌশল, কোন ক্ষেত্রেই তাঁর সমকক্ষ কবি কোন দেশে জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয় তাঁর নাটকগুলিকে। ট্র্যাজেডী বা বিষাদান্ত, কমেডী বা পুলকান্ত, আর ইতিহাস। ট্র্যাজেডীর মধ্যে ওথেলো, হ্যামলেট, লীয়ার ও ম্যাকবেথ, এই চারখানি হল অগ্রগণ্য। কমেডীর মধ্যে এজ ইউ লাইক ইট বা যেমনটি চাও, মিড সামার নাইট'স ড্রিম বা মধ্য গ্রীষ্মের নিশীথ স্বপ্ন, কমেডী অব এরার্স বা ভ্রান্তিবিলাস, মার্চেন্ট অব ভেনিস বা ভেনিসের সওদাগর এবং টেম্পেষ্ট বা ঝটিকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইতিহাস পর্যায়ে তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজবংশকে নাট্যকাহিনীর মধ্যে অমর করেছেন। এইসব নাটক পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির ভাষায় অনূদিত হয়েছে, সর্বত্র অভিনীত হয়েছে। আজও এরা পুরান হয়নি। শেকসপীয়ারের সনেটও অতুলনীয়। তাঁর সমকালে নাটকের খুব সমাদর ছিল। উঠেছিলেনও অনেক নাট্যকার। তাঁদের মধ্যে খ্রীষ্টোফার মার্লো [১৫৬৪-৯৩] এবং বেন জনসন [১৫৭৩-১৬৩৭] বিখ্যাত। মার্লোর টেমারলেন ও ডক্টর ফস্টাস বহু আলোচিত বই। টেমারলেনে চিত্রিত করেছেন তিনি তৈমুর লঙের চরিত্র। ডক্টর ফষ্টাসে আছে সেই বিখ্যাত জাদুকর বিজ্ঞানীর কাহিনী, যাকে গ্যেটে অমর করেছেন ফাউষ্ট গ্রন্থে। বেন জনসনও অনেক নাটক লেখেন, তার মধ্যে এভরি ম্যান ইন হিজ হিউমার বা প্রত্যেক মানুষ চলেছেন তাঁর মেজাজ মত এবং ভলপোনে এক সময় বিশেষ প্রশংসিত বই ছিল। দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন [১৫৬১-১৬২৬] এই সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল গদ্য লেখক। ফরাসী পণ্ডিত মতেঁর মত তিনিও বহু বিচিত্র বিষয় নিয়ে এস্সে বা প্রবন্ধ লিখেছেন। মজার কথা যে এক সময় অনেকে রটিয়ে-

ছিলেন যে শেকসপীয়ারের নাটকগুলি এঁরই লেখা। বলা বাহুল্য তা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শেকসপীয়ারের পর ইংরেজী সাহিত্যে এল প্রকাণ্ড একটা পরিবর্তনের হাওয়া। এলিজাবেথীয় যুগের স্বাধীন চিন্তা ও অবাধ কল্পনা বাধা পেল। প্রটেষ্টাণ্ট নীতিবাগীশদের কড়াকড়ি সর্বক্ষেত্রের মত সাহিত্যেও তার অশুভ ছায়াপাত করল। এই সময়ের একমাত্র শ্রেষ্ঠ কবি জন মিল্টন [১৬০৮-৭৪]। তাঁর প্রধান দুখানি কাব্য হল প্যারাডাইজ লষ্ট বা স্বর্গচ্যুতি ও প্যারাডাইজ রিগেণ্ড বা স্বর্গ ফিরে পাওয়া। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে আদম ও ইভ কি ভাবে স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছিলেন, তা বলা হয়েছে প্রথম বইয়ে, আর মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্রুশে প্রাণ দিয়ে খ্রীষ্ট কি করে আবার হারান স্বর্গ এনে দিয়ে ছিলেন মানুষকে, তা বলা হয়েছে দ্বিতীয় বইয়ে। রচনার গাম্ভীর্যে প্রথম বই নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম প্রধান মহাকাব্য। স্যামসন ও ডেলাইলার কাহিনী নিয়ে গ্রীকদের আদর্শে একখানি ট্র্যাজেডীও লিখেছিলেন মিল্টন। এ ছাড়া তাঁর খণ্ড কবিতা, সনেট এবং এরিওপেগিটিকা নামক গদ্যগ্রন্থ আছে, যা এখনো উচ্চ শিক্ষার্থীদের পড়তে হয়। মিল্টনের পর দেখা দেন দুজন নামী কবি, জন ড্রাইডেন [১৬৩১-১৭০০] ও আলেকজাণ্ডার পোপ [১৬৮৮-১৭৪৪] এবং প্রথম জন ভার্জিলের এবং দ্বিতীয় জন হোমারের অনুবাদক হিসাবে যেমন খ্যাত, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গকবিতা লেখক হিসাবেও স্মরণীয়। ড্রাইডেনের এবসোলাম ও একিটোফেল এবং ম্যাকফ্লেকনো আর পোপের রেপ অব দ্যা লক বা কেশকর্তন এবং ডানসিয়াড বা মূর্খের মহাভারত সমসাময়িক সমাজে বহুপঠিত বই ছিল। পোপের এস্সে অন ম্যান বা মনুষ্যবিষয়ক রচনা নামেও একখানি কাব্য আছে। অনুপ্রেরণাহীন কৃত্রিমতার জন্যে এঁদের রচনা কালজয়ী হয়নি। ড্রাইডেন ও পোপের অল্প পরে ওঠেন টমাস গ্রে [১৭১৬-৭১], যিনি বিগত ও অনাগত দুই ধারার সংযোগ সূত্ররূপে লেখেন তাঁর এলিজি—বা গ্রাম্য গির্জায় লেখা শোকগাথা। এঁদের পর স্কটল্যাণ্ডের গ্রাম্য কবি রবার্ট বার্ণস [১৭৫৯-৯৬] সরল আবেগপূর্ণ গীতিকবিতা লেখা শুরু করেন তাঁর আঞ্চলিক লোক ভাষায় এবং উইলিয়াম ব্লেক [১৭৫৬-১৮২৭] প্রমুখ কবিও কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে মৃদু আকারে অভিযান শুরু করেন। সেই ধারাই অল্প পরে সাহিত্যের ইতিহাসে যাকে রোমাণ্টিক রিভাইভাল বা রসাবেশের পুনর্জাগরণ বলা হয়, সেই আন্দোলনে রূপ নেয়। তার কথা পরের অধ্যায়ে বলা হবে।

২.

নাটক ও কবিতার পাশাপাশি ইংরেজী সাহিত্যে সংস্কৃতিসমৃদ্ধ গদ্যেরও বিরাট জয়যাত্রা লক্ষ্য করা যায়। চসারের সময়ই পাদ্রী জন ওয়াইক্লিফ [১৩১০-৮৪] বাইবেলের অনুবাদ করেছিলেন। টমাস ম্যালোরি [১৩৯৪-১৪৭১] লিখেছিলেন মোর্ট ডি আর্থার, অর্থাৎ রাজা আর্থারের মৃত্যু কাহিনী। শেকসপীয়ার সমসাময়িক দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকনের কথা ত আগেই বলেছি। জন বানিয়ান [১৬২৮-৮৮] লেখেন পিলগ্রিম্স প্রগ্রেস বা যাত্রীর অগ্রগতি, যাতে রূপকাকারে খ্রীষ্টীয় ধর্মজিজ্ঞাসার বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। টম ব্রাউন, আইজাক ওয়ালটন, স্যামুয়েল পেপিস, আরো বহু গদ্য লেখক ওঠেন, যাঁদের লেখার একসময় বিশেষ সমাদর ছিল। তারপর দেখা দেন দুই বন্ধু জোসেফ এডিসন [১৬৭২-১৭১৯] ও রিচার্ড স্টীল [১৬৭২-১৭২৯], যাঁরা স্পেক্টেটর নামক পত্রিকায় নানা বিষয় নিয়ে সরস ও উপভোগ্য এস্সে বা প্রবন্ধ লিখে প্রসিদ্ধ হন। প্রথমের মির্জার স্বপ্ন একটি বিখ্যাত রচনা। রোজার ডি কভারলির কাহিনীও তাঁর স্মরণীয় লেখা। ড্যানিয়েল ডিফো [১৬৬০-১৭৩১] এবং জোনাথন সুইফ্‌টের [১৬৬৭-১৭৪৫] নামও এই সঙ্গেই উল্লেখ্য। দুজনই এঁরা দুখানি জগদ্বিখ্যাত বইয়ের লেখক। প্রথমের রবিনসন ক্রুসো ও দ্বিতীয়ের গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত কে না কৈশোরে পড়েছেন? জনহীন দ্বীপে নির্বাসিত আলেকজাণ্ডার সেলকার্কের সত্যকার কাহিনী নিয়েই লেখা হয়েছিল ক্রুসোর বিবরণ। গালিভার ছোটদের জন্য লেখা বই নয়, তার অন্তর্লোকে নিহিত আছে গভীর একটি ব্যঙ্গের কাঠামো। কিন্তু যে সরস কাহিনীর আবরণে মোড়া হয়েছে তা, যেটি ছোটবড় সকলেরই উপভোগ্য। এঁদের পর গণনীয় গদ্য লেখক হলেন স্যামুয়েল জনসন [১৭০৯-৮৪], যিনি একাধারে নামকরা সমালোচক, অভিধান সংকলক ও জীবনী লেখক। তাছাড়া তিনি এমন একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর নায়ক ছিলেন, যার মধ্যে কবি গোল্ডস্মিথ, নাট্যকার শেরিডন ও বাগ্মী বার্কের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জনসনের কবি জীবনী গ্রন্থমালা এক কালে খুব বিখ্যাত বই ছিল। জেমস বসওয়েল লিখিত জনসনের জীবনী ও কথোপকথন সংক্রান্ত বইটি ইংরেজী সাহিত্যে ত চিরস্মরণীয়ই। ইংরেজী সাহিত্যে উপন্যাসেরও জন্ম হয় এই সময়ই। টোবিয়াস স্মোলেট লেখেন রোডেরিক র‍্যাণ্ডম, স্যামুয়েল রিচার্ডসন লেখেন প্যামেলা এবং হেনরি ফিলডিং [১৭০৭-৫৪] লেখেন টম জোন্স, যা অষ্টাদশ শতকী ইংল্যাণ্ডের

সমাজ ও সংস্কৃতির দর্পণ হিসাবে মূল্যবান। তখনো পুরান জমিদারী প্রথা ভেঙে পড়েনি। বাষ্প ও বিদ্যুৎ প্রভাবিত একালীন নগর ও নাগরিক সংস্কৃতিও জন্মায়নি। তবে ভাঙনের হাওয়া লেগেছে এবং তার ফলে যে সাবেকী গার্হস্থ্য আদর্শে চীড় ধরেছে, প্যামেলায় এবং টম জোন্সে তার আভাস খুব স্পষ্ট। বেপরোয়া তারুণ্যের ছবি পাওয়া যায় রোডেরিক র‍্যাণ্ডমে।

খাঁটি উপন্যাস ইংরেজী সাহিত্যে একটু বিলম্বে প্রকাশমান হলেও, নাটক কিন্তু শেকসপীয়ার পরবর্তীকাল থেকেই অব্যাহত ধারায় লিখিত ও অভিনীত হয়ে চলেছে ইংরেজ মুল্লুকে। তবে রেষ্টোরেশন যুগের নাট্যকাররা দু-একজন ছাড়া কেউ পুরাণ বা ইতিহাসের বিষয় নিয়ে কাব্যনাট্য লেখেন নি। সবাই লিখেছেন গদ্যে সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে হৃদ্য নাটক বা কমেডী। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন উইলিয়াম কনগ্রীভ [১৬৭০-১৭২৯], অলিভার গোল্ডস্মিথ [১৭২৮-৭৪], রিচার্ড ব্রিনসলো শেরিডন [১৭৫১-১৮১৬] প্রমুখ। কনগ্রীভের ওল্ড ওয়াইফ্'স টেল বা বুড়ো বউয়ের কাহিনী এবং দ্যা ওয়ে অফ দ্যা ওয়ার্লড বা দুনিয়ার রীতি সত্যিই চমৎকার বই। গোল্ডস্মিথ ডেজার্টেড ভিলেজ বা উজাড় গ্রাম নামক কাব্য এবং ওয়েকফীল্ডের ভাইকার নামক উপন্যাস লিখলেও, তাঁর গুড নেচারড ম্যান বা সৎস্বভাবের মানুষ এবং শী স্টুপস টু কনকার বা ভদ্রমহিলা জেতার জন্যে হার স্বীকার করলেন নাটকই তাঁর অধিকতর সফল সৃষ্টি। শেরিডনের স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল বা পরনিন্দার পাঠশালাও অপূর্ব কৌতুকনাট্য। এই বইয়ের মিসেস ম্যালাপ্রপ্ চরিত্রটিকে ভিত্তি করেই ম্যালাপ্রপিজম কথাটা চালু হয়েছে ইংরেজী ভাষায়। এরপর উনিশ শতকে ইংরেজী সাহিত্যে এল সৃষ্টির জোয়ার এবং কাব্যে কথাসাহিত্যে ও গদ্য রচনায় শতমুখে উৎসারিত হল ইংরেজের প্রতিভা। আগেই বলা হয়েছে যে এই যুগকে রোমান্টিক রিভাইভাল বা রসাবেশের পুনর্জাগরণের যুগ বলে। এই অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ [১৭৭০-১৮৫০], স্যামুয়েল টেলার কোলরিজ [১৭৭২-১৮৩৪], গর্ডন জর্জ বাইরন [১৭৮৮-১৮২৪], পার্সি বিশি শেলী [১৭৯২-১৮২২] ও জন কীটস [১৭৯৫-১৮২১]। জীবনের বিচিত্র কামনা কল্পনা ও স্বপ্নকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন এঁরা। সংসার ও সমাজের নানা সংকট এবং সমস্যাকে দিয়েছেন স্বীকৃতি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ব্যাখ্যা করেছেন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের স্বরূপ। শেলী গেয়েছেন মানবমুক্তির গান। বাইরন ভাষা দিয়েছেন জীবন তৃষ্ণা ও যৌবনা-

বেগকে। কীটস সত্য ও সৌন্দর্যের অচ্ছেদ্যতার এবং কোলরিজ স্বপ্নাবেশ-সম্ভূত উপলব্ধির ভাষ্যকার। ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসী পর্যায়ের গীতিকবিতাগুলি, শেলী ও কীটসের ওডগুলি, বাইরনের চাইল্ড হেরল্ডের কোন কোন অংশ এবং কোলরিজের কুব্লাখান বিশ্ববিখ্যাত। এঁদের পর ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত কবি হলেন রবার্ট ব্রাউনিং [১৮১২-৮৯], আলফ্রেড টেনিসন [১৮০৯-৯২] এলগারনন সুইনবার্ন [১৮৩৭-১৯০৯], দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটী [১৮২৭-৮২], উইলিয়াম মরিস প্রমুখ। প্রথমোক্ত দুজন ভিক্টোরিয়া যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, শেষোক্ত তিনজন ওঁদের ঈষৎ পরবর্তী। এঁদের মধ্যে রসেটী ও মরিস চিত্র শিল্পীরূপেও প্রসিদ্ধ। এঁদের বলা হয় প্রি-রাফেলাইট বা র‍্যাফেল-পূর্ববর্তী ধারার স্রষ্টা। ব্রাউনিং জীবনের নানা জটিলতাকে কবিতায় ভাষা দিয়েছেন। তাঁর কবিতা দুরূহ দার্শনিকতার জন্যে প্রসিদ্ধ। টেনিসন প্রচার করেছেন মানব মঙ্গলের বার্তা। রসেটী সুইনবার্ণ ও মরিস গেয়েছেন সৌন্দর্য ও আনন্দের গান।

এ যুগে প্রসিদ্ধ গদ্যলেখকও ওঠেন অনেক। তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম হেজলিট [১৭৭৮-১৮৩০], চার্লস ল্যাম্ব [১৭৭৫- ৮৩৪], টমাস কার্লাইল [১৭৯৫-১৮৮১], জন রাস্কিন [১৮১৯-১৯০০], টমাস ব্যাবিংটন মেকলে এবং ম্যাথু আর্নল্ড [১৮২২-৮৮] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি কোলরিজও একজন বিশিষ্ট গদ্যলেখক। তিনি এবং হেজলিট ও আর্নল্ড সাহিত্য সমালোচক রূপে খ্যাতিমান। রাস্কিন করেছেন শিল্প সমালোচনা। কার্লাইল লিখেছেন ফরাসী বিপ্লবের এবং মেকলে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস। ল্যাম্ব ইলিয়ার রচনাবলী নামে হাল্কা সুরের প্রবন্ধ লিখে সমাদৃত। আর একজন গদ্য লেখক হলেন ডিকুইন্সী, যাঁর আফিং খোরের জবানবন্দী দেখেই বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কমলাকান্তের দপ্তর ফেঁদেছিলেন। এইসময় দেখা দেন আইভানহো, কেনিলওয়ার্থ প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচয়িতা ওয়ালটার স্কট [১৭৭১-১৮৩২]। ভিক্টোরীয় যুগের প্রসিদ্ধ দুই ঔপন্যাসিক হলেন চার্লস ডিকেন্স [১৮১২-৭০] ও উইলিয়াম মেকপীস থ্যাকারে [১৮১১-৬৩], যাঁরা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক উপন্যাসের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। ডেভিড কপারফিল্ড, অলিভার টুইষ্ট, এ টেল অব টু সিটিজ ডিকেন্সের বিখ্যাত বই। তিনি সারা জীবন দরিদ্র নীচুতলার মানুষের কথা লিখেছেন। থ্যাকারের জন্ম কলকাতায়। তাঁর ভ্যানিটি ফেয়ার বইয়ে মানব জীবনের বিচিত্র সুখ দুঃখ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের চিত্র অনুপম বিশ্লেষণের আলোয়

উদ্ঘাটিত হয়েছে। এঁদের পর টমাস হার্ডি ও জর্জ মেরিডিথ গণনীয় ইংরেজ ঔপন্যাসিক। পাগল করা জনতা থেকে দূরে হার্ডির একখানি সুখ্যাত উপন্যাস। একালেও ইংরেজ মুল্লুকে মহান লেখকদের আবির্ভাব কম হয়নি। নাটকে বার্নার্ড শ্য, উপন্যাসে গলসওয়ার্দি, ওয়েলস, লরেন্স, হাক্সল্যে, মম। বার্নার্ড শ্য নাটকে যুগ ও জীবন সমস্যার নানাদিকে করেছেন নির্মম সমালোচনার আলোকপাত। তাঁর সব চেয়ে নামী বই হল মানব ও অতিমানব এবং শ্রীমতী ওয়ারেনের জীবিকা। ওয়েলস বৈজ্ঞানিক ও হাক্সল্যে দার্শনিক উপন্যাস লিখেছেন। মমের লেখায় হয়েছে ভারতীয় চিন্তার রেখাপাত। জেমস জয়েসের ইউলিসিজ একখানি যুগান্তকারী বই, নিন্দা প্রশংসার একশেষ হয়েছে যা নিয়ে এক সময়। লরেন্সের লেডী চ্যাটার্লির প্রেমিক এবং হাক্সল্যের সুন্দর নূতন পৃথিবী নিয়ে প্রভূত অনুকূল প্রতিকূল আলোচনার ঝড় বয়ে গেছে। অডেন, স্পেণ্ডার, ডেলুইস, ডাইলান টমাস সাম্প্রতিক কালের প্রসিদ্ধ কবি। প্রথম দুজন একদা বিপ্লব ও জনমঙ্গলের প্রবক্তা ছিলেন। এঁরা সবাই আজকের পাঠক সমাজে খুব সুবিদিত ও বহুপঠিত।

চৌদ্দ ॥ রুশ সাহিত্য ॥

এবার রুশ সাহিত্যের কথা। চিরদিনই পশ্চিম ইউরোপের অগ্রণী দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক গঠনে অনেক পার্থক্য ছিল। তার ফলে তার সাহিত্যও গড়ে উঠেছিল বেশ একটু ভিন্ন ধারায়। রাশিয়ার অর্ধেকটা আছে এশিয়ার মধ্যে, অর্ধেকটা ইউরোপের মধ্যে। তার সমাজ ও সংস্কৃতিতে তাই একই সঙ্গে এসেছে খ্রীষ্টানদের, আবার স্লাভ, মুঙ্গল ও তাতারদের প্রভাব। ভাস্কর্যে ও শিল্পকলায় যেমন, গানে নাটকে ও লোকগাথায় তেমনি এসবের মিলিত ছাপ পড়েছে। আসলে ইতালী ফ্রান্স জার্মানী ও বৃটেন যখন জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নত শিখরে, রাশিয়া তখনো ছিল কতকটা পর্যন্ত পিছিয়ে থাকা দেশ। প্রকৃতপক্ষে তার জীবনে যুগের হাওয়া লাগে উনিশ শতকে। প্রথম রুশ সাহিত্যিক যিনি ইউরোপে খ্যাতিমান হন, তিনি হলেন আলেকজেণ্ডার পুস্কিন [১৭৯৯-১৮৩৭] এবং তাঁকেই বলা হয় আধুনিক রুশ সাহিত্যের জনক। তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। হাঘরে বা জিপসীজ নামক কাব্য, বোরিস গোডুনভ নামক নাটক এবং কুইন অব স্পেডস বা ইস্কাবনের রাণী নামক গল্প তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা। তবে তিনি সবচেয়ে বিখ্যাত তাঁর গীতিকবিতার জন্যে। আপন নির্বাসিত জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য এইসব কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটেছে। তাঁর সমসাময়িক মিখায়েল লারমনতফ [১৮১৪-৪১] এই সময়ের আর একজন অগ্রণী লেখক। তাঁর আমাদের কালের নায়ক উপন্যাস এবং শয়তান কাব্য প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত বইয়ে দৈব শক্তি ও দানব শক্তির মধ্যে বিরাম বিহীন যে সংঘাত চলছে সংসারে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। শয়তান এই কাব্যে চিত্রিত হয়েছেন একজন নির্যাতিত ও ভ্রষ্টাদর্শ মানুষ রূপে। তাঁরও অনেক চমৎকার গীতিকবিতা আছে। বলা দরকার যে পুস্কিন ও লারমনতফ দুজনের ওপরই ইংরেজ কবি বাইরনের প্রভাব দেখা যায় প্রচুর। কিন্তু রুশদের কলম খুলেছে সব চেয়ে সার্থক রূপে কথাসাহিত্যে। নিকোলাই গোগোল

[১৮০৯-৫২], আইভান তুর্গেনিভ [১৮৮১-৮৩], ফিওদর দস্তয়েভস্কী [১৮২১-৮১], লিও তলস্তয় [১৮২৮-১৯১০] পরের পর ওঠেন, যাঁরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এবং ব্যালজাক জোলা টমাস মান প্রমুখের সমস্তরের স্রষ্টা।

গোগোল মৃত আত্মা বা ডেড সোলস নামের বৃহৎ উপন্যাসে জার শাসিত রাশিয়ার নির্বিত্ত সাধারণ মানুষদের বঞ্চনা ও অপমানের ছবি এঁকেছেন। তুর্গেনিভের কুমারী মাটি বা ভার্জিন সয়েল উপন্যাসে আমরা পাই কৃষক জীবনের বিচিত্র সংগ্রাম ও স্বপ্নের কাহিনী। দস্তয়েভস্কী দেখিয়েছেন সমাজের অবিচার ও জবরদস্তি কি ভাবে মানুষকে ঘৃণ্য অপরাধীতে পরিণত করে, তাঁর অপরাধ ও দণ্ড বা ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট বইয়ে। তলস্তয় সারা পৃথিবীরই এক অসামান্য পুরুষ। যুদ্ধ ও শান্তি বা ওয়ার এণ্ড পীস তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এতে নেপোলিয়ান কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ ও রুশদের ঐকান্তিক জাতীয় সংগ্রাম বর্ণিত হয়েছে অতুলনীয় মহাকাব্যের ভঙ্গীতে। দাম্পত্য অসমন্বয়ের এক নাটকীয় সংঘাতময় কাহিনী লিখেছেন তিনি আনা কারেনিনা নামক বইয়ে। রেজারেকসন বা পুনর্জন্ম তাঁর আর একখানি বিখ্যাত বই। ধর্ম সমাজ ও রাজনীতির ব্যাপারে তলস্তয় ছিলেন বৈপ্লবিক নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তা। সারা পৃথিবীই তাঁর এইসব মতের প্রভাবে কমবেশী আলোড়িত হয়েছে। পরবর্তীকালে রুশ বিপ্লবের নায়করা প্রথম প্রেরণা লাভ করেন তাঁর চিন্তা থেকেই। আমাদের বিবেকানন্দ এবং গান্ধীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল এক সময়। তলস্তয়ের পর আন্তন চেকভ [১৮৬০-১৯০৪] এবং ম্যাক্সিম গোর্কির [১৮৬৮-১৯৩৬] নাম স্মরণীয়। ছোট গল্পে মোপাসাঁ ছাড়া চেকভের জুড়ি পৃথিবীতে নেই। তাঁর কেরাণি, শিক্ষয়িত্রী, ডার্লিং বা সহজ নমনীয়া প্রভৃতি গল্প বিশ্ববিখ্যাত। চেরী বাগান বা চেরী অর্চার্ড তাঁর নামকরা নাটক। গোর্কি মানব মুক্তির অগ্রদূত মহান লেখক। তাঁর মা বা মাদার উপন্যাসে এবং নীচের গভীরে বা লোয়ার ডেপথস নাটকে বঞ্চিত শ্রমকারী মানুষের মুক্তির আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। ১৯১৭ সালের সোভিয়েত বিপ্লবকে উদ্দীপনা জুগিয়েছিল গোর্কির এইসব রচনা। তাঁর লেখা আমাদের দেশেও রবীন্দ্রপরবর্তী লেখকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রতি মানুষই একটি অনাগত শুভদিনের আশায় বেঁচে থাকে—তাঁর এই বাণী কাকে না উৎসাহিত করেছে একদিন? গোর্কির পাশাপাশি ছিলেন কবি আলেকজেণ্ডার

ব্লক [১৮৮০-১৯২১], যিনি প্রথম জীবনে ছিলেন রোমান্টিক স্বপ্ন বিলাসী এবং নারী প্রেমের জয়গান গেয়েছিলেন। তারপর তিনি রূপান্তরিত হন জনগণের কবিতে। তাঁর টুয়েলভ বা বার কবিতা একসময় রাশিয়ায় সর্বজনের মূলমন্ত্র হয়ে পড়েছিল। সিকল এণ্ড হ্যামার বা কাস্তে ও হাতুড়ী যুগের তিনিই প্রধানতম কবি।

বিপ্লব কালের ও তার ঠিক পরের আর একজন শক্তিশালী কবি হলেন ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কী [১৮৯৩-১৯৩০], যাঁর লেখায় ধ্বনিত হয়েছে নূতন রাশিয়ার আশার বাণী। কবিতায় ও নাটকে তিনি একদিকে যেমন যুগ ও জীবনের বার্তা শুনিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি নিজেকে নিয়ে পর্যন্ত ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর কালো হাড়ের বাঁশি, যুদ্ধ ও পৃথিবী প্রভৃতি নাটক এবং আমার গলা যতদূর চড়তে পারে কাব্য ন সবচেয়ে বিশেষত্বপূর্ণ রচনা। মায়াকোভস্কী দেখেছিলেন এমন এক পৃথিবীর স্বপ্ন, যেখানে শোষণ থাকবে না, দারিদ্র্য থাকবে না, বিত্ত শ্রমকে পণ্য করে বাঁচতে হবে না মানুষকে। কথাসাহিত্যে খ্যাতিমান খক আরো হয়েছেন রাশিয়ায়। তাঁদের মধ্যে আইভান বুনিন [৮৭০-১৯৫৩], বরিস পাস্তেরনাক [১৮৯০-১৯৬০] মিখায়েল সলোখভ প্রসিদ্ধ। বুনিনের সানফ্রানসিস্কোর ভদ্রলোকটি, পাস্তেরনাকের ডক্টর ঝিগো এবং সলোখভের ডন উপন্যাস মালা [এবং ডন নদী ধীরে বয়, ও বয়ে যায় সাগরে ইত্যাদি] কে না পড়েছেন? এছাড়া ডুদিনস্তেভের শু রুটি দিয়ে নয়, আর্টিবায়াসেভের কি করে ইস্পাত গড়া হল প্রভৃতি ন্যাসও বর্তমান রাশিয়ার মানুষ এবং মেজাজ দুইয়েরই পরিচয় তুলে ত চেয়েছে বিশদভাবে। ডুদিনস্তেভ ও পাস্তেরনাক তাঁদের বইয়ে ীয় স্বার্থ ও সম্মানের অনুকূল নয়, এমন অনেক কথা লেখার জন্যে রকারী মহলের ভৎর্সনা পেয়েছিলেন। তা পেয়েছেন সোলঝেনেৎসিন তাঁর ফার্স্ট সার্কেল বা প্রথম চক্র বইয়ের জন্যে এবং সেও এক কারণে। তবে লক্ষণীয় যে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ বুনিন, পাস্তেরনাক ও লঝেনেৎসিন তিনজনকেই নোবেল পুরস্কার দিয়েছে। বুনিন অবশ্য বরাবর শের বাইরে থেকেছেন। কিন্তু শেষোক্ত দুজন পেয়েছেন বোধ হয় রুশ কের কলমে রাশিয়াকে কালো রঙে আঁকা হয়েছে এই কারণেই। অবশ্য বেল পুরস্কার সলোখভও পেয়েছেন এবং মস্কো তাতে অখুসী হয়নি। তাই সলোখভ শুধু বর্তমান রুশ লেখকদের

মধ্যে অগ্রগণ্য নন, তিনি সর্বকালেরই একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁর কশাক জীবনের মহাকাব্য ডন উপন্যাসমালা যথার্থই অসাধারণ রচনা। আজকের তরুণ কবি ইয়েভশেতুস্কোর অনুরাগীর সংখ্যাও পৃথিবীতে অল্প নয়। তাঁকে বলা হয় রাগী যুবা, কেন না আধুনিক সভ্যতার ক্লেদ কলুষ ও কাপট্যকে তিনি নির্মম-ভাবে কশাঘাত করেছেন তাঁর রচনায়। কিন্তু মানব প্রেমের ঐতিহ্যে তিনিও আলেকজেণ্ডার ব্লক ও মায়াকোভস্কীরই যোগ্য উত্তরসূরী। তাঁদেরই মত দেখেছেন অনাগত সুন্দর নূতন দিনের অত্যুজ্জ্বল স্বপ্ন।

পনের ॥ ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্য ॥

ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশগুলির সাহিত্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। প্রতীচ্য কলাকৃষ্টি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের গণ্ডী কিন্তু ঐটুকুতেই সীমিত নয়। প্রধান অপ্রধান সমস্ত দেশেই মধ্যযুগ থেকে সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা নাটক ও বিজ্ঞানের অনুশীলন হয়েছে এবং পৃথিবীতে সসম্মান স্বীকৃতি লাভও করেছেন গণনীয় কবি ভাবুক ও চিন্তাশীল বহু মানুষ। এবারে অপ্রধান দেশের যে সব সাহিত্য স্রষ্টা স্বদেশের সীমাতিক্রম করে সারা ইউরোপে এবং তার ফলে সারা জগতে গৃহীত হয়েছেন, তাঁদের কথা বলছি। সুইজারল্যাণ্ডের প্রখ্যাত কবি কার্ল স্পিটেলার [১৮৪৫-১৯২৪] লেখেন ডা আলিম্পশার ফ্রালিং বা অলিম্পীয় বসন্ত নামক দার্শনিক কাব্য। এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথের স্বর্গ হইতে বিদায় কবিতার অনুরূপ অতুলনীয় ভাবটি লক্ষণীয়। অষ্ট্রিয়ার নাট্যকার আর্থার সিনৎজলার [১৮৬২-১৯৩১] এবং ঔপন্যাসিক ফ্রাঞ্জ কাফকার [১৮৮৩-১৯২৪] কথা ত আগেই বলেছি জার্মান সাহিত্য প্রসঙ্গে। হাঙ্গারীর প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক মর জোকাই [১৮২৫-১৯০৪] রচিত বাদশার ক্রীতদাস, কালো হীরা প্রভৃতি বই একদা বিশেষ সমাদৃত ছিল। ডুমা ও স্কটের মত জমজমাট ঘটনা প্রধান কাহিনীকার তিনি। নাট্যকার ফেরেঙ্ক মোলনার [১৮৭৮-১৯৫২] রচিত অলিম্পিয়া, রাজহাঁস এবং দেবদূত সৃষ্টির গান প্রভৃতিও এক সময় সবাই সাগ্রহে পড়েছেন। চেকোস্লোভাকিয়ার কথাসাহিত্যিক কারেল চাপেক [১৮৬০-১৯২৭] তাঁর শার্ট গল্প ও টাবিদা উপন্যাসের জন্য সুপরিচিত। অস্তিত্ববাদী কামু ও সার্ত্রের প্রমুখের সঙ্গে তাঁর রচনার সমধর্মিতা লক্ষ্য করার মত। তাঁর মতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই, জীবনের প্রবৃত্তি ও প্রবণতা যাকে যে দিকে ঠেলে দেয়, সে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌছায় সেখানে। পোলাণ্ডও ইউরোপীয় সাহিত্যের মানচিত্রে একটি গণনীয় স্থান অধিকার করেছে। মাতৃভাষা পোলের পরিবর্তে ইংরেজীতে লিখে প্রসিদ্ধ জোসেফ কনরাডের টাইফুন বই আজকের প্রবীণেরা সবাই পড়েছেন। কিন্তু মাতৃ-ভাষাতেই উঠেছেন হেনরিক সিয়েনকোয়েভিচ [১৮৪৬-১৯১৬] এবং ওয়াদিস

ওয়া রেমঁত [১৮৬৭-১৯২৫], যাঁরা মহান সাহিত্যিক রূপে স্বীকৃত হয়েছেন। প্রথমে কুয়োভাদিস বা কোথায় যাও বইয়ে সম্রাট নীরোর আমলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ের পেজেণ্ট বা চাষী বইটিও একটি অনুপম রচনা। দরিদ্র ও বঞ্চিত কৃষকের দুঃখকে ফোটান হয়েছে এতে অসীম দরদ ও নিখুঁত পর্যবেক্ষণের আলোয়। যুগোস্লাভ [সার্বিয়ান] সাহিত্যিক বারসভ স্তানভিক [১৮৭৬-১৯২৭] এবং ইভো আন্দ্রিক [১৮৯২-?]-ও সন্ধানী পাঠকের অচেনা নন। শেষোক্ত জন নোবেল প্রাইজ পেলেও স্তানভিক নিঃসন্দেহে অধিকতর শক্তিশালী লেখক। নেকিস্তা নামক বইয়ে তিনি দেখিয়েছেন ফাঁকা আভিজাত্য ও বংশ গৌরবের নামে কি ভাবে এক বিগত যৌবনা নারী কোন নাবালককে বিবাহ করে চরম দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছিলেন।

পূর্ব ইউরোপের চেয়ে কিন্তু উত্তরের অর্থাৎ স্কান্দিনেভিয়ার সাহিত্য প্রতীচ্যে বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিশ্ববাসীর মনকেও বেশী ছুঁয়েছে। উত্তর ইউরোপের প্রাচীন সাগা এবং দুখানি এড্ডার কথা ত বলাই হয়েছে। একালেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কম জন্মান নি ঐ মুল্লুকে। নরওয়েতে জন্মান বাস্তবপন্থী নাটকের জনক হেনরিক ইবসেন [১৮২৮-১৯০৬], যাঁর রচনা প্রভাবিত করেছিল বার্নার্ড শ্বকে। তাঁর পুতুলের ঘর, প্রেতাত্মারা, সমাজের স্তম্ভ, বুনো হাঁস যুগান্তকারী নাটক। জীবনকে খোলা চোখে দেখা ও সোজা ভাষায় ব্যক্ত করার প্রেরণা তিনিই দেন এ যুগের নাট্যকারদের। বিয়ার্ণষ্টেন বিয়ার্ণসন [১৮৩২-১৯১০] তাঁরই সমসাময়িক নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁর সম্পাদক নাটক এবং ঈশ্বরের নিজের নিয়মে উপন্যাস বহু বিশিষ্ট সমালোচকের প্রশংসাধন্য হলেও, জীবন ও জগৎবোধে তা ইবসেনীয় উচ্চতায় পৌঁছায় না। প্রথম বইটি সুখপাঠ্য এই কারণে যে তীক্ষ্ণ একটি ব্যঙ্গের আড়ালে ওতে মর্মান্তিক একটি ট্র্যাজেডী বিতরণ করা হয়েছে। নরওয়েতে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার হয়েছেন হয়েছেন দুজন, ন্যুট হামসুন [১৮৫৯-১৯৫২] ও জোহান বোয়ের [১৮৭২-১৯৫৯]। দ্বিতীয়ের মহাক্ষুধা বইয়ে জীবনের সীমান্ত থেকে জীবনাতীতে উন্নীত হবার তৃষ্ণা মানব জীবনে কি প্রবল এবং প্রথমের বুভুক্ষা বইয়ে পেটের ক্ষুধা মানুষকে শেষ পর্যন্ত কোথায় টেনে নিয়ে নামায়, তা দেখান হয়েছে অসীম কৃতিত্বের সঙ্গে। দুখানি বই এক হিসাবে যেন মানব প্রকৃতির দুটি পরস্পর বিরোধী দিকের দর্পণ। মানুষ কতটুকু অংশে জৈব, কোথায় সে

জান্তব সত্তার উর্ধ্বে, তা ফোটান হয়েছে দুই বইয়ে। সিগ্রিদ উন্দসেৎ [১৮৮২-১৯৪৯] নামে একজন মহিলা ঔপন্যাসিকও ছিলেন, যাঁর জেনী উপন্যাস ঠিক ভীড়ে হারানর মত বই নয়। গোর্কির মা বইয়ের মত রেমঁতের চাষী এবং হামসুনের বুভুক্ষা বইও তিনের দশকে বাংলা উপন্যাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, যেমন করেছিল ইবসেনের সামাজিক নাটকগুলি। দুঃখের বিষয় নীচু সোপানের জীবন নিয়ে আমাদের উপন্যাস যতটা সার্থক আকারে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে, নাটক তা করে নি। পেশাদার রঙ্গমঞ্চ এপথে নাট্যকারদের সহায়ক হয়নি, সেজন্যেও বটে, আবার প্রকৃতপক্ষে নাটক লেখার দিকে সাহিত্যিকদের মনোযোগ প্রবাহিত হয় নি, সেজন্যেও বটে। তবে নরওয়েজীয় প্রভাব বাঙালী সাহিত্যিকরা চিন্তার পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সুইডেনে হয়েছেন অগষ্ট ষ্ট্রিণ্ডবার্গ ও সেলমা লাগেরলফ দুজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক লেখিকা। ষ্ট্রিণ্ডবার্গ [১৮৪৯-১৯১২] প্রধানত নাট্যকার। কুমারী জুলী ও পিতা তাঁর দুখানি প্রসিদ্ধ নাটক, যদিও তাঁর লেখা কিছু নভেল এবং বিখ্যাত একাঙ্ক নাটকও আছে। তাঁর লেখায় ঘোষিত হয়েছে সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ। লাগেরলফ [১৮৫৮-১৯৪০] লিখেছেন জেস্তাবার্লিং সাগা নামে সুবৃহৎ উপন্যাস, যাতে মেরু অঞ্চলের মানুষ ও তাদের সমস্যাবহুল জীবন নিয়ে দীর্ঘ একটি জমাট কাহিনী বলা হয়েছে। এঁর ষ্টোরি অব দ্যা নাইল থেকেই হয়ত অবনীন্দ্রনাথ বুড়ো আংলা লেখেন। সুইডেনে এলেন কী নামে আর এক বিদুষী লেখিকা ছিলেন। তিনি লিখেছেন নারীদের সমস্যা নিয়ে সুচিন্তিত অনেক প্রবন্ধ।

ডেনমার্কের জাদুকর লেখক হ্যান্স এণ্ডারসন [১৮০৫-৭৫] লিখেছিলেন তাঁর অপরূপ রূপকথাগুলি : কুশ্রী হাঁসের ছানা, ঘুমপরী ইত্যাদি, যা জাতিধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত ছেলেমেয়ে পড়েছে, এখনো পড়ে। ডেনমার্কের বিখ্যাত সমালোচক জর্জ ব্রাণ্ডস [১৮৪২-১৯২৭] লিখিত উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যধারা এখনও পড়তে হয় উচ্চ শিক্ষার্থীদের ইউরোপীয় সাহিত্যের মর্জি ও গতিপ্রকৃতি বুঝতে হলে। আইসল্যাণ্ড এবং ফিনল্যাণ্ডের দু-একজন লেখকের রচনাও ইদানীং পড়ার সুযোগ পেয়েছি আমরা। আইসল্যাণ্ডের ঔপন্যাসিক হালডর ল্যাকসনেসের ধীবরেরা উপন্যাসে মেরু সমুদ্রে জীবিকার্জন করেন যে দুঃসাহসিক জেলিয়ারা, তাঁদের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্ত এই লেখক সত্যই শক্তিশালী। ফিনল্যাণ্ডের ফ্রাঞ্চ এমিল

সিলানপা [১৮৮৮-১৯৬৪] নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তাঁর তরুণ বয়সের ঘুম নামক বইয়ের জন্যে। আবেগ মধুর এই বই পড়তে পড়তে শরৎচন্দ্রকে বারবার মনে পড়ে, রচনার আন্তরিকতার জন্যে। ফিন জাতির পুরাতন লোককাব্য কালেভালাও আজকাল ইংরেজীতে পাওয়া যাচ্ছে। আগ্রহীরা পড়ে দেখতে পারেন। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের কথাও একটু বলি। ডাচ নীতিবিদ ইরাসমাস [১৪৬৬-১৫৩৬] এবং দার্শনিক স্পীনোজা [১৬৩২-৭৭] মধ্যযুগীয় ইউরোপে যে প্রজ্ঞার আলো জ্বেলেছিলেন, তা গোটা পৃথিবীকে উজ্জ্বল করেছে। কিন্তু তাঁদের লেখা সবই লাতিনে। খাঁটি ওলন্দাজ ভাষায় কবি জুস্ত ভণ্ডেল [১৫৮৭-১৬৭৯] লেখেন তাঁর নাট্যকাব্য লুসিফার, যার নায়ক শয়তান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এই লুসিফার বা শয়তানের ছাঁচেই মিল্টন প্যারাডাইজ লষ্ট মহাকাব্য লিখেছেন, অনেকে বলেন একথা। এখান থেকেই আধুনিক ওলন্দাজ [হল্যাণ্ড-ডাচ] সাহিত্যের যাত্রা শুরু। বেলজিয়ামের কবি এমিল ভেয়ারহার্ন [১৮৫৫-১৯১৬] এবং দার্শনিক ও নাট্যকার মরিস মেতার্লিঙ্ক [১৮৬২-১৯৪৮] সারা জগতেই খ্যাতিমান তাঁদের রচনার জন্যে। ভেয়ারহার্ন কলকারখানা কবলিত যন্ত্রযুগের জীবন যন্ত্রণাকে তাঁর কাব্যে ভাষা দিয়েছেন। মেতালিঙ্ক বেশী প্রসিদ্ধ তাঁর সাংকেতিক নাটকের জন্যে। তাঁর নীল পাখী ও দৃষ্টিহীন নাটক দুটি কে না পড়েছেন? মানুষের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যে চিরদিনই তার নাগালের বাইরে থাকে. তবু দুর্বল মানুষ কোনদিন তা খোঁজার কসুর করে না, এই হল নীল পাখীর অন্তর্নিহিত তত্ব। দ্বিতীয় নাটকে তিনি তথাকথিত নেতৃত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে বলেছেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিজে যাঁরা অন্ধ, তাঁরাই অন্ধ জনতাকে চালিয়ে নিয়ে যান, যার অনিবার্য পরিণাম হল সকলের সদলবলে দুর্ভাগ্যের কূপে পতন। মোনাভানা নামে আর একখানি রোমাণ্টিক নাটকও আছে তাঁর। আর আছে মৌমাছিদের জীবন সম্পর্কীয় একখানি বৈজ্ঞানিক বই। অনেকে মনে করেন মেতার্লিঙ্কের সাংকেতিক নাট্যগুলিই রবীন্দ্রনাথকে অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী প্রভৃতি লিখতে উৎসাহিত করেছিল। মেতার্লিঙ্ক মাতৃভাষার মত ফরাসীতেও লিখেছেন কিছু কিছু।

ষোল ॥ ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্য দিক ॥

ইউরোপীয় সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এ পর্যন্ত কাব্য কবিতা নাটক গল্প উপন্যাস ও সাহিত্য লক্ষণাক্রান্ত গদ্য রচনার কথাই বলেছি। সাধারণভাবে এই শ্রেণীর রচনাগুলিই অবশ্য পড়ে সাহিত্যের কোঠায়। কিন্তু বৃহত্তর অর্থে ভাষায় যা কিছু লেখা হয়, [অবশ্য গণিত পদার্থবিদ্যা রসায়ন জ্যোতির্বিজ্ঞান জীবতত্ত্ব চিকিৎসাবিদ্যা ভূবিদ্যা অর্থনীতি ইত্যাদি ফলিত বিদ্যা-গুলি বাদে] সবই সাহিত্য পরিবারভুক্ত। সেই কারণেই এই সমীক্ষায় দর্শন ইতিহাস জীবনী ভ্রমণকাহিনী ও বিবিধ তত্ত্ববিচার মূলক রচনাদির এবং সে সবের রচয়িতাদের প্রসঙ্গও সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। বলা নিষ্প্রয়োজন যে সৃষ্টিধর্মী রচনায় একটি জাতির জীবনবোধ ও মননশীলতা বিম্বিত হয়। কিন্তু তার প্রজ্ঞা ও মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় জ্ঞানবিজ্ঞানের বইপুঁথিতে। এ দুইয়ের মিলিত উৎকর্ষেই প্রতিষ্ঠিত হয় একটি জাতির সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠতা। মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইউরোপের ছোটবড় বহু দেশ এবং জাতিই এই শ্রেষ্ঠতার স্বাধিকার দাবী করতে পারেন। আগেই দেখিয়েছি যে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যাত্রা শুরু হয় গ্রীস থেকে। তারপর গ্রীকদের দিন শেষ হলে ওঠেন রোমানরা। এই দুই জাতিই ইউরোপকে দিয়ে যান বিরাট সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। পরের অধ্যায়ে ইউরোপে ব্যাপ্ত হয় খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতির প্রভাব এবং এ তিনের সংমিশ্রণেই তৈরি হয় প্রতীচ্য জীবন মনন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের কাঠামো। নিয়তির অলঙ্ঘ্যতায় বিশ্বাসী হলেও, গ্রীকরা ছিলেন জীবন ও জগৎ সচেতন এবং সর্বতোভাবেই সুন্দরের উপাসক। তাঁদের কাব্য নাটক দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস, যাবতীয় সাহিত্যকর্মের মধ্যেই ফুটেছে তাঁদের এই পরিচয়। গ্রীক সাহিত্যের যেটুকু আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে, তাতেই আমরা এরিস্টটল প্লেটো হেরাক্লিটাস প্রমুখ দার্শনিক এবং হেরোডোটাস জেনোফোন থুকিডাইডিস প্রমুখ ইতিহাসবিদের কথা বলেছি। জ্যোতির্বিজ্ঞানী পিথাগোরাস চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রিটাস এবং নাস্তিক্য দর্শনের প্রবক্তা এপিকিউরাসের নামও স্মরণীয় এই সঙ্গে। রোমানরা বিদ্যাবৈদগ্ধ্য ও জ্ঞান

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিলেন মূলত গ্রীকদেরই মন্ত্রশিষ্য। তাঁদের কাব্য নাটক ও দর্শনে এ পরিচয় যথেষ্টই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাঁরা ছিলেন গ্রীকদের চেয়ে প্রাগ্রসর জাতি, তাঁদের ইতিহাস ও তত্ত্ব বিচার-মূলক রচনাবলীই তাঁর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে ট্যাসিটাস লিভি প্লিনি ও সিসেরোর মত গদ্যলেখক পৃথিবীর কোন প্রাচীন জাতির ভিতর থেকেই ওঠেন নি। কিন্তু ওঁদের প্রধান প্রধান রচনার কথা ইতিপূর্বেই বলেছি, তাই তার আর পুনরুক্তি করব না। আমরা এক লাফে রেনেশাঁস বা নব জাগৃতির সময় থেকে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধ্যান ধারণার প্রসঙ্গে চলে আসব, কারণ নূতন ইউরোপের জন্ম এবং জীবন আরম্ভ সেখান থেকে।

বলে রাখা দরকার যে গ্রীক ও রোমানরা ছিলেন নিসর্গ দেবতার উপাসক পেগান এবং নিয়তি পাপপুণ্য ও স্বর্গনরকে প্রত্যয় সম্পন্ন জাতি। তাঁদের ধর্ম ও দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁদের সেই মানসিকতাই। খ্রীষ্টধর্ম তাঁদের সামনে তুলে ধরল সন্ন্যাস বিবেক বৈরাগ্য ও প্রেমের আদর্শ। শোনাল মৈত্রীর বাণী, দেখাল জীবনমুক্তির পথ। কিন্তু সেই নূতন জীবনদর্শনকে স্বাগত করে নিতে পারেন নি ইউরোপের মানুষ প্রায় হাজার বছর। খ্রীঃ পূঃ ৪ অব্দ থেকে শ-চারেক বছর একটানা চলে গ্রীকদের এবং পরবর্তী শ-চারেক বছর রোমানদের অভ্যুদয় কাল। তারপর ওঠে শার্লেমাঁর পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য। তারও মেয়াদ শেষ হয় শ-খানেক বছরের মধ্যেই এবং ইউরোপে নেমে আসে অন্ধকার যুগ, যখন উত্তর থেকে আগত বর্বর জাতিরা সভ্যতা সংস্কৃতি ও কলা-কৃষ্টির সমস্ত শুভ নিদর্শন মুছে ফেলেন। শিক্ষাদীক্ষাহীন সামন্ত প্রভু ও পেশাদার সিপাহী অধ্যুষিত সমাজে একদিকে খ্রীষ্টান গির্জার দাপট যেমন দুঃসহ হয়ে ওঠে, অন্যদিকে চাষী কারিগর ও দেহশ্রমী সাধারণ মানুষের দুর্দশা তেমনি চরমে পৌছায়। এই পটভূমিতে ধীরে ধীরে চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে জ্বলে উঠল রেনেশাঁসের আলো। খ্রীষ্টীয় মানবতার পটভূমিতে গ্রীকো-রোমক জীবন-বোধকে নূতন করে আবিষ্কার করলেন ইউরোপের মানুষ। গ্যালেলিও কোপার্নিকাসের মত বিজ্ঞানীর, মাইকেল এঞ্জেলো লিওনার্দোর মত শিল্পীর, দান্তে শেকসপীয়ারের মত কবির আবির্ভাব সম্ভব হল তারই ফলে। নূতন বিশ্ব-বোধ দিকে দিকে ছোটাল মানুষকে দিগ্বিজয়ের নেশায়। জগৎ এবং জীবনকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের এই উদ্দীপনাতেই তৈরি হল নূতনকালের দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস। ইংল্যাণ্ডে টমাস মুর লিখলেন ইউটোপিয়া, যাতে আদর্শ রাষ্ট্রের

একটা কল্পিত ছাঁচ তুলে ধরা হল। হল্যাণ্ডে ইরাসমাস লিখলেন মূর্খতার মহিমা নামক ব্যঙ্গাত্মক দার্শনিক নিবন্ধ, যাতে যুক্তিবাদকে দেওয়া হল অগ্রাধিকার। জার্মানীতে মার্টিন লুথার মাতৃভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে জাতীয় সাহিত্যের বনিয়াদ স্থাপন করলেন। তাছাড়া স্বয়ং রচনা করলেন বহু ভক্তিসঙ্গীত, যা এখনো চলে। ইংল্যাণ্ডে দার্শনিক বেকনের এবং ফ্রান্সে দেকার্তের [১৫৯৬-১৬৫০] আবির্ভাব হল, যাঁরা যুক্তিবাদী আধুনিক দর্শনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন বলা যায়। বেকনের প্রবন্ধের কথা আগেই বলেছি। তাঁর প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ নোভাম অর্গানাম বিশুদ্ধ লাতিনে লেখা। এতে তিনি জ্ঞান ও অজ্ঞানের সীমা নির্দেশ করেছেন। দেকার্তের ডিসকোর্সেস বইয়ে প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক কি, তাই দেখান হয়েছে। প্যাসকাল এবং মন্তেস্কু শ্রেণীর আরো বহু দার্শনিক ভাবাপন্ন মানুষ ওঠেন ফ্রান্সে। তারপর ফ্রান্সে দেখা দেন রুশো দিদেরো প্রমুখ দার্শনিকরা, যাঁদের বলা হয় বিশ্বকোষবাদী এবং যাঁদের লেখার প্রভাব মূর্তি পরিগ্রহ করে ফরাসী বিপ্লবে। ইংল্যাণ্ডে বিজ্ঞানী নিউটন লাতিনে লেখেন প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিসিয়া, যাতে মাধ্যাকর্ষের গাণিতিক ভিত্তি ব্যাখ্যাত হয়েছে। লকের হিউম্যান আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং বা মানুষের বোধ নামক বিখ্যাত বই লিখিত হয় অষ্টাদশ শতকে। ঐ সময়েই ইতিহাসবিদ গিবন লেখেন রোমক সাম্রাজ্যের ক্ষয় ও পতন এবং জনসন লেখেন তাঁর বিখ্যাত অভিধানগ্রন্থ। এঁরা সবাই ইংরেজ।

রেনেশাঁসের উন্মেষ হয় ইতালীতে এবং সেখান থেকে তার ব্যাপ্তি হয় ফ্রান্সে স্পেনে ও ইংল্যাণ্ডে। তার ফলে প্রথম সাহিত্য শিল্প কলা কৃষ্টি ও বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি হয় এই কটি দেশেই। যাঁরা তাতে অগ্রনায়কতা করেন তাঁদের কথা ত বলাই হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য পর্ব থেকে সাহিত্যের মত দর্শন বিজ্ঞান এবং ইতিহাসে সৃষ্টির জোয়ার আসে জার্মানীতেও। দর্শনের ক্ষেত্রে পরের পর কাণ্ট [১৭২৪-১৮০৩], হেগেল [১৭৭০-১৮৩১], ফিকটে, শোপেনহাউয়ার, নিৎসে প্রমুখ প্রতিভাধর পুরুষের আবির্ভাব হয়। এঁদের মধ্যে কাণ্টের লেখা ক্রিটিক অব পিওর রিজন বইয়ে ভারতীয় অদ্বৈততত্ত্বের প্রায় সমধর্মী একটি তত্ত্বে সৃষ্টি ও স্রষ্টার অভিন্নতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। হেগেলে নিহিত আছে বস্তুবাদের বীজ, যা পরবর্তীকালে মার্কসবাদে অভিব্যক্ত হয়েছে। মার্কস ফ্রয়েড ও আইনষ্টাইন এই তিন মনস্বীর প্রভাব বিশ শতকের সমাজ মানসকে কি পরিমাণ প্রভাবিত করেছে, তা নিশ্চয় আজকের পাঠককে

বোঝাতে হবে না। জার্মানী ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছে। হাউসোফার স্পেংলার ডিলথাই প্রমুখ ভূ-রাজনীতিক ইতিহাসবিদ ইতিহাসের নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন মানুষের সামনে। স্পেংলার বস্তুগর্বী প্রতীচ্য সভ্যতার মধ্যে পচনের চিহ্ন আবিষ্কার করেন। মমসেনের রোমের ইতিহাস এবং এমিল লুডভিগের গ্যয়টে বইও তাঁদের অক্ষয় কীর্তি স্বরূপ। অষ্টাদশ থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জ্ঞানবিজ্ঞানে জার্মানীর এই অপ্রতিহত গতি সত্যই বিস্ময়কর। অবশ্য উনিশ শতকের ইংল্যাণ্ডে জন্মান ডারউইন হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্টুয়ার্ট মিল এবং এই তিন জনের চিন্তাধারাও সমগ্র পৃথিবীকেই সজোরে নাড়া দেয়। ডারউইন ব্যাখ্যা করেন জীবের বিবর্তন তত্ত্ব, যাকে স্পেন্সার সমাজ ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণে প্রক্ষেপ করেন। আর মিল প্রচার করেন নারীর স্বাধিকার, যা পরবর্তীকালের সমাজবোধকে বিশেষভাবে রূপান্তরিত করেছে। তাঁর সামূহিক হিতবাদের দর্শনও সমান মূল্যবান। ফ্রান্সে বের্গসঁ এবং ইতালীতে ক্রোচেও উনবিংশ শতকের ভাব বলয়কে এযুগে নানা দিকে অনেক দূর প্রসারিত করেছেন। বের্গসঁ প্রচার করেছেন ইলান ভাইটাল বা পরম প্রাণবাদ এবং ক্রোচে ব্যাখ্যা করেছেন ইন্টুইশন বা স্বয়ংসম্ভূত জ্ঞানের তত্ত্ব। ডেনমার্কের দার্শনিক কিয়ের্কগার্ড উন্মুক্ত করেন অস্তিত্ববাদের তত্ত্ব, যা বিশ শতকের বিশিষ্ট ফরাসী সাহিত্যিক কামু সার্ত্র মালরো প্রভৃতিকে প্রভাবিত করেছে। বিশ শতকে ভাববাদী ও বস্তুবাদী, এই পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুই ধারায় প্রতীচ্য দর্শন বিভক্ত হয়েছে। ইতিহাসও তাথ্যিক এবং তাত্ত্বিক দুই শাখায় ভাগ হয়ে গেছে। ইতিহাসের শেষোক্ত শাখাটি এখন দর্শনের শ্রেণীভুক্ত; যেমন সাহিত্য ও শিল্পের স্বরূপ বা সমাজের প্রাণ-প্রকৃতি ব্যাখ্যাও দর্শন নামেই অভিহিত হয়। ফ্রেজার মর্গান ম্যালিনোস্কী ক্রোচে বোসাংকে চমস্কি লুকাচ প্রমুখ আধুনিক ইউরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতরা এই যুক্তিতেই দার্শনিক পদবাচ্য।

সতের ॥ আমেরিকান সাহিত্য ॥

মার্কিন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস এশিয়া ও ইউরোপের ইতিহাসের মত প্রাচীন নয়। মধ্যযুগের আগে এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার মানুষরা আমেরিকার পরিচয়ই জানতেন না। আমেরিগো ভেসপুচি ও খ্রীষ্টোফার কলাম্বাস এই নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করলে এবং ধীরে ধীরে গমনাগমনের পথ উন্মুক্ত হলে, প্রতীচ্য দুনিয়ার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী জীবনধারণের তাগিদেই দলে দলে সেখানে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেন। বাগিচা ও কাজ কারবার ফেঁদে তাঁরাই আস্তে আস্তে নূতন দেশের বনিয়াদ গড়েন। আদি বাসিন্দা রেড ইণ্ডিয়ানরা এই নবাগতদের চাপে হয় লোপ পেয়ে যান, নয় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে যান। এই নূতন আমেরিকার সংগঠনে নিগ্রো ক্রীতদাসদের শ্রমই নেয় সবচেয়ে বড় ভূমিকা। কিন্তু তাঁরা মার্কিন সমাজে ন্যায্য মানবিক অধিকার কোনদিন পাননি, তাই গোড়া থেকেই শ্বেত ও কৃষ্ণ আমেরিকানদের মধ্যে লেগে থেকেছে একটা বিরোধ। বলা দরকার যে শ্বেত মার্কিনদের মত নিগ্রোদের মধ্যেও কবি শিল্পী সঙ্গীতজ্ঞ এবং সংস্কারক জন্মেছেন অনেক। একটা কথা এই সূত্রে বলে রাখা দরকার যে আমেরিকা বলতে সাধারণভাবে যদিও সবাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই বোঝেন, কিন্তু তা নিতান্ত ভুল ধারণা। আমেরিকা বিরাট মহাদেশ। তার উত্তরে আছে আলাস্কা, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণে মেক্সিকো ব্রাজিল বলিভিয়া আর্জেণ্টাইনা প্রভৃতি ছোট বড় বহু দেশ। এর মধ্যে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র ছিল ইংরেজের অধিকারভুক্ত, পক্ষান্তরে দক্ষিণের দেশগুলি সবই স্পেন ও পর্তুগালের উপনিবেশ। আজ অবশ্য সব দেশই স্বাধীন। কানাডায় ইংরেজ ও ফরাসীরা অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পর এখন উভয়েই সম-অংশীদাররূপে স্বাধীন কানাডার অধিবাসী হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রবল সংগ্রামের পর ইংরেজ শাসন মুক্ত হয়েছে এবং প্রবলতর গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা করে তবেই সংহত হয়েছে। তার রাজনীতিক বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক গৌরব আজ সারা জগতে স্বীকৃত। শিল্প সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাস তার দুই শতাব্দীর বেশী

পুরান নয়। কিন্তু সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে তার দান অল্প নয়। মহান বলে গণ্য হতে পারেন এমন কবি নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিক আমেরিকায় উঠেছেন প্রচুর। আর আমেরিকান সাহিত্য বলতে মূলত বোঝায় তাঁদেরই লেখা ইংরেজী সাহিত্য। লক্ষণীয় যে ইউরোপের নানা দিক দেশ থেকে এলেও, মার্কিনরা ইংরেজীকেই তাঁদের ভাষা হিসাবে নিয়েছেন, যদিও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রও ধরেছেন তাঁরা একদিন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্যে। মার্কিন জগতের প্রথম গণনীয় গদ্য লেখক হলেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন [১৭০৬-১৭৯০], যাঁর আত্মজীবনী এখনো নিয়মনিষ্ঠা শেখার জন্যে শিক্ষার্থীদের পড়া উচিত। ফ্র্যাঙ্কলিন একই সঙ্গে ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক, বিজ্ঞানী ও সদাচার সম্পন্ন মানুষ। নব্য আমেরিকার সংগঠক হিসাবে তাঁর নাম আজও সসম্মানে উল্লিখিত হয় সেই জন্যেই।

প্রকৃত সাহিত্য স্রষ্টা হিসাবে ইউরোপে খ্যাতিলাভ করেন প্রথম যে মার্কিনরা, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন ওয়াশিংটন আর্ভিং [১৭৮৩-১৮৫৯], হেনরি ওয়াডসওয়ার্থ লংফেলো [১৮০৭-৮২], এডগার অ্যালান পো [১৮০৯-৪৯], নেথানিয়েল হথর্ণ [১৮০৪-১৮৬৪], র‍্যালফ ওয়ালডো এমার্সন [১৮০৩-১৮৮২], ডেভিড থরো [১৮১৭-৬২], ওয়াল্ট হুইটম্যান [১৮১৯-৯২], রিচার্ড গ্রীনলিফ হুইটিয়ার [১৮০৭-৯২] প্রভৃতি। আর্ভিং-এর প্রসিদ্ধ গল্প রিপ ভ্যান উইংকল কে না পড়েছেন? মার্কিন দুনিয়ার কুম্ভকর্ণ রিপের কাহিনী সত্যিই চমৎকার। লংফেলোর সাম অব লাইফ বা জীবন সঙ্গীত ইংরেজী ভাষাভাষী পৃথিবীর সর্বত্র বিখ্যাত। বাংলাতেও হেমচন্দ্র করেছিলেন তার মনোরম অনুবাদ। রেড ইণ্ডিয়ানদের এবং মেরু অঞ্চলের সাগাগুলির কাহিনী নিয়েও বড় বড় কাব্য আছে তাঁর। তবে ছোট কবিতার জন্যেই বেশী সমাদৃত তিনি। অ্যালান পো একাধারে কবি ও কথাসাহিত্যিক। তাঁর গায়ে কাঁটা দেওয়া গল্প ব্ল্যাক ক্যাট বা কালো বিড়াল পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। র‍্যাভেন বা দাঁড় কাক নামে একখানি কবিতা সংগ্রহও আছে তাঁর। হথর্ণ স্কারলেট লেটার বা রক্তিমলিপি নামে যে উপন্যাস লেখেন, তাতে বৈরাগ্য ও জৈবতৃষ্ণার সংঘাত মানুষকে শেষ পর্যন্ত কোন দিকে নিয়ে যায়, তার মনস্তত্ত্বসম্মত একটি বিচিত্র কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। থরো লিখেছেন তাঁর ওয়ালডেন নামক পল্লীচিত্রের বই, যাতে অনাড়ম্বর গ্রাম্য জীবনকে অদ্ভুত সারল্যের সঙ্গে আঁকা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র ও গল্পগুচ্ছের কোন কোন অংশে এই রকম

রূপে রঙে অতুলনীয় পল্লী-প্রকৃতির বর্ণনা আছে। এমার্সন ও হুইটম্যান দার্শনিক ও কবি হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। এমার্সনের রিপ্রেজেণ্টেটিভ মেন বা অগ্রগণ্য মানুষ নামক বইয়ে বহু বিশিষ্ট মানুষের জীবন ও কর্ম নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিছু মনোরম কবিতাও আছে তাঁর এবং কোন কোন কবিতায়, যেমন ব্রহ্ম কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে হিন্দুদর্শনের প্রভাব। হুইটম্যানও বিপ্লবী দার্শনিক এবং অসীম শক্তিসম্পন্ন মানবপ্রেমিক কবি। ছন্দ পরিহার করে শব্দ ঝঙ্কারময় সুরেলা গদ্যকে তিনি গ্রহণ করেন কবিতার বাহন হিসাবে। সম্ভবত ইংরেজী বাইবেলের ছাঁচটা প্রভাবিত করেছিল তাঁকে। তাঁর লীভস অব গ্রাস বা ঘাসের পাতা একখানি আশ্চর্য বেগবান প্রাণস্পর্শী কবিতার সংগ্রহ। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন বন্ধনহীন মুক্তি-দর্শনের প্রবক্তা। দেখতেও তিনি ছিলেন অনেকটা রবীন্দ্রনাথেরই মত ঋষিকল্প চেহারার অধিকারী। তাঁর ক্যাপটেন বা নায়ক কবিতা প্রায় সমস্ত সংকলনেই নেওয়া হয়, তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় রচনারূপে। তাঁর পতিতা কবিতাটি বহু সংস্কারক ও লোকহিতব্রতী মানুষকে চিন্তা এবং কর্মের প্রেরণা দিয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত ছন্দানুবাদে যদিও এর মূল সুরটি ঠিক ধরা পড়েনি।

২.

হুইটিয়ার এবং জেমস রাসেল লোয়েল [১৮১৯-৯১] এই সময়েরই আরো দুজন কবি। প্রথম জন সরল পল্লীজীবনের গান গেয়েছেন, দ্বিতীয় জন প্রচার করেছেন মার্কিন জাতীয় গৌরব ও গরিমার বার্তা। এমিলি ডিকিনসন [১৮৩০-১৮৮৬], শ্রীমতী স্টো্যা [১৮১১-৯৬] এবং মার্ক টোয়েন [১৮৩৫-১৯১০] আর তিনজন মার্কিন সাহিত্যিক, যাঁদের নামও দেশ ছাড়িয়ে সারা জগতে ছড়িয়েছে। শ্রীমতী ডিকিনসন কবি এবং তাঁর কবিতায় মানুষ ও পশু-পাখীর প্রতি যেমন গভীর দরদ ফুটেছে, তেমনি সত্য প্রেম ও বিশ্বকল্যাণের আদর্শটিও মূর্ত হয়েছে সুন্দরভাবে। হ্যারিয়েট বীচার স্টো্যা ঔপন্যাসিক; তাঁর আঙ্কল টমস কেবিন বা টমকাকার কুটির সেই জগদ্বিখ্যাত বই, যাতে নিগ্রো দাসত্বের অসীম দুঃখ অশ্রুসজল ভাষায় লেখা হয়েছে। এই বই মার্কিন জাতীয় ইতিহাসে কি মহান ভূমিকা নেয়, তা কে না জানেন? স্বয়ং প্রাতঃস্মরণীয় লিনকন প্রভাবিত হন এর দ্বারা। মাইকেল মধুসূদন এবং

বঙ্কিমচন্দ্র এই বইয়ের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উনিশ শতকেই বাংলায় এর অনুবাদ করেন চণ্ডীচরণ সেন। মার্ক টোয়েন অদ্বিতীয় গল্পলেখক এবং তাঁর কৌতুকরস সমৃদ্ধ রচনা সেদিনের মত আজও শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে সমস্ত নরনারীকে মুগ্ধ করে। ইংরেজ সাহিত্যিক জিরোম কে জিরোম ছাড়া এরকম লেখক গোটা পৃথিবীতেই আর হয়েছেন কিনা সন্দেহ। হাকলবেরী ফিন তাঁর এক আশ্চর্য রচনা। এডভেনচার্স অব টম স্যায়ার বা টম স্যায়ারের সাহসিকতা দুষ্ট ছেলের কাহিনী হিসাবে অপূর্ব। রঙ্গব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে গভীর কথা বলার দক্ষতায় তিনি সত্যিই অদ্বিতীয়। ও হেনরি ছিলেন তাঁরই মত আর এক সর্বজন সমাদৃত মার্কিন সাহিত্যিক। গার্হস্থ্য জীবনের প্রাত্যহিক সুখদুঃখের পটভূমি থেকে ও হেনরি টুকরো টুকরো চিত্র সংগ্রহ করে যে সব ছোট গল্প লিখেছেন, পরিমিতিবোধ ও পরিবেশন কৃতিত্বে তা এক একটি হীরের টুকরোর মত। তাঁর গিফ্‌ট অব দ্যা মেজাই একটি অসাধারণ গল্প। বড়দিনের সন্ধ্যা উপলক্ষে গরীব স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্যে উপহার সামগ্রী কিনে আনলেন। স্বামী তাঁর ঘড়ি বিক্রি করে স্ত্রীর জন্যে আনলেন একটি কেশালংকরণী, আর স্ত্রী মাথার দীর্ঘ চুল বিক্রি করে স্বামীর জন্যে আনলেন একটি ঘড়ির চ্যেন। কিন্তু কোথায় চুল, আর কোথায় ঘড়ি? ইতিমধ্যে দুইই হাওয়ায় বিলীন হয়েছে। গেছে বিক্রি হয়ে। ব্যর্থ বড়দিনের এই বিষাদময় কাহিনী অন্তরে গাঁথা হয়ে থাকে সকলেরই। উনিশ শতকী মার্কিন সাহিত্যের মোটামুটি পরিচয় এই।

উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মার্কিন মুল্লুকে যে সমস্ত কবি নাট্যকার কথাসাহিত্যিক উঠেছেন, তাঁদের সকলের প্রসঙ্গ এই সংক্ষিপ্ত সমীক্ষায় উপস্থিত করা কঠিন। কবি কার্ল স্যাণ্ডবার্গ, রবার্ট ফ্রষ্ট, টমাস ষ্টার্ণ এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড, নাট্যকার ইউজেন ওনীল, গল্পকার জ্যাক লণ্ডন, ঔপন্যাসিক আপটন সিনক্লেয়ার, হাওয়ার্ড ফাষ্ট, জন ষ্টেইনবেক, আর্নষ্ট হেমিংওয়ে, থিওডোর ড্রেইজার, সিনক্লেয়ার লিউইস প্রমুখের নাম আজ বিখ্যাত সারা দুনিয়াতেই। ফকনার, পার্ল বাক এবং সলবেলোর খ্যাতিও ছড়িয়েছে ইদানীন্তন কালে। স্যাণ্ডবার্গের শিকাগো কবিতাগুচ্ছে মার্কিন সভ্যতার অন্তঃসারহীন দাম্ভিকতা ও স্ফীতির স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। ছন্দবিমুক্ত জোরালো সুরেলা গদ্যেই তিনি লিখেছেন তাঁর সমস্ত কবিতা। এলিয়টের ওয়েষ্টল্যাণ্ড বা পড়ো জমি এবং পাউণ্ডের ক্যাণ্টোজ এযুগের

মানুষকে দিয়েছে নূতন কাব্যভাবনা। এঁরা দুজন জাতিতে মার্কিন, কিন্তু স্থিতি ও খ্যাতি ওঁদের ছিল ইংল্যাণ্ডে। এলিয়ট কাব্যে গতানুগতিকতার পথ পরিহার করে নূতন নূতন ভাববিম্ব মেলে ধরেছেন। ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও চলতি সমাজ ও সংস্কৃতির কাঠামোকে তিনি শ্রেয় মনে করেন নি। ফাঁপা মানুষ নামক কবিতায় তিনি ব্যঙ্গ করেছেন আজকের আড়ম্বর ও অতিভাষণে অভ্যস্ত মানুষদের। তাঁর জার্নি অব দ্যা মেজাই বা প্রাচ্য সাধুদের যাত্রা কবিতা রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। পাউণ্ড তাঁর কবিতায় গ্রীক লাতিন ও সংস্কৃত শব্দমালা বসিয়েছেন সুর সৃষ্টির জন্যে। বিদ্যুতের মত চমক লাগান ভাষা তাঁর, যদিও সব জায়গায় সমান বোধ্য নয় তাঁর কবিতা। তাঁর চীনা কবিতার অনুবাদগুলিও অপূর্ব। তবে কেউ কেউ বলেন, তিনি চীনা ভাষা নাকি জানতেন না। আর্থার ওয়েল্যে কৃত চৈনিক কবিতা অনুবাদের ছায়ানুসরণে লেখা মূল কবিতাই সেগুলি। রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য খ্যাতির প্রথম ধাপে পাউণ্ড ছিলেন তাঁর প্রধান গুণগ্রাহীদের একজন। এ যুগের কাব্যভঙ্গী ও জীবন চিন্তায় এই দুজনের প্রভাবই সর্বাধিক। রবার্ট ফ্রষ্ট শান্তিবাদী প্রকৃতি সচেতন কবি, তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল ও পরিচ্ছন্ন। তাঁর সেই প্রসিদ্ধ কবিতা আমাকে অনেক পথ যেতে হবে, রক্ষা করতে হবে অনেক প্রতিশ্রুতি বহুজনকে উদ্দীপনা জুগিয়েছে। ওনীলের বাস্তবধর্মী নাটক আ উইলডারনেস বা আহা বন কি সুন্দর একটি মনোরম সুখনীড়ের ছবি মেলে ধরেছে চোখের সামনে। বিষাদময়ী ইলেকট্রা ও সম্রাট জোন্স তাঁর আর দুখানি ব্যঞ্জনা গভীর নাটক, যাতে প্রতিফলিত হয়েছে জীবনের বিচিত্র আলোছায়া। তাঁর ভাষার সারল্য শিক্ষিত অশিক্ষিত সব দর্শক ও পাঠক-পাঠিকাকেই মুগ্ধ করে।

কবিতায় এবং নাটকে আমেরিকা নজর করার মত অজস্র সম্পদ দিয়েছে সন্দেহ নেই। তবু তার সর্বশ্রেষ্ঠ দান সম্ভবত উপন্যাস। ফরাসী জার্মান রুশ ও ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা ধরার মত প্রধান ঔপন্যাসিক আধুনিক আমেরিকায় ওঠেন অন্তত আধ ডজন, তাঁদের মধ্যে অল্প কয়েকজনেরই মাত্র নাম করেছি এই আলোচনার গোড়ায়। আপটন সিনক্লেয়ারের অয়েল জাঙ্গল ও বষ্টন নামক প্রধান তিনখানি বই যন্ত্রগর্বী মার্কিন ধনতন্ত্রের পেষণে প্রতিদিনের খেটে খাওয়া মানুষ কি ভাবে রিক্ত সর্বস্বান্ত হচ্ছেন, তার মর্মান্তিক ছবি মেলে ধরেছে। তিনিই প্রধান মার্কিন মনীষী, যিনি সাম্য ও মানব

মুক্তির বাণীকে প্রথম সাহিত্যে রূপায়িত করেন। সিনক্লেয়ার লিউইসের মেন ষ্ট্রীট বা প্রধান রাস্তা বইয়েও গণতন্ত্র ও সুবিচারের বাণী ভাষা পেয়েছে। ব্যাবিট তাঁর মনস্তত্ব প্রধান আর একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। দুজনেই এঁরা, বিশেষত আপটন সেরা ঔপন্যাসিক। ষ্টেইনবেকের গ্রেপস অব রাথ বা ক্রোধের আঙুর এবং ড্রেইজার সিষ্টার ক্যারী বা ভগিনী ক্যারী যুগ ও জীবনের রকমারি জটিলতার পরিবেশে মানুষের অন্তর্লোকে যে সব সূক্ষ্ম ভাঙাগড়ার খেলা চলেছে, তার প্রত্যেকটি স্তর নিপুণ শিল্পীর মত ফুটিয়ে তুলেছেন। একসঙ্গে দুজনের নামোল্লেখ করা হয়েছে যদিও, কিন্তু ষ্টেইনবেক নিঃসন্দেহে শ্রেয়োতর শিল্পী।

হেমিংওয়ে এই গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং একসময়ের সর্বাধিক জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক। ফর হুম দ্য বেল টোলস বা কার জন্যে ঘণ্টা বাজে বইয়ে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে গণতন্ত্রের সংরক্ষক রূপে বীর সৈনিকদের নিবেদিত জীবনকে তিনি সমুজ্জ্বল রঙে চিত্রিত করেছেন। তাঁর ওল্ডম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী বা সমুদ্রের সেই বুড়োটি মার্লেন মাছ শিকারের এক মহাকাব্যোচিত রোমাঞ্চকর কাহিনী। সাদা তিমি শিকারের কাহিনী মবি ডিক লিখে-প্রসিদ্ধ-মেলভিলেরই যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন হেমিংওয়ে। তাঁর কিলিমেনজারোর তুষার আফ্রিকার জঙ্গল ও জংলী মানুষের পরিবেশে লেখা আর একখানি চমকপ্রদ উপন্যাস। পার্ল বাকের চীনা জীবন নিয়ে লেখা গুড আর্থ বা সদয় মৃত্তিকা এবং ড্রাগন সীড বা মৃত্যুহীন বীজ সুন্দর বই। প্রাচ্য দেশ, জাতি ও সংস্কৃতি প্রতি গভীর শ্রদ্ধার স্বাক্ষর পাই এই দুটি বইয়ে। শেষোক্ত বইটি চীন-জাপান সংগ্রামের পটভূমিতে চীনা প্রতিরোধ যুদ্ধের কাহিনী। ফকনার লিখেছেন নিগ্রোদের লিঞ্চ করে এবং দরিদ্র শ্রমজীবীদের শোষণ করে দক্ষিণের ধনী মার্কিন গোষ্ঠী কিভাবে ফেঁপে উঠেছেন, তার মর্মান্তিক কাহিনী। অ্যাজ আই ল্যে ডাইং বা আমি যখন মারা যাচ্ছিলাম এবং লাইট ইন অগষ্ট বা অগষ্টের আলো তাঁর সবচেয়ে গণনীয় বই। সল বেলো মননশীল দার্শনিক ঔপন্যাসিক এবং তাঁর হামবোলডট'স গিফট নামক বিখ্যাত বইয়ে দেখান হয়েছে যে জৈব মানুষের আর একটা সত্তা আছে, সত্যিকার মানুষ সেটাই। হাওয়ার্ড ফাষ্টের স্পার্টাকাস, আজাদী সড়ক, শেষ সীমান্ত প্রভৃতি সুতীব্র বামপন্থী আবেগের লেখা সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছে।

এঁদের আগে পরে রয়েছেন আরো বহু লেখক, যাঁদের মধ্যে নাট্যকার টেনেসী উইলিয়ামস সব চেয়ে নামী। এ ষ্ট্রীট কার নেমড ডিজায়ার বা আকাঙ্ক্ষা নামে রাস্তার গাড়ী এবং এ ক্যাট অন দ্য হট টিন রুফ বা গরম টিনের চালে বেড়াল যথার্থ বলিষ্ঠ রচনা। আর্থার মিলারের ডেথ অব এ সেলসম্যান বা ফেরিওয়ালার মৃত্যুও চমৎকার বই। এঁদের বাগ্‌ভঙ্গী ও নাটকের বিন্যাস-রীতি বাংলার সাম্প্রতিক নাট্য-আন্দোলনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে।

মার্কিন নিগ্রোদের মধ্যে গত শতাব্দীতে কবি জন ডানবার ও আধুনিকালে রিচার্ড রাইট বহুজনের শ্রদ্ধার অধিকারী। প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যিক না হলেও, সঙ্গীত নাটক ও ভাবকল্পনার রাজ্যে অদ্বিতীয় পুরুষ পল রোবসন এবং কিন্নরকণ্ঠী মেরিয়ান এণ্ডারসনও নিগ্রো আমেরিকান রূপে সর্বজগতে স্মরণীয়। প্রথমের হিয়ার আই ষ্ট্যাণ্ড বা এই আমি দাঁড়িয়ে আছি এবং শেষোক্তের মাই লর্ড হোয়াট এ মর্নিং বা হে প্রভু কি অপূর্ব প্রভাত নামক আত্মজীবনী সকলেরই পড়া উচিত।

আজকের মার্কিন প্রবন্ধকারদের মধ্যেও দার্শনিক জর্জ স্যানটায়ানা, ইতিহাসবিদ উইল ডুরাণ্ট, মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল ও আচরণতত্ত্ববাদী ওয়াটসন পৃথিবীর সর্বত্র সম্মানিত হয়েছেন। এঁরা মার্কিন মনীষারই গৌরব নন শুধু; গোটা মনুষ্য জাতিকেই গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে এঁদের চিন্তা। ডুরাণ্টের আউয়ার ইষ্টার্ণ হেরিটেজ বা আমাদের প্রাচ্যদেশীয় উত্তরাধিকার বইয়ে ভারতবর্ষ চীন জাপান ও আরব ভূমির ধর্ম সাহিত্য এবং দার্শনিক বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, তা সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক না হলেও, প্রাঞ্জল এবং সর্বজনের প্রণিধানযোগ্য। বাংলাভাষা বিশারদ অধ্যাপক নর্মান ব্রাউনও আধুনিক আমেরিকার বরেণ্য সন্তান। বাংলা ভাষার প্রধান প্রধান রচনাবলীর ইংরেজী অনুবাদে ব্রতী হয়েছেন তিনি। আমেরিকার সৃজনী প্রতিভা আজও দুর্বার গতিতে প্রবাহমান এবং যদিও ডলারগর্বী মার্কিন রাষ্ট্রশক্তি সি আই এ-র পাখায় ভর করে সারা দুনিয়ায় আজ সম্প্রসারণের জাল বিছিয়ে বসেছে, কিন্তু মার্কিন সংস্কৃতিবানরা বেশীর ভাগই মানবপ্রেম ও গণতন্ত্রের আদর্শে প্রত্যয় সম্পন্ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে মার্কিন মুল্লুকে ম্যাকার্থীর 'ডাইনি খোঁজা' শুরু হলে, যখন চার্লি চাপলিন ও রোবসনের মত মহান শিল্পীরা সরকারী বিষ নজরে পড়েন, বিদেশী স্বার্থে

গুপ্তচরবৃত্তি করার অসমর্থিত অভিযোগে বিজ্ঞানী রোজেনবার্গ-দম্পতির প্রাণদণ্ড হয় এবং আদর্শগত আত্মবিক্রয়ের আগে অবধি হাওয়ার্ড ফাস্টের ওপর অনুচিত পীড়ন শুরু হয়, তখন মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের বৃহৎ এক অংশ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক আমেরিকার প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব বলা বাহুল্য সেখানেই। তাঁর আগে 'নিগ্রো' কবি ল্যাংষ্টন হিউজ, কি আপটন সিনক্লেয়ার কিংবা থিওডোর ড্রেইজার প্রমুখ যখন কর্তৃপক্ষের অসন্তোষভাজন হয়েছেন তখন কিন্তু ঠিক এভাবে সর্বজনের না হলেও বহুজনের সমর্থন পান নি. সে কথাও স্মরণযোগ্য—যদিও সিনক্লেয়ারের অয়েল বা জঙ্গল ফাস্টের স্পার্টাকাস বা লাষ্ট ফ্রন্টিয়ারের মতোই ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল জনমানসে। এঁদের পূর্ববর্তী প্রগতিবাদী লেখক জ্যাক লণ্ডনের কল অব দি ওয়াইলড কি হোয়াইট ফ্যাং ইত্যাদি বইগুলিরও প্রবল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও, তিনিও কিন্তু ফাষ্টের মত সৌভাগ্য অর্জন করেননি।

আঠার ॥ লাতিন আমেরিকার সাহিত্য

পশ্চিম গোলার্ধে বিশাল আমেরিকা মহাদেশ মোটামুটি উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তরাংশে আছে পর পর আলাস্কা, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র, এই তিনটি অঞ্চল। মধ্যে মেক্সিকো আর দক্ষিণাংশে আছে ব্রাজিল বলিভিয়া উরুগুয়ে প্যারাগুয়ে চিলি কিউবা আর্জেন্টিনা প্রভৃতি সর্বসমেত ছোট বড় আঠাশটি দেশ। এর মধ্যে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্য নিয়ে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। আলাস্কায় কোন লিখিত সাহিত্য তৈরি হয়েছে কিনা সন্দেহ। উত্তর মেরুর গাত্রলগ্ন সিল সিন্ধুঘোটক ও পেঙ্গুইন-অধ্যুষিত এই তুষারাচ্ছন্ন মুল্লুকে বরফের ইগলু বানিয়ে বাস করেন যে এস্কিমোরা, তাঁদের মধ্যে লোকসংগীত রূপকথা পুরাকাহিনী ও প্রবাদ প্রবচন অবশ্য প্রচুরই প্রচলিত আছে। তার ঐশ্বর্য কিছু কিছু যা ইংরেজী অনুবাদে আমাদের হাতে পৌঁছেছে, তা যথার্থই অবাক হবার মত। কিন্তু সেই সুবৃহৎ অলিখিত সাহিত্য নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না এখানে। এখন আমরা মনোনিবেশ করব দক্ষিণাংশের সাহিত্যের দিকে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন মুল্লুকে অতীতে মায়া, ইনকা আজতেক তোলতেক প্রমুখ আদি গোষ্ঠীর মানুষরা বাস করতেন। তাঁদের মধ্যে চলিত ছিল নাহুয়াতল কোয়েচুয়া প্রভৃতি ভাষা এবং এই সব ভাষায় রচিত হয়েছিল প্রচুর কাব্য কাহিনী, গান ও তত্ত্বগ্রন্থ, যার মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান কৃষিবিজ্ঞান চিকিৎসাশাস্ত্র প্রাণীতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ক পুঁথি ছিল, ছিল নানাজাতীয় তুকতাক ও মন্ত্রতন্ত্র সম্পর্কীয় পুঁথিও। এই সব অঞ্চল পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে অধিকৃত হয় স্পেনীয় অভিজেতাদের দ্বারা এবং তখন থেকে সমগ্র মুল্লুকের সাধারণ সংজ্ঞা হয়ে দাঁড়ায় লাতিন আমেরিকা, অথবা স্পেনীয় আমেরিকা। এই স্পেনীয় ঔপনিবেশিকরা বাইরের পৃথিবীতে ইনকা আজতেক প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে বন্য বর্বর অসভ্য রূপে চিত্রিত করলেও, প্রকৃতপক্ষে এঁরা কিন্তু উন্নত শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতার অধিকারী ছিলেন। এঁদের সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রত্যয় এবং শিল্পসংস্কৃতি সবই ছিল সমুজ্জ্বল রুচিসমৃদ্ধ। চমনলাল রচিত হিন্দু আমেরিকা নামক বইয়ে

এঁদের সভ্যতার আংশিক পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা আগ্রহী ব্যক্তিরা পড়ে নিতে পারেন। তাঁর মতে এঁরা ভারতীয়। সমুদ্রে পথ হারিয়ে ওখানে গিয়ে পড়েছিলেন, আর ফিরে আসতে পারবেন নি।

এই আদি গোষ্ঠীর হাতে যে সাহিত্য রচিত হয়, তার পরিচয় বাইরের মানুষরা কমই পেয়েছেন, কারণ ঔপনিবেশিক শোষণ ও জবরদস্তির চাপে তাঁদের নিজস্বতা প্রায় সবই মুছে গেছে আস্তে আস্তে। তাঁদের ভাষাগুলি অপ্রচলিত হয়ে গেছে এবং দখলদারদের ভাষা স্প্যানিশ আয়ত্ত করতে করতে তাই হয়ে গেছে কালক্রমে তাঁদের ভাষা। এমন কি মায়া নাহুয়াতল আজতেক শ্রেণীর ভাষাগুলির কয়েকটির বর্ণমালা তাদের আদি পরিচয় এমন ভাবেই হারিয়ে ফেলেছে যে তাদের পাঠোদ্ধার আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। ঔপনিবেশিক স্প্যানিয়ার্ডরা তাঁদের বইপত্র বেশীর ভাগই নষ্ট করে ফেলেছেন। ১৫৬০ নাগাদ পাদ্রী লান্দা নামক এক ব্যক্তি প্রচুর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে নষ্ট করেন। অল্প কিছু যা তাঁর হাতে রক্ষা পায়, তাই উইলিয়াম ব্র্যাণ্ডনের সম্পাদনায় ইদানীং ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশিত হয়েছে থ্য ম্যাজিক ওয়ার্ল্ড [১৯৭১] নামে। এই সংকলনে মায়া নাহুয়াতল নাভাজো ওমাহা প্রভৃতি গোষ্ঠীর মুখে মুখে রচিত ঘুমপাড়ানি গান, ছড়া ও গীতি-কবিতার নিদর্শন স্প্যানিশ থেকে সরল ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। এই সব গান ও কবিতা বেশীর ভাগই অকপট উপলব্ধির ও গভীর জীবন বেদনার স্বাক্ষর বহন করে। সবচেয়ে মূল্যবান ওঁদের আদি কাব্যগাথাগুলি। জন বিয়ারহোর্ষ্টের সম্পাদনায় প্রকাশিত ফোর মাষ্টার ওয়ার্কস অব আমেরিকান ইণ্ডিয়ান লিটারেচার [১৯৭৪] নামক বইয়ে গ্রথিত সেই চারখানি কাব্য সংগ্রহের খবর আশা করি অনেকে জানেন। এর মধ্যে অগ্রগণ্য হল আজতেক পুরাণের অন্তর্গত কোয়েৎজালকোতল দেবতা সম্পর্কীয় পৌরাণিক উপকথামূলক কাব্যটি। তারপরই উল্লেখ্য ইরোকোয়া শোকানুষ্ঠান বিষয়ক কাব্যটি, যা মায়া গোষ্ঠীর রচনা এবং নাভাজোদের নৈশবন্দনা, যা জন্মমৃত্যু ও পুনর্জন্ম সংক্রান্ত এক নাতিবৃহৎ মহাকাব্য। সর্বশেষে হল মায়া ভবিষ্যদ্বাণী কুচেভ, যা এই পর্যায়ের সবচেয়ে দুর্লভ এবং অদ্যাবধি অননূদিত রচনা। এই কাব্য চতুষ্টয় খ্রীষ্টীয় সময় কালের গোড়ার দিকের, কারো কারো মতে আরো আগের লেখা এবং সুখদুঃখ ও জন্মমৃত্যু সমাকীর্ণ জগৎ ও জীবনের যে দিকটি উদ্‌ঘাটিত করে দেখায় এরা, তা কিন্তু খ্রীষ্টীয় জীবনদর্শন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পক্ষান্তরে কর্মফল ও

জন্মান্তরের অথবা তপস্যার দ্বারা মোক্ষ লাভের যে তত্ত্ব এদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে, তার সঙ্গে হিন্দু প্রত্যয়ের বেশ কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। মিল দেখা যায় সূর্য পিতৃদেবতা ও পৃথিবী মাতৃদেবতার পরিকল্পনাতে, কিংবা মৃত্যুদেবতা কাতুনের পরিকল্পনাতেও।

২.

কিন্তু লাতিন আমেরিকার সাহিত্য বলতে আজ আমরা বুঝি স্প্যানিশ ভাষায় রচিত সাহিত্যই, যা ইদানীং কালে রচিত হয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে ঔপনিবেশিক দাসত্বে বন্দী হলেও, লাতিন আমেরিকার মানুষ কিন্তু নিঃশব্দে সেই দাস্য মেনে নেননি। তাঁদের অন্তর্লোকে চিরদিনই তরঙ্গিত হয়েছে প্রতিরোধের স্পৃহা। তারই প্রথম অভিব্যক্তি সাইমন বলিভারের [১৭৮০-১৮৩০] রাজনৈতিক আন্দোলনে। তিনি উত্তরাঞ্চলের দেশগুলিকে সংহত করে বিরাট এক প্রতিরোধবাহিনী গঠন করেন এবং সশস্ত্র সংঘর্ষে স্পেনীয় দখলদারদের উচ্ছেদ করে একে একে ভেনেজুয়েলা কলম্বিয়া ও ইকোয়াডোরকে মুক্ত করেন, আর পেরুর স্বাধীনতার পথও প্রায় সবটাই প্রশস্ত করে যান। এই যে প্রতিরোধের তরঙ্গ, এরই কম্পন চলেছে পরবর্তী তিন চার দশক ভোর এবং এক-এক করে ছোট বড় সব দেশই স্পেনীয় অধিকার ঝেড়ে ফেলে ক্রমশ আত্মস্থ হয়েছে। কিন্তু সামনের দরজা থেকে স্পেন সরে গেলেও, পিছনের দরজা দিয়ে অনুপ্রবেশ হয়েছে মার্কিন ধনপতি ও রণপতিদের এবং তাঁরা খনিজ ও আরণ্যক সম্পদে ঋদ্ধ লাতিন আমেরিকার উপর শোষণের বিষ দাঁত বসিয়েছেন, কোথাও বা সরাসরি, কোথাও বা তাঁবেদার সরকারের মাধ্যমে। কিন্তু এই শতাব্দীর সূচনায় মেক্সিকোর বিপ্লব [১৯১০], প্রথম বিশ্বযুদ্ধ [১৯১৪-১৮] ও রুশ বিপ্লব [১৯১৭-২৪] প্রভৃতি ঘটনার প্রতিক্রিয়া যে উদ্দীপনা সঞ্চার করে লাতিন আমেরিকার চিত্তলোকে, ১৯৩০-এর মধ্যে তার প্রভাবে ধীরে ধীরে সব দেশই মুক্ত হয়। তারপর ১৯৫৯-এ ফিদেল কাস্ত্রোর আবির্ভাব এবং কিউবার বিপ্লব ডেকে আনে সমগ্র লাতিন আমেরিকায় যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা, তার উত্তাপেই জেগে ওঠে নূতন কালের সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতি। আর তখনই আসে লাতিন আমেরিকায় একটি অখণ্ড একাত্মতার বোধ এবং তার জ্ঞানবিজ্ঞান ও ধ্যানধারণা আঞ্চলিকতার গণ্ডী কাটিয়ে বিশ্বসংস্কৃতির দোসর হয়ে ওঠে। দর্শনে ইতিহাসে সাহিত্যে, কলাসৃষ্টি ও রাজনীতিতে,

সর্বক্ষেত্রেই বিরাট শক্তিশালী মানুষরা উঠতে থাকেন। মেক্সিকোয় ব্রাজিলে বলিভিয়ায় আর্জেন্টিনায় দেখা দিতে থাকেন এমন সমস্ত প্রতিভাধর কবি ও সাহিত্যিকরা, যাঁরা ইউরোপীয় সমধর্মীদের সঙ্গে অনায়াসেই এক পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হতে পারেন।

ষাটের দশকে চিলির বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়ি বাইশটি দেশের লেখক, অধ্যাপক ও সংস্কৃতিবিদদের যে সমাবেশ হয়, তাতেই প্রথম লাতিন আমেরিকার এই সাংস্কৃতিক সংহতির স্পষ্ট চেহারাটা প্রথম প্রকাশমান হয়। আর তখনই ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদুকরী বাস্তবতা কথাটা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। আমাদের অপরিচিত অনেক সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি-নায়কের নামের সঙ্গে এই উপলক্ষে প্রথম সাক্ষাৎকার হয় আমাদের। দুঃখের বিষয় সীমিত প্রচার ও স্বল্প অনুবাদের বিপাকে তাঁদের বেশীর ভাগের রচনার সঙ্গেই আমাদের এখনো প্রত্যক্ষ যোগ হতে পারেনি। প্রথম চমকিত হই আমরা চিলির মহিলা কবি গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রালের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তিতে। মিস্ত্রালের আসল নাম লুসিলা গোডয় আলকেইগা [১৮৮৯-১৯৫৭], তিনি শিক্ষিকা ছিলেন এবং ব্যর্থ প্রণয়ের বেদনায় কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ হন। তাঁর প্রথম ও সর্বাধিক প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতাগ্রন্থের নাম নিঃসঙ্গতা, গভীর জীবন বেদনা ও প্রকৃতি চেতনা তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। ফরাসী কবি ভার্লেনের সঙ্গে তুলনীয়া তিনি কবিতার ক্ষেত্রে। এরপর আবার নোবেল প্রাইজ পান চিলিরই কবি পাবলো নেরুদা [নেফতালি রিকার্ডো রেজ] এবং তাঁর কবিতায় প্রথম অধ্যায়ে দেখা যায় সৌন্দর্য ও নারীপ্রেমের মহিমান্বিত প্রকাশ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি বিবর্তিত হন কম্যুনিষ্ট কবিতে। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের ধাক্কায় এবং পরবর্তী জীবনের সমস্ত লেখাই তাঁর বঞ্চিত নিগৃহীত নীচু সোপানের মানুষের মুক্তির দাবীতে মুখর। তাঁর সর্বোত্তম কবিতা সংগ্রহের নাম পৃথিবীর বাসগৃহ এবং অন্যান্য কবিতা। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে জীবনে অনেক নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। দুজন মহান ঔপন্যাসিকও বিশ্বসম্মানের অধিকারী হন, এই দুই কবির মত নোবেল প্রাইজ পেয়ে। তাঁদের প্রথম জন হলেন গুয়েতেমালার মিগুয়েল এঞ্জেল আস্তুরিয়াস। তাঁর সর্বাধিক পরিচিত উপন্যাস হল প্রেসিডেন্ট, যা বহুকাল পর্যন্ত তিনি প্রকাশই করতে পারেন নি রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে। তিন খণ্ডের আর একখানি উপন্যাস লেখেন তিনি, কলা বাগিচার বঞ্চিত শ্রমিকদের দুঃখ কষ্ট নিয়ে। সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় নামে প্রথম খণ্ডটি মাত্র অনুবাদ হয়েছে

তার ইংরেজীতে। অসামান্য জীবন-সচেতন সত্যসন্ধী লেখক তিনি, ধর্মের চেয়ে মানুষ বড় এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি লেখার মধ্য দিয়ে সারা জীবন। ১৯৬৭-তে নোবেল প্রাইজ পান তিনি। ১৯৮২-তে ফের নোবেল প্রাইজ পেলেন কলম্বিয়ার বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, তাঁর শতাব্দীর নীরবতা নামক উপন্যাসের জন্যে। সমগ্র লাতিন আমেরিকার হৃদয় বেদনা যেন মূর্ত হয়েছে তাঁর লেখার মধ্যে। অবশ্য বর্তমানের দুর্যোগকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন, যদিও আশাপ্রদ ভবিষ্যতের বার্তাও শুনিয়েছেন সেই সঙ্গে। তিনি বলেছেন, মানুষ শেষ পর্যন্ত অন্ধকারে পথ হারাবে না। সে নিজেও জাগবে আলোর স্পর্শ পেয়ে, জাগাবে অন্যকেও। ম্যাকসিম গোর্কিও অনুরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাঁর নীচের গভীরে নাটকে, সব মানুষই প্রতীক্ষা করে থাকেন এক অনাগত সুদিনের জন্যে। সেদিন আসবেই।

দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্যের ইতিহাস বলা বাহুল্য শুধু এইটুকু নয়, বা এই কজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ছোট বড় সব দেশেই উঠেছেন, এখনো উঠছেন অগণ্য কবি নাট্যকার কথাসাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার। অনুবাদের সেতুপথ দিয়ে তাঁরা এশিয়ায় এখনো ভাল করে এসে পৌঁছাননি। যাঁরা এসেছেন এবং যাঁদের রচনাবলীর সঙ্গে আমাদের জানা শোনা হচ্ছে, তাঁদের সম্বন্ধেই তাই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। একটা কথা শুধু এই উপলক্ষে বক্তব্য যে স্প্যানিশ ভাষায় রচিত হলেও, লাতিন আমেরিকার সাহিত্য কিন্তু একেবারেই স্পেনের সাহিত্যের অনুবৃত্তি নয়। তার ভূগোল ইতিহাস সম্পূর্ণ আলাদা, আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনদর্শন পুষ্ট করেছে তাকে। ইউরোপ আমেরিকার অনুকরণের মোহ কাটিয়ে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হন তাঁরা বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই। আজ চলছে তারই জয়যাত্রা।

ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সবই যদিও বৃটিশ জাতির হাতে তৈরি হয়েছে এবং ইংরেজ জাতির মাতৃভাষা রূপেই যদিও ইংরেজীর প্রধান গৌরব স্বীকার্য, তবু মনে রাখতে হবে যে অনিংরেজ দুনিয়ার এক বৃহৎ অংশেও ইংরেজী লাভ করে মাতৃভাষার সম্ভ্রম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন মুল্লুকেই ইংরেজী চলে মাতৃভাষা রূপে এবং তাঁরাও ইংরেজী সাহিত্যে নজর করার মত জিনিষ খুব কম দেননি। এমন কি আরব, মিশর, ভারতবর্ষ এবং চীন জাপানেও বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ভাষা হিসাবে ইংরেজী ভাষার ব্যাপক শিক্ষণ ও প্রচার থাকায়, সে সব দেশেও লক্ষ্য করার মত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজীতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আদান প্রদানের ভাষা ছিল ফরাসী, তাই তাকে বলা হত লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজী নিয়েছে সেই জায়গা। কিন্তু ও কথা থাক। আমরা অনিংরেজদের হাতে তৈরি ইংরেজী সাহিত্যের ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নেব এবার।

মার্কিন সাহিত্যের কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। এবার বলব কানাডীয় সাহিত্যের কথা। কানাডায় একই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলে দুটি সাহিত্য, ইংরেজী ও ফরাসী। ফরাসী ঔপনিবেশিকদের সংখ্যা সেখানে বড় জোর দশ লক্ষ, আর ইংরেজদের সংখ্যা দুকোটির কাছাকাছি। কিন্তু সংখ্যাল্প হলেও কানাডীয় ফরাসীরা তাদের ভাষা ও সাহিত্যের স্বাধিকার আপ্রাণ শক্তিতেই রক্ষা করে চলেছেন। প্রথমত তাঁরা ফরাসীকে যুগ্ম রাষ্ট্রভাষা করাতে সমর্থ হয়েছেন, দ্বিতীয়ত ফরাসীতে সৃষ্টি করেছেন এমন এক নিজস্ব সাহিত্য, যা মূল ফরাসী ভূমির বিশাল সাহিত্যের লেজুড় মাত্র নয়। কোনা সিঙ্গ এঞ্জার্স, অক্টেভ ক্রীমাজী, এমিল নেলিগাঁ প্রমুখ উপন্যাস ও কবিতা লেখকরা উনিশ শতকে যে সাহিত্যিক ঐতিহ্য স্থাপন করেন, তাই পরবর্তী ধাপে এসে গণনীয় সাহিত্য-কীর্তিতে রূপ পেয়েছে। জাঁ শার্ল হার্ভো রচিত স্ন্যাক ক্লথ ফর ব্যানার, গ্যাব্রিয়েল রয় রচিত দ্যা টাউন

বেলো, এন্তনি সাভার্দ রচিত বস অব দ্যা রিভার এবং রিংগুয়ে রচিত থার্টি একার্স উপন্যাস গুলিতে দেশ ও জাতির মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রবাসী মনের বেদনা যেমন ধরা পড়ে, তেমনি কৃষিপ্রধান কানাডায় দ্রুত শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাত্রায় হয়েছে যে জটিলতার আবির্ভাব, তাকেও সজাগ ভাবে উপলব্ধি করার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় ফরাসী উপন্যাসের তুলনায় কানাডীয় ফরাসী উপন্যাসের সুর অবশ্য কিছুটা প্যাষ্টোরাল বা গ্রামমুখী এবং রোমান্টিক। এইজন্যেই কবিতায় কানাডীয় ফরাসীদের বৈশিষ্ট্য ফুটেছে সর্বাধিক। ক্রীমাজী ও নেলিগাঁ দিয়ে যাত্রা শুরু করে এনে হাবার্ট ও এলাঁ গ্রাঁদ বোয়ে পর্যন্ত এলে প্রচুর সার্থক ও জীবন্ত কবিতা পাই আমরা। বোস্কেৎ সম্পাদিত লা পোয়েজী কানাদিয়ানে সংকলনটির ইংরাজী অনুবাদ অনেকেই পড়েছেন আশা করি।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে কানাডীয় ইংরেজী সাহিত্যে ফুটেছে বলিষ্ঠতর মননশীলতা ও সৃজনী শক্তির স্বাক্ষর এবং সে সাহিত্য হয়েছে একান্ত ভাবেই কানাডার সাহিত্য, বৃটিশ বা মার্কিন ছাঁচের অনুবৃত্তি মাত্র নয়। মূলত কবিতা এবং গল্প উপন্যাসই লিখেছেন কানাডীয় লেখকরা। নাটক কম। তার একটা কারণ গোড়া থেকেই কানাডার সমাজে রঙ্গমঞ্চ প্রাধান্য পায়নি। তাছাড়া বোধহয় জাতীয় প্রবণতাই নাটক ও নাট্যাভিনয়ের অনুকূল নয়, তাই কানাডীয় ফরাসীরাও নাটক খুবই কম লিখেছেন। প্রথম গণনীয় কবি ও নাট্যকার হলেন জেমস রীভ্যে, যাঁর কিল ডিয়ার বা ঘাই হরিণী নাট্যে গৃহযুদ্ধের পাশাপাশি হৃদয়ানুরাগের একটি মর্মান্তিক ছবি ফুটেছে। তাঁর রক্তাক্ত হৃদয় কবিতাগুচ্ছও বেশ সুখপাঠ্য। মর্ডেকাই রিশালার চমকপ্রদ কাহিনীকার হিসাবে একদা বহুজনের প্রিয় লেখক ছিলেন। এখনো তাঁর বিখ্যাত বই এক্রোব্যাটস বা বাজিকার ইংলণ্ড আমেরিকায় বহুল প্রচারিত। এ চয়েস অব এনিমিজ বা শত্রু নির্বাচনও তাঁর সুন্দর রচনা। হিউ ম্যাকলেনান গভীরতর জীবনবেত্তা লেখক। তাঁকে বলা হয় তাই কানাডীয় ডিকেন্স। তাঁর প্রতি মানুষের ছেলে এবং যে প্রতীক্ষায় রাত্রি শেষ হয় পৃথিবীর গণনীয় উপন্যাসগুলির মধ্যে অনায়াসেই ঠাঁই পেতে পারে। কুইবেক ও মন্ট্রিয়েল শহর তাঁর রচনায় ছত্রে ছত্রে মূর্ত হয়েছে।

মহিলা লেখিকা ইয়েল উইনসন এবং কৌতুকরসিক ষ্টীফেন লিককও আঞ্চলিকতার সীমাতিক্রম করে সারা পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করেছেন। প্রথমের প্রেম ও লোনা জল চমৎকার বই। নারী মনের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম অনুভূতি

এবং স্বপ্নগুলি এই উপন্যাসে জীবন্ত হয়েছে। ডানকান স্কট ম্যাজিক হাউস বা মায়া গৃহ নামক অনুপম গল্প সংগ্রহ এবং গ্রীন ক্লয়িস্টার বা সবুজ আস্তানা কবিতা সংগ্রহ লিখে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। আর একজন প্রসিদ্ধ কবি হলেন চার্লস ডগলাস রবার্টস। সং অব ত্থা কমন ডো বা সাধারণ দিনের গান বইটির মধ্যে সংকলিত হয়েছে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি। রবার্ট উইলিয়াম সার্ভিস এবং আর্থার জেমস্ স্মিথ অন্য দুজন জনপ্রিয় কবি। বৈদগ্ধ্য ও মননশীলতা পূর্ণ উচ্চাঙ্গের গদ্য সাহিত্য অপেক্ষা সাংবাদিক প্রবন্ধ এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়পাঠ্য আলোচনা গ্রন্থ রচনাতেই কানাডীয় লেখকদের বেশী আগ্রহ দেখা যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে ইংরেজী সাহিত্য তৈরি হয়েছে, তা প্রবাসী ইংরেজের সৃষ্টি। আফ্রিকার মাটি ও মনের স্পর্শ তাতে আছে ঠিকই, কিন্তু জীবন্ত কণ্ঠ নেই। যাই হোক ওঁদের মধ্যে সব চেয়ে অগ্রবর্তী হলেন ভ্যাণ্ডারপোষ্ট লরেন্স, আর মোফাণ্ড লেলে এজেকিয়েল। শেষোক্ত জন সম্ভবত মিশ্ররক্ত সম্ভূত। প্রথমের কালাহারীর হারান পৃথিবী আরণ্যক আফ্রিকার অত্যাশ্চর্য রোমাঞ্চ কাহিনী। মোফাণ্ডর দ্বিতীয় গলি ধরে অপূর্ব আত্মজীবন কাহিনীমূলক আখ্যায়িকা। আফ্রিকার ছবি নামে আছে তাঁর সুন্দর একটি প্রবন্ধ পুস্তকও। রয় ক্যাম্পবেল ইংল্যাণ্ডবাসী এবং ইংরেজী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, তাই তাঁর কথা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। কাঁদো প্রিয়দেশ উপন্যাসের লেখক এলেন ষ্টুয়ার্ট প্যাটন কিন্তু আফ্রিকান না হলেও, মানব প্রেমের আন্তরিকতায় আফ্রিকার মনের মানুষ হয়েছেন, এ স্বীকার করতেই হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার লেখক তালিকা অবশ্য এখানেই শেষ নয়। আরো কয়েকজনের নামোল্লেখ করতেই হবে। তাঁদের মধ্যে ফ্রেডরিক গাই বাটলার, উইলিয়ম প্লোমার এবং সারা গার্টরুড মিলিনের নাম নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রগণ্য। বাটলারের কবিতা সংগ্রহ ইউরোপে আগন্তুক, প্লোমারের উপন্যাস আক্রমণকারীরা এবং ব্যাপারটা উল্টে গেল ভীড়ে হারানর মত লেখা নয়। তা নয় মহিলা ঔপন্যাসিক মিলিনের লেখাও। তাঁর ঈশ্বরের আর এক পক্ষের ছেলে এবং আদমের বিশ্রাম সত্যিই সার্থক উপন্যাস। পার্ল বাকের চীনপ্রীতির মত এঁর আফ্রিকাপ্রীতিও স্মরণীয় হবার যোগ্য।

আফ্রিকার নাইজেরিয়াতেও গণনীয় লেখক উঠেছেন কয়েকজন।

তাঁদের মধ্যে কবি ও নাট্যকার ওলে সইংকা ও ঔপন্যাসিক আমস তুতুওলা ইংরেজী পঠনপাঠনে অভ্যস্ত-তুনিয়ায় সুপরিচিত। প্রথমের অরণ্যের নৃত্য কবিতা সংকলন এবং জেরো দাদার বিচার নাটক, আর দ্বিতীয়ের জঙ্গলের পালক ঢাকা নারী সযত্নে প্রণিধানের যোগ্য রচনা। ছায়াচিত্রে শেষোক্ত বইটির রূপায়ণ আশা করি অনেকেই দেখেছেন।

অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডেও ঔপনিবেশিক ইংরেজদের উদ্যোগে পর্যাপ্ত সাহিত্যের ফসল উৎপন্ন হয়েছে। আদিবাসী আরণ্যক অষ্ট্রেলয়েড ও নিগ্রোয়েড গোষ্ঠী সম্ভূত মানুষরা বলাই বাহুল্য শ্বেত ঔপনিবেশিকদের দাপটে উৎখাত হয়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন এবং একালীন শিক্ষাদীক্ষার আলো কিছুই পান নি। এখন অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের মালিকরা সবাই শ্বেত জাতির সন্তান, আর অনেকেই তাঁরা গোড়ায় এসেছিলেন নির্বাসিত বা আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে। কানাডীয় ইংরেজ ও ফরাসী বা যুক্তরাষ্ট্রীয় মার্কিনদের মত না হলেও, এঁরাও বৃহৎ একটি সভ্যতাই গড়ে তুলেছেন। তাঁদের সাহিত্যে হয়েছে তারই প্রতিফলন। বিখ্যাত পণ্ডিত ও গ্রীক নাট্যানুবাদক গিলবার্ট মারে অষ্ট্রেলিয়াবাসী হলেও, প্রকৃতপক্ষে তাঁর কর্মক্ষেত্র ইংল্যাণ্ড, তাই তাঁকে এই তালিকাভুক্ত করছি না আমরা। আমরা এখানে বলব বিশুদ্ধ অষ্ট্রেলীয় কবি ও কথাসাহিত্যিকদের বিষয়ে দু'চার কথা, কারণ সাহিত্যের এই দুই বিভাগেই তাঁদের দান সমধিক।

ঔপন্যাসিক হিসাবে পামার ভ্যান্স এডোয়ার্ড খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁর ব্ল্যাক হাউস বা কালো বাড়ী নাটক এবং তিন খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাস গোলকোণ্ডা, ফসলের বেলা এবং বৃহৎ ব্যক্তি গলসওয়াদির ফরসাইট গ্রন্থমালার মত একটি বংশানুক্রমিক জীবন প্রবাহের মনোরম কাহিনী। মার্টিন বয়েড এবং র‍্যাণ্ডলপ ষ্টোও শহুরে মধ্যবিত্তের প্রিয় ঔপন্যাসিক। প্রথমের বেয়াড়া যুবক এবং দ্বিতীয়ের ভূতুড়ে জমি উপভোগ্য বই, যদিও কোনটাই মননশীল লেখা নয়। মহিলা ঔপন্যাসিক ক্যাথারিন সুজানা পিকার্ড সত্যকার শক্তিশালী লেখিকা। তাঁর ওয়ার্কিং বুলক বা মেহনতী বলদ শ্রমকারী নীচু সোপানের মানুষদের জীবন সংগ্রামে ছবিকে দরদের সঙ্গে চিত্রিত করেছে। লক্ষণীয় যে কথাসাহিত্যিকদের তুলনায় কবিদের আবির্ভাব হয়েছে অষ্ট্রেলিয়ায় অনেক বেশী। বোধহয় প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর প্রভাবই তার কারণ। অষ্ট্রেলিয়ার কবিদের মধ্যে ক্রীষ্টোফার ব্রেনান, তুষারাচ্ছন্ন নদীর মানুষ নামক কবিতা

গ্রন্থের রচয়িতা এণ্ড বার্টন পেটারসন, চলমান প্রতিবিম্ব লেখিকা জুডিথ রাইট এবং একশো কবিতা সঞ্চয়নের কবি কেনেথ স্লেসন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। স্বদেশের বাইরেও তাঁদের নামের ব্যাপ্তি হয়েছে।

নিউজিল্যাণ্ডের সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যেও রোনাল্ড এলিসন, ম্যাজন জেমস, কেয়ার ব্যাক্সটার, মেরী উরজুলা বেথেল প্রমুখ বিশিষ্ট কবির নাম আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌছেছে। ম্যাজনের কিছু নতুন নয় এবং ব্যাক্সটারের আগুন ও নেহাই নামক সংগ্রহে বেশ কিছু সার্থক কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কবি স্টুয়ার্ট ডগলাসের জাহাজডুবি নাটক এবং অষ্ট্রেলিয়ার জংলী গাথা নামক সংকলনও বহুজনের প্রশংসায় সম্বর্ধিত হয়েছে। নিঃসঙ্গ বালক নামক উপন্যাসের স্রষ্টা হেক্টর বোদিয়া কথা-সাহিত্য ছাড়াও জীবনী ভ্রমণ কাহিনী ও বিবিধ বিষয়ে বহু বই লিখেছেন, যদিও এই উপন্যাসখানিই তাঁর সর্বোত্তম রচনা।

২.

অনিংরেজ দুনিয়ার যে সব দেশে উল্লেখযোগ্য ইংরেজী সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তার অধিকাংশই হয়েছে ঔপনিবেশিক ইংরেজদের বা স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত তাঁদের সন্ততিদের হাত দিয়ে। কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, সব দেশ সম্বন্ধেই একথা খাটে। কিন্তু যাঁরা ইংরেজ নন, অর্থাৎ ইংরেজী যাঁদের মাতৃভাষা নয়, হয় বিদেশী শাসকদের দ্বারা প্রবর্তিত সরকারী ভাষা, নয় উচ্চশিক্ষার মাধ্যমরূপে যাঁরা ইংরেজী শিখেছেন, অথবা ইংরেজীর প্রতি অনুরাগবশেই তা শিখেছেন, তাঁরাও ইংরেজী ভাষার ভাণ্ডারে লক্ষ্য করার মত দান রেখেছেন যথেষ্ট। আমরা বলছি ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, আরব প্রভৃতি এশীয় দেশের কথা এবং এইসব দেশের অগ্রগণ্য ইংরেজী লিখিয়েদের কথা।

চীনের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক লিন উটাং-এর উপন্যাস এ লীফ ইন ষ্টর্ম বা ঝড়ের মুখে একটি পাতা এবং জাপানী কবি ইয়োনে নোগুচির পোয়েমস এণ্ড পিকচার্স বা কবিতা ও ছবি নামক কবিতা সংগ্রহ আশা করি বহুজনেই পড়েছেন। রঁদা-শিষ্য স্বনামধন্য আরব শিল্পী ও কবি খলিল জিব্রানের কবিতা সংগ্রহ দ্য ম্যাডম্যান এণ্ড হিজ প্যারাবল বা পাগল ও তার উপকথা বইও কাব্যামোদী সমাজে সুবিদিত। অমনি সুবিদিত তুরস্কের মহিলা নেত্রী সংস্কারক ও সাহিত্যিক হালেদা এদিবের ইংরেজী রচনাবলী। তবে মধ্যপ্রাচ্যের

সিরিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় আলজিরিয়া মরক্কো প্রভৃতি দেশে ইংরেজীর চেয়ে ফরাসীর চর্চা বেশী হয়েছে। তা হয়েছে ভিয়েতনামেও। আফগানিস্থান পারস্য ও মিশরে কিন্তু ইংরেজীতে বই পুঁথি লেখা হয়েছে প্রচুর। সে লেখা গণনীয় সাহিত্য কীর্তিরূপে হয়ত উল্লেখ্য নয়, কারণ সৃষ্টিধর্মী ইংরেজী লেখার সংখ্যা তাঁদের খুবই নগণ্য। লেখা হয়েছে বেশীর ভাগই রাজনীতি সংস্কৃতি ও ইতিহাস সংক্রান্ত বই এবং বলা বাহুল্য তা লেখা হয়েছে দেশের বক্তব্য দুনিয়ার গোচরে পৌঁছে দেবার প্রয়োজনে।

ভারতবর্ষেও ইংরেজীতে বই পত্র লেখা হয়েছে প্রধানত একই প্রয়োজনে। ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধ্যান ধারণার এবং ভারতীয় কলাকৃষ্টি ও জীবনচর্যার স্বরূপ বর্হির্জগতে বুঝিয়ে বলার আগ্রহে বিদ্বান পণ্ডিতরা কলম ধরেছেন। রাজনীতিবিদরা দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন সারা পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলিতে। এই দুই কাজেই ইংরেজী হয়েছে তাঁদের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। এছাড়া অবশ্য ইংরেজী সাহিত্যের ঐশ্বর্যও তাঁদের মুগ্ধ করেছে, উদ্রিক্ত করেছে তাঁদের কল্পনা, আবেগ ও সৃজনী শক্তিকেও। তার ফলে প্রয়োজনের সাহিত্য ছাড়াও রসাত্মক বা সৃষ্টিমূলক সাহিত্য রচনার দিকেও আকৃষ্ট হয়েছে তাঁদের মন। তাঁরা কাব্য নাটক এবং গল্প উপন্যাসও লিখেছেন কিছু কিছু, যার কথা পরের অধ্যায়ে বলা হবে।

প্রসঙ্গত বক্তব্য যে অনেক ব্যাপারে যেমন, ইংরেজী লেখার ব্যাপারেও তেমনি রামমোহন রায়ই ভারতবাসীর মধ্যে প্রথম। ইউনিটারি খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে হিন্দু একেশ্বরতত্ত্বের তুলনামূলক বিতর্ক নিয়ে তিনি ১৮২০-তে লেখেন প্রা ট্‌স গসপেল অব আওয়ার লর্ড জেসাস বা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রকৃত ধর্মোপদেশ নামক মূল্যবান বই। তাঁর অব্যবহিত পরেই রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু দর্শনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে লেখেন তাঁর হিন্দু ফিলজফি নামক বই। তাছাড়া শিক্ষা বিষয়েও আছে তাঁর একখানি প্রয়োজনীয় বই। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র দুখণ্ডে উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিবৃত্ত বা এণ্টিকুইটিজ অব ওড়িশা এবং প্রাচীন ভারতে গোমাংস বা বীফ ইনশেণ্ট ইণ্ডিয়া বই প্রসিদ্ধ ছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র [বিখ্যাত টেকচাঁদ] অধিবিদ্যা বিষয়ক উড়ো পাতা বা স্পিরিচুয়াল ষ্ট্রো লীভস লেখেন, যাতে দর্শনের আলোয় প্রেততত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। তাঁর অনুজ কিশোরীচাঁদ

সিপাহী বিদ্রোহকালে বাঙালী মধ্যবিত্তের ইংরেজানুগত্য যে অটুট ছিল, এই তথ্য প্রচারের জন্যে নেটিভ ফাইডেলিটি বা দেশী লোকের রাজভক্তি লেখেন।

মধুসূদনের লেখা দ্যা এংলো-স্যাক্সন এণ্ড দ্যা হিন্দু নামক পুস্তিকায় ভারতীয় ও বৃটিশ সভ্যতা তুলনামূলক মূল্যায়নের প্রশংসনীয় প্রয়াস দেখা যায়। হরিশ মুখোপাধ্যায়ের সাম ডিসকোর্সেস অন রিলিজীয়াস টপিকস বা ধর্মতত্ত্ববিষয়ক কতকগুলি আলোচনা এবং কেশবচন্দ্র সেনের ইণ্ডিয়া আসক্স্ হু ইজ জীসাস ক্রাইষ্ট বা ভারতবর্ষ জানতে চায় যীশু খ্রীষ্ট কে বইও এক সময় বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক শশিচন্দ্র দত্ত—এঁর কথা পরেও বলেছি—লিখেছিলেন ওয়াইল্ড ট্রাইবস অব ইণ্ডিয়া, রিয়ালিটিজ অব ইণ্ডিয়ান লাইফ প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ উল্লেখনীয় সমাজবিজ্ঞানের গ্রন্থ। এরপর রমেশচন্দ্র দত্ত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, বৃটিশ ভারতের আর্থনীতিক ইতিহাস এবং বাংলার সাহিত্য নামক বইগুলির জন্যে দেশে বিদেশে বিশেষ খ্যাতিমান হন। ভারতীয় অর্থনীতি বিষয়টিকে চিন্তার রাজ্যে প্রথম উপস্থাপিত করা হল রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং পরবর্তী অধ্যায়ে স্বদেশী আন্দোলনের নায়করা এ বই থেকেই প্রচুর প্রেরণা লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখাতেও তিনিই অগ্রপথিক। তাঁর আগে অবশ্য কাশীপ্রসাদ ঘোষ বেঙ্গলী বুকস এণ্ড রাইটার্স বা বাংলা বই ও তার লেখকরা নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখেছিলেন।

প্রখ্যাত জননেতাদ্বয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল তাঁদের আত্মজীবনী লিখেছেন, যা পাণ্ডিত্য ও লিখন শৈলীতে অদ্বিতীয়। প্রথমের এ নেশন ইন মেকিং বা নির্মাণের পথে একটি জাতি এবং দ্বিতীয়ের মাই লাইফ এণ্ড টাইমস বা আমার জীবন ও সময় সত্যিই অসাধারণ রচনা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনী লাইফ অব এ হিন্দু কেমিষ্ট বা একজন হিন্দু রসায়নবিদের জীবন। এ ছাড়া তাঁর ভারতীয় রসায়নের ইতিহাস এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জৈব ও অজৈবের সাড়া বা রেসপন্স অব দ্যা লিভিং এণ্ড দ্যা নন-লিভিং জগদ্বিখ্যাত বই। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সমালোচনা বিষয়ক নূতন রচনা [নিউ এসেজ ইন ক্রিটিসিজম], বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম [বেঙ্গল বৈষ্ণবিজম] হিন্দুদের প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান [পজিটিভ সায়ান্সেস অব দ্যা হিন্দুজ] যদুনাথ সরকারের মুঘল ইতিহাস-সংক্রান্ত বইগুলি, বিশেষত আওরঙজেব, স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী, অরবিন্দের লাইফ

ডিভাইন বা দিব্য জীবন এবং এসেজ অন গীতা বা গীতা বিষয়ক প্রবন্ধাবলী, মানবেন্দ্র রায়ের রিজন রোমান্টিসিজম এণ্ড রেভল্যুশন বা যুক্তি ভাবাবেগ ও বিপ্লব এবং সুভাষচন্দ্র বসুর ইণ্ডিয়া ইন ষ্ট্রাগল বা ভারতের সংগ্রামও শিক্ষিত নরনারী মাত্রেরই পরিচিত রচনা।

প্রধানত বাঙালী লেখকদের বিদ্যাবৈদগ্ধ্যপূর্ণ ইংরেজী রচনার উল্লেখ ও আলোচনা দেখে অনেকে হয়ত বলবেন, ভারতের অন্যান্য রাজ্যে কি কিছুই লেখেন নি কেউ ইংরেজীতে? বলা বাহুল্য মোটেই তা নয়। সব রাজ্যেই ইংরেজী লেখা হয়েছে এবং অনেক বইয়ের সর্বভারতীয় ত বটেই, আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধিও আছে। বাল গঙ্গাধর তিলক লেখেন আর্কটিক হোম অব দ্যা এরিয়ানস বা আর্যদের জন্মভূমি মেরুলোক নামক প্রসিদ্ধ বই, যাতে বৈদিক সভ্যতার সময় ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন তিনি যথেষ্ট বিচারবুদ্ধি সহকারে, যদিও তাঁর সিদ্ধান্ত বেশীর ভাগই আজ আর স্বীকার্য মনে করেন না প্রত্নবিজ্ঞানীরা। প্রখ্যাত ভাণ্ডারকারের ইতিহাস-বিষয়ক রচনাগুলি বিশেষ করে শৈব শাক্ত বৈষ্ণব ও অন্যান্য গৌণ ধর্মসম্প্রদায় গ্রন্থটি আকর-পুস্তকরূপেই গৃহীত হয় এখনো। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের লেখা হিন্দু ভিউ অব লাইফ বা হিন্দু জীবন চর্যার রূপ, কল্কি অর দ্যা ফিউচার অফ সিভিলাইজেশন বা কল্কি অথবা সভ্যতার ভবিষ্যৎ, দ্যা ফিলজফি অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর বা রবীন্দ্রনাথের দর্শন প্রভৃতি বই প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণের জন্যে খুবই সুখপাঠ্য, যদিও যথেষ্ট মৌলিক চিন্তায় সমৃদ্ধ কিনা সন্দেহ। তাঁর হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়ান ফিলজফি বা ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসও প্রতীচ্য দুনিয়ায় বিশেষ সমাদৃত গ্রন্থ। কিন্তু একই বিষয়ে রচিত অধ্যাপক হিরিয়ানার বই গভীরতর এবং সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত বই তথ্যাহরণে, বিশ্লেষণে, সর্বোপরি তুলনাত্মক দার্শনিক প্রজ্ঞায় অধিকতর সম্মানের অধিকারী।

আনন্দ কুমারস্বামী [ইনি আদিতে সিংহলী] রচিত ভারতীয় শিল্পের প্রাণতত্ত্ব ও আঙ্গিক বা দ্যা স্পিরিট এণ্ড টেকনিক অব ইণ্ডিয়ান আর্ট বইও অশেষ মূল্যবান এই জন্যে যে তা প্রথম ভারতশিল্পের মর্মবস্তুর সঙ্গে বিশ্ববাসীর পরিচয় সূত্র দৃঢ় করে। সংস্কৃতি ও জীবন চর্যার অপরাপর দিক নিয়েও আছে তাঁর অনেক বই। গান্ধীর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর আত্মকাহিনী অবশ্য গুজরাটীতে লেখা, যদিও ইংরেজীও তিনি চমৎকার লিখতেন। তাঁর

ছোট্ট বই ইণ্ডিয়ান হোম রুল বা ভারতের স্বায়ত্ত শাসন এককালে লোকের হাতে হাতে ঘুরত। তার বিষয়বস্তু আজ আবেদনভ্রষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু প্রসাদগুণ সম্পন্ন রচনা হিসাবে বইটি এখনো পড়ার যোগ্য। লালা লাজপত রায়ের আনহ্যাপী ইণ্ডিয়া বা অভাগিনী ভারতবর্ষ বই যদিও মিস মেয়ো লিখিত এককালের কুখ্যাত রচনা মাদার ইণ্ডিয়ার প্রত্যুত্তর রূপে লেখা, তা সত্ত্বেও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আত্মিক পরিচয় এতে সুন্দর রূপে তুলে ধরা হয়েছে।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের ডিভাইডেড ইণ্ডিয়া বা বিভক্ত ভারতও সাময়িক সমস্যার উত্তাপে লেখা বই। কিন্তু তাতেও আছে সজীব ইতিহাস জ্ঞান ও ভারত বোধের স্বাক্ষর। জওহরলাল নেহরুর আত্মজীবনী অপূর্ব ভাষা ও উজ্জ্বল আত্মসমীক্ষার গুণে অসাধারণ লেখা। তাঁর বিশ্ব ইতিহাসের কয়েক ঝলক বা গ্লিম্পসেস অব ওয়ার্লড হিষ্ট্রি কিন্তু অনবদ্য ইংরেজীতে নিতান্ত চলনসই বই। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে ইংরেজী লিখিয়ে হিসাবে নেহরু সত্যিই অনন্য। রামমনোহর লোহিয়ার সাইকল অব হিষ্ট্রি [ইতিহাসচক্র] এবং এস. এ. ডাঙ্গের ফ্রম প্রিমিটিভ কম্যুনিজম টু মডার্ন স্লেভারি [আদিম সাম্যতন্ত্র থেকে একালীন দাসত্ব] রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন এবং প্রকৃত পাণ্ডিত্যে সমৃদ্ধ রচনা।

৩.

ভারতীয় ইংরেজী লেখকদের সৃষ্টিমূলক রচনার প্রসঙ্গ নিয়ে এবার আলোচনা করব। তার আগে ভারতবর্ষে বসবাসকারী ইংরেজদের নজর করার মত কোন সাহিত্য কর্ম আছে কিনা সে বিষয়ে দুএকটা কথা বলা দরকার। লক্ষণীয় যে কানাডা অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড বা দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের মত ভারতীয় ইংরেজরা কেউ গণনীয় আকারের সাহিত্য রেখে যান নি। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে ঐসব দেশের মত এখানে ইংরেজরা স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হন নি। এখানকার মৃত্তিকার সঙ্গে তাঁদের তাই এমন প্রাণের যোগ গড়ে ওঠেনি, যা সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা জোগাবে। তাছাড়া ওসব দেশে সাহিত্য সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিজস্ব কোন ঐতিহ্য ছিল না। ঔপনিবেশিকরাই করেছিলেন তার ভিত্তি স্থাপন। কিন্তু ভারতে এসে তাঁরা দেখেছেন এমন এক জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির

সজীব প্রবাহ, যার নাগাল ধরার মত সৃজনীশক্তিসম্পন্ন মানুষ প্রায় কেউই ছিলেন না আগন্তুকদের মধ্যে। তাঁরা তাই স্রষ্টা লেখক হওয়ার চেয়ে ভারত-তত্ত্ববিদ্ হওয়ার দিকেই বেশী মন দিয়েছেন। উইলিয়াম জোন্স, হোরেস হেম্যান উইলসন, কোলব্রুক, চার্লস উইলকিন্স, কানিংহাম, গ্রিফিথ, প্রিন্সেপ, মার্শাল, জ্ঞানীগুণী বহুজনের নাম করা যেতে পারে, যাঁদের কাছে ভারতবাসীর ঋণ অপরিশোধ্য।

জোন্স এদেশে প্রথম প্রাচ্য বিদ্যা অনুশীলনের কেন্দ্ররূপে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। তাছাড়া তিনি মনুসংহিতা ও শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদ করেন। শকুন্তলার আর একজন অনুবাদক ছিলেন মনিয়ার উইলিয়ামস। উইলসন করেন মেঘদূতের এবং গ্রিফিথ কুমারসম্ভবের অনুবাদ। কোলব্রুক-কৃত গীতার অনুবাদও তদানীন্তন ইংরেজ ও মার্কিন পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইউরোপের নানা দেশেই এই সময় ভারতবিদ্যার চর্চা শুরু হয় বিপুল উৎসাহে এবং বপ বর্নৃফ ডেবর ম্যাক্সমুলার জেকবি ওলডেনবুর্গ প্রমুখ খ্যাতনামা পাণ্ডিতের আবির্ভাব হতে থাকে। ভারতে আগত পূর্বোক্ত পণ্ডিতদের দান ওঁদের তুলনায় বিরাট না হলেও প্রথমতার গৌরব অবশ্যই দাবী করতে পারে। বিশেষ করে ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধারে প্রিন্সেপের এবং মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কারে মার্শালের ভূমিকা ত চিরস্মরণীয়ই হয়েছে। সৃষ্টিমূলক লেখক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশপ হেবার, এডুইন আর্নলড, আলফ্রেড লায়াল, এডোয়ার্ড টমসন প্রমুখের নাম অনেকেই জানেন। দুজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখকের জন্ম ভারতে। কিপলিং জন্মান বোম্বাইয়ে এবং থ্যাকারে জন্মান কলকাতার আলিপুরে। টমসনের লেখা রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সংক্রান্ত বই এক সময় প্রভূত নিন্দা-প্রশংসা লাভ করলেও, মোটের ওপর প্রশংসনীয় প্রয়াস তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু ওঁদের কথা এই পর্যন্তই থাক। এবার ভারতীয় লেখকদের আলোচনায় আসি। প্রথম গণনীয় ইংরেজী কবি হলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। বহুকাল এদেশে-স্থিত-হওয়া পর্তুগীজ বংশের সন্তান ডিরোজিও নিজেকে শুধু ভারতীয় বলেই প্রচার করেন নি, এদেশে আধুনিক চিন্তাধারার প্রথম উদ্বোধক রূপেও তিনি ইতিহাসে ঠাঁই নিয়েছেন। তাছাড়া প্রথম দেশাত্মবোধক কবিতাও এদেশে তাঁরই লেখা। তাঁর কাব্যকাহিনী ফকির অব জংগিরা এককালে সুপরিচিত ছিল তরুণ সমাজে। বইটি অপরিণত

লেখনীর সৃষ্টি সন্দেহ নেই, কিন্তু এর কাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য সতীর বিষয়বস্তুর আশ্চর্য মিল দেখা যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ডিরোজিওর কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। এতে মনে হয় বাল্যে রবীন্দ্রনাথ ফকির অব জংগিরা পড়েছিলেন। প্রথম বাঙালী কবি যাঁরা ইংরেজী লিখে যশস্বী হন, তাঁরা হলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রাজনারায়ণ দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রামবাগানের দত্ত গোষ্ঠী। কাশীপ্রসাদ লেখেন দ্যা শায়ের অ্যাণ্ড আদার পোয়েমস নামে এক আখ্যান কাব্য, যা আসলে এক চারণের কাহিনী। ১৮৩০-এ প্রকাশিত এই কাব্যের শেষাংশে হিন্দু পূজা পার্বণ বিষয়ক কিছু খণ্ড কবিতাও স্থান পায়। রাজনারায়ণ লেখেন দু'খানি কাব্যকাহিনী, ওসমান এবং হেনরিক অ্যাণ্ড রসিনারা। ওসমানের গল্পাংশ আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর মতো আকর্ষক, অন্য বইখানির সন্ধান এখন আর পাওয়া যায় না। মধুসূদন সংযুক্তা ও পৃথ্বিরাজের কাহিনী কাব্যাকারে নিবদ্ধ করেছেন দ্যা ক্যাপটিভ লেডী নামক বইয়ে। এছাড়া খ্রীষ্টীয়তত্ত্ব নিয়ে তাঁর ভিসন্স অব দ্যা পাষ্ট বা অতীতের স্বপ্ন নামক একটি আধা দার্শনিক বড় কবিতা আছে, আর আছে ভারত সম্রাজ্ঞী রিজিয়া নামে এক কাব্যনাট্য। বলা বাহুল্য এই সবই স্কট ও বাইরন প্রমুখ রোমাণ্টিক ইংরেজ কবিদের ভার্সটেল বা কাব্যকাহিনীর অনুকরণে লেখা এবং সবই কমবেশী অপরিণত রচনা।

রামবাগানের দত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে কবির সংখ্যা অনেক। হরচন্দ্র গিরীশচন্দ্র শশিচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র এবং উমেশচন্দ্র এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ভারতেতিহাসের নানা গৌরবময় ঘটনাংশ নিয়ে এঁরা যে গাথা কবিতাগুলি লেখেন, একত্রে তা দত্ত ফ্যামিলি এলবাম নামক সংগ্রহে গ্রথিত হয়। এছাড়া প্রত্যেকেরই এঁদের নিজস্ব কবিতা গ্রন্থ আছে। গিরিশচন্দ্রের লোটাস লীভস বা পদ্ম পাতা এবং শশিচন্দ্রের ভিসন্স অব সুমেরু বা সুমেরুর স্বপ্ন নামক বই একদা দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছিল। সুমেরুর স্বপ্নে হিন্দুধর্মের সঙ্গে তুলনায় খ্রীষ্টধর্মের প্রাধান্য কীর্তিত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন দত্ত ফ্যামিলি এলবাম থেকেই রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনীর অনুপ্রেরণা এসেছিল।

এই পরিবারের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন তরু দত্ত। মাত্র একুশ বছরে জীবনান্ত হয় তাঁর। কিন্তু ঐ বয়সেই একখানি ফরাসী উপন্যাস কুমারী আর্ভের্সের দিনলিপি, একখানি ইংরেজী উপন্যাস বিয়াংকা এবং দুখানি

কবিতার বই লিখে প্রসিদ্ধ হন তিনি। ফরাসী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ ফরাসী মাঠ থেকে সংগৃহীত একগুচ্ছ ফসল [এ শীফ গ্লিণ্ড ইন গ্যা ফ্রেঞ্চ ফিল্ড] এবং প্রাচীন ভারতের কাহিনী ও উপকথা [এনসেণ্ট ব্যালাডস এণ্ড লিজেণ্ডস অব ইণ্ডিয়া] নামক কবিতাগ্রন্থ ছুটিতে যে সজীব কবিকল্পনা ও সবল লেখনীর সাক্ষাৎ পাই, তা সত্যিই বিস্ময়কর। তরু দত্ত পূর্বোক্ত গোবিন্দচন্দ্রের কন্যা। এই পরিবারেরই সন্তান রমেশচন্দ্র দত্ত, যাঁর রামায়ণ ও মহাভারত সংক্ষিপ্ত ইংরেজী পদ্যানুবাদে আজও সমাদৃত।

উনিশ শতকের ইংরেজী কবিতা লেখকদের আগে পরে নাটক উপন্যাস যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের কথাও একটু বলা দরকার। প্রথম নাটক হল কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গ্যা পারসিকিউটেড বা নির্যাতিত। ১৮৩১ সালে লিখিত এই নাটকের প্রায় বিশ বছর পরে বাংলা ভাষার প্রথম নাটক কীর্তিবিলাস রচিত হয়। হিন্দু গোঁড়ামি নিয়ে বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে লিখিত এই বইয়ে নাটকোচিত গঠন পারিপাট্য হয়ত নেই, কিন্তু পর্যবেক্ষণের নৈপুণ্য যথেষ্টই আছে। প্রথম উপন্যাস হল রাজমোহনের স্ত্রী, যার লেখক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। ইণ্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই বইয়ের বেশ কিছুদিন পরে তিনি লেখেন দুর্গেশনন্দিনী। জমাট গল্প ও নিখুঁত মনঃসমীক্ষণের গুণে বইটি নজর করার মত, তাতে আর সন্দেহ নেই। পূর্বে স্বমেরুর স্বপ্ন রচয়িতা যে শশিচন্দ্রের কথা লিখেছি, তাঁর সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে লেখা শংকর উপন্যাসও এই সময়ের বই। সুলিখিত ত বটেই, তদুপরি যেদিন শিক্ষিত বাঙালী বিদ্রোহকে ধিক্কার দিয়ে রাজানুগত্য জাহির করেছিলেন, সেদিনে শশিচন্দ্র বিদ্রোহের ঔচিত্য স্বীকার করেছেন এই উপন্যাসে, এও কম লক্ষণীয় নয়।

তরু দত্ত রচিত উপন্যাস দু'খানির কথা আগেই বলেছি। আর্ভের্স তাঁর বলিষ্ঠতর রচনা, তবে বিয়াংকাতেও একটি আবেগমধুর কৈশোর প্রেমের কারুণ্য ফুটেছে, যা অনুপভোগ্য নয়। রমেশচন্দ্র লেখেন লেক অব গ্যা পামস বা তালপুকুর নামক উপন্যাস, যা আসলে তাঁর বাংলা উপন্যাস সংসার ও সমাজের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী পুনর্লিখন। ইরেজীতে পুনর্লিখিত হয়ে বইটি সংহত ও অধিকতর স্বচ্ছন্দপাঠ্য হয়েছে, এটা বাস্তবিকই লক্ষ্য করার যোগ্য। এই বইটি আর একদিক থেকেও মূল্যবান। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলে বিধবা বিবাহের ভয়াবহ পরিণতি চিত্রিত

করেছেন, রমেশচন্দ্র তখনই বিধবা বিবাহের পক্ষে অভিমত দিয়েছেন এ বইয়ে, ঐতিহাসিক দিক থেকে তাই এর গুরুত্ব কম নয়। এই সময়ের আর একখানি বিশিষ্ট উপন্যাস হল গোবিন্দ সামন্ত বা বাঙালী কৃষক জীবন। লালবিহারী দে লিখিত এই উপন্যাসে পল্লী বাংলার চাষী ও নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের যে চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে, তার অনুরূপ পর্যবেক্ষণের আন্তরিকতা ঐ সময়ের বাঙলা উপন্যাস স্বর্ণলতা ছাড়া আর কোথাও কদাচিৎ পাওয়া যায়। বাংলার লোককথা বা ফোক টেলস অব বেঙ্গল নামে লালবিহারীর আছে আর একখানি বই, যা এখনো তার উপযোগিতা হারায়নি। ভ্রমণ কাহিনীর বইও এই সময় লেখা হয়েছিল কিছু। তার মধ্যে মধুসূদনের সহপাঠী ভোলানাথ চন্দ্রের ট্রাভেলস্ অব এ হিন্দু বা জনৈক হিন্দুর পরিভ্রমণ নামক বই এবং থ্রি ইয়ারস ইন ইউরোপ বা ইউরোপে তিন বছর নামক রমেশচন্দ্রের বই এক সময় সাগ্রহে পঠিত হত। শেষোক্ত বইটি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাধন্য এবং লেখক নিজেই পরে তার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে যান।

৪.

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুর অধ্যায়ে ইংরেজীতে কবিতা লিখে যাঁরা খ্যাতিমান হন, এবার তাঁদের বিষয়ে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন। লণ্ডনে ছাত্রজীবন যাপনকালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লেখেন লিরিকস অব ইণ্ড বা ভারতীয় গীতিকবিতা নামে ক্ষুদ্র একখানি কবিতা পুস্তক। এডুইন আর্নল্ডকে উৎসর্গিত এই বইয়ে দ্য ল্যাণ্ড অব দ্য সান বা সূর্যোদয়ের দেশ নামে যে কবিতাটি আছে, তাতে মাতৃভাষায় লিখিত দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত স্বদেশী গান ধনধান্যেপুষ্পে, যেদিন সুনীল জলধি, ভারত আমার প্রভৃতির আদি সুরটি পাওয়া যায়। কৃষ্ণ টু রাধা বা রাধার প্রতি কৃষ্ণ এবং ইউনিভার্সাল প্রেয়ার বা সর্বজনের প্রার্থনা এই বইয়ের আর দুটি অপূর্ব কবিতা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কর্মময় জীবনে বাংলা সংস্কৃত হিন্দী ও ইংরাজীতে যে অল্পসংখ্যক কবিতা লেখেন, তা বীরবাণী নামক সংকলনে গ্রথিত হয়েছে। এতে দ্য কাপ বা পেয়ালা, কালী দ্য মাদার এবং দ্য সং অব দ্য সন্ন্যাসীন বা সন্ন্যাসীর গান প্রভৃতি কবিতাগুলি সারল্য ও অন্তর্মুখিতার গুণে যথাই নজর করার মত। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনও কিছুসংখ্যক ইংরেজী কবিতা লেখেন, যা তাঁর অশোকগুচ্ছ, গোলাপগুচ্ছ প্রভৃতি নামের

বাংলা কবিতা গ্রন্থগুলির শেষাংশে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তাঁর ইংরেজী কবিতা বেশীর ভাগই সনেট বা চতুর্দশপদী। দু'একটি বেশ ভাল জাতের কবিতাও আছে।

এবার বলতে হবে মনোমোহন ঘোষ ও অরবিন্দ ঘোষ এই দুই বিরাট প্রতিভাধর ভাইয়ের কথা। মনোমোহন তাঁর বাল্য কৈশোর ও যৌবনের অনেকটা অংশে ইংল্যাণ্ডে প্রবাসী ছিলেন, যার ফলে বাংলা প্রায় ভুলে গিয়ে ইংরাজীকেই আপন ভাষা করে নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর ইংরেজী কবিতায় তাই ছত্রে ছত্রে ফুটতে দেখা যায় ইংরেজের মেজাজ ও বাগভঙ্গী, যা অন্য ভারতীয় কবিদের ইংরাজী লেখায় বিরল। যৌবনে তিনি ষ্টীফেন ফিলিপস, আর্থার ক্লিপস ও লরেন্স বিনিয়নের সঙ্গে একযোগে প্রাইমাভেরা নামে একখানি কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করেন। সংস এণ্ড এলিজিস বা গান ও শোকগাথা এবং সংস অব লাভ এণ্ড ডেথ বা প্রেম ও মৃত্যুর গান তাঁর পরবর্তী কবিতা পুস্তক। শেষোক্ত বইয়ে তাঁর পত্নী বিয়োগজনিত বেদনা অপরূপ গীতিকবিতার মূর্তিতে প্রকট হয়েছে। দ্যা রাইডার অব দ্যা হোয়াইট হর্স বা সাদা ঘোড়ার সওয়ার এর একটি অতুলনীয় কবিতা। তাঁর অপ্রকাশিত রচনাবলী সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

অরবিন্দ বাল্যে সংস টু মার্টিল্লা বা মার্টিলার গান নামক কবিতা পুস্তক লেখেন। তার মধ্যে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র কবিতাদুটি খুব প্রসিদ্ধ। অহনা এবং বাজীপ্রভু তাঁর পরবর্তী বই। অহনায় বৈদিক ঋষিসুলভ প্রার্থনা ইংরেজী কবিতার পোশাকে প্রকাশমান হয়েছে। বাজীপ্রভু শিবাজী আমলের ঘটনা নিয়ে লেখা একটি বীরগাথা। কিন্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হল সাবিত্রী। অমিত্রাক্ষরে রচিত এই বৃহৎ মহাকাব্যে সাবিত্রী উপাখ্যানের রূপকে জন্মমৃত্যু ও মরণোত্তর আত্মিক মহিমার তত্ত্ব গভীর দার্শনিক অভিব্যঞ্জনা সহকারে বর্ণিত হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কোয়েষ্ট ইটার্ণাল বা চিরন্তন সন্ধান আর একখানি দার্শনিক কাব্য এবং এই বইয়ের শুচিস্নিগ্ধ কাব্য ভাষা সত্যিই লক্ষ্য করার মত। জন্মমৃত্যু ও সুখদুঃখের স্রোত পাড়ি দিয়ে মানবাত্মা চলেছে সত্যের অভিমুখে এক শাশ্বত সন্ধিৎসার তৃষ্ণা বুকে বহন করে, এই হল এ কাব্যের প্রতিপাদ্য।

কবি হিসাবে সরোজিনী নাইডু ও তাঁর অনুজ হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের খ্যাতিও সুপ্রতিষ্ঠিত। সরোজিনী গোল্ডেন থ্রেসল্ড বা সোনার দুয়োর, বার্ড

অফ টাইম বা সময় বিহঙ্গ এবং ব্রোকেন উইং বা ভাঙা ডানা, এই তিনখানি কবিতা পুস্তক লিখেছেন। তাঁর কবিতা সুরেলা, সহজপাঠ্য ও প্রধানত চিত্রধর্মী। জীবনের নৈরাশ্য, বেদনা, আর্তি বা অন্তরঙ্গ উপলব্ধিও কিছু কিছু ভাষা পেয়েছে সর্বশেষ বইটিতে। করমণ্ডল উপকূলের জেলেরা, গুল মোহরের প্রশংসায়, ঘুম পাড়ানি, রানীর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর কয়েকটি সুপ্রশংসিত কবিতা। হারীন্দ্র যথার্থ জীবন বেদনার কবি এবং তাঁর মুকুল দে-চিত্রিত সচিত্র কবিতা গ্রন্থ দ্যা পিলগ্রিম বা যাত্রী সত্যিই অসাধারণ বই। দুর্যোগের দিনে সব জিনিসই আক্রা, সস্তা শুধু মানুষের জীবন...এই চমকপ্রদ কথাটি বলেছেন তিনি আলোচ্য বইয়ের একটি কবিতায়। সাহেদ সুরাবর্দীর দ্যা উইনড্যো বা জানালা, দিলীপকুমার রায়ের হার্ক হিজ ফ্লুট বা শোন তাঁর বাঁশী ইদানীন্তন ইংরেজী কবিতার সংকলন হিসাবে গণনীয়।

আর একজন কবি হলেন রবি দত্ত, যাঁর একোজ ফ্রম ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট বা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রতিধ্বনি বিশ্বের প্রায় সমস্ত সভ্য জাতির সাহিত্য থেকে নির্বাচিত কবিতার মূলানুগ অনুবাদ সংগ্রহ রূপে একদা খুবই খ্যাত ছিল। তাঁর শকুন্তলার অনুবাদও বিস্ময়কর। মূল কবিতার সংখ্যাও তাঁর কম নয়। অন্যান্যদের মধ্যে লতিকা ঘোষ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবীরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। রাইটাস ওয়ার্কশপের অধ্যক্ষ পি লাল এবং প্রীতীশ নন্দীর নামও উল্লেখযোগ্য। লতিকা ঘোষ মনোমোহন ঘোষের কন্যা এবং বাঙালীর ইংরেজী কবিতা সম্বন্ধে একখানি সুখপাঠ্য গদ্য বইও আছে তাঁর। ভারতের অপরাপর রাজ্যের কবিদের মধ্যে কমলা দাস নিসিম এজেকিয়েল প্রমুখের নাম অবশ্যই করতে হবে। নিসিম পোয়েট্রি নামক একটি সাহিত্যের পত্রিকা সম্পাদন করে যশস্বী, নিজেও তিনি সুলেখক।

কিন্তু কবিতার চেয়ে আধুনিক ভারতের ইংরেজী লিখিয়েরা বেশী খ্যাত হয়েছেন কথাসাহিত্য রচনা করে। মুলুকরাজ আনন্দ, আর. কে. নারায়ণ, রাজা রাও, কমলা মার্কণ্ডেয়, নয়নতারা স্তেহগল, খুশবন্ত সিং, কে. এ. আব্বাস নানাজনের নাম করা যেতে পারে, যাঁদের বইপত্র শুধু বিদেশে সম্মানিত হয়নি, ভারতীয় সাহিত্যের যে বিপুল ঐশ্বর্য বিভিন্ন রাজ্যের মাতৃভাষার ভাণ্ডারে আবদ্ধ, তার বার্তা না জানার বিপাকে এঁদেরই ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিনিধি স্থানীয় বলেও গণ্য করা হয়েছে বহু দেশে। এঁরা সুলেখক সন্দেহ নেই। ভারতের জীবন, মনন ও ভারতবাসীর সংকট সমস্যা ও আশা আকাঙ্ক্ষার

স্বরূপ বৃহত্তর পৃথিবীতে উন্মুক্ত করে ধরার জন্যে এঁরা সাধুবাদেরও পাত্র ঠিকই। কিন্তু বাংলা হিন্দী মারাঠী গুজরাটী ওড়িয়াতে অথবা তামিল তেলুগু মালয়ালীতে শ্রেষ্ঠতর সাহিত্যগুণের অধিকারী ঢের উপন্যাস লেখা হয়েছে, যার কথা বাইরের পৃথিবীতে পৌছায়নি।

মুলুকরাজ আনন্দের কুলি এবং টু লীভস এণ্ড এ বাড বা দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি বিখ্যাত রচনা। ভারতীয় কারখানা মজুরের জীবন নিয়ে প্রথম বইটি এবং চা বাগানের মজুর নিয়ে দ্বিতীয় বইটি লেখা। গল্পের গাঁথুনি এবং অবনমিত মানুষের প্রতি সহানুভূতি আনন্দের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। নানা ভাষায় অনুবাদ হয়ে তাঁর বইগুলি পৃথিবীর সর্বত্র প্রসংসিত হয়েছে। নারায়ণের সবচেয়ে জনপ্রিয় বই হল ম্যানইটার অব মালাগুডী বা মালাগুডীর মানুষ-খেকো। এছাড়া মিঃ সম্পত এবং ডার্ক রুম বা অন্ধকার ঘর বইও তাঁর সুপরিচিত। আরণ্যক জীবনের অভিজ্ঞতা এবং কৌতুকরস তাঁর লেখার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কমলা মার্কণ্ডেয় খ্যাতিলাভ করেন নেকটার ইন এ সীভ বা চালুনিতে অমৃত এবং সাইলেনস অব ডিজায়ার বা আকাঙ্ক্ষার নীরবতা বই লিখে। মননভঙ্গীর আন্তরিকতায় তাঁর উপন্যাসগুলি সত্যিই সুখপাঠ্য, যদিও গঠন পরিপাট্যে সব সময় সার্থক মনে হয় না। খুশবন্তের বিখ্যাত বই হল এ ট্রেন টু পাকিস্তান বা পাকিস্তানমুখো রেলগাড়ী। এঁদের দলভুক্ত হলেন ভবানী ভট্টাচার্য, যাঁর সো মেনী হাঙ্গারস বা এত ক্ষুধা বইয়ে ইতিহাস প্রসিদ্ধ পঞ্চাশের মন্বন্তর ও তার ভয়াবহ পরিণাম চিত্রিত হয়েছে। সুধীন্দ্র নাথ ঘোষের ভার্মিলিয়ন বোট [সিঁদূরে নৌকা] এবং অ্যাণ্ড দ্য গ্যাজেলস আর লীপিং [আর হরিণগুলো লাফাচ্ছে] খুবই উল্লেখযোগ্য বই। এঁদের লেখা সরল, সুচিন্তিত, যদিও একটু সাংবাদিকতাগন্ধী। এঁরা যেমন সবাই ইংল্যাণ্ড-বাসী ভারতীয় স্যাহিত্যিক, তেমনি আমেরিকাবাসী সাহিত্যিক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ও একদা বিশেষ যশস্বী ছিলেন। ট্যুইলাইট বা গোধূলি নামক কবিতা পুস্তক এবং গ্যে নেক [চিত্রগ্রীব] ও চীফ অব দ্য হার্ড [যুথপতি] নামক কিশোর উপন্যাস লিখে প্রসিদ্ধ হন তিনি। এককালের স্বনামধন্য সন্ত্রাসবাদী যাদুগোপাল তাঁর ভ্রাতা। তাঁর কথা নিয়ে লেখেন মাই ব্রাদার্স ফেস বা আমার ভাইয়ের মুখ। জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা বিভাগে সারা ভারতে ইংরেজী লেখকের সংখ্যা অগণ্য। শুধু বাংলায় যাঁরা উঠেছেন, তাঁদের মধ্যে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় [ভারতীয় নৌবিস্তার ইতিহাস], রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

[হিন্দুদের রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাস], বিনয়কুমার সরকার [সমাজের ছাঁচরূপে গ্রাম ও নগর], কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য [স্বাধীনতারূপী আমি], মহেন্দ্রনাথ সরকার [পূর্ব দিগন্তের আলো], সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় [বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ], সুশীলকুমার দে [উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য], রমেশচন্দ্র মজুমদার [দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার হিন্দু উপনিবেশ], সুরেন্দ্রনাথ সেন [১৮৫৭-র বিদ্রোহ] প্রমুখের এবং তাঁদের প্রধান রচনার নাম ছাড়া আর কিছু বলারই সুযোগ আপাতত নেই। বলাবাহুল্য বিদ্যাবৈদগ্ধ্যপূর্ণ হলেও এসব বই বেশীর ভাগই পাঠ্য পুস্তকের এলাকাভুক্ত।

সাহিত্যধর্মী রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল হুমায়ুন কবীরের পোয়েট্রি মোনাডস এণ্ড সোসাইটি বা কবিতা ভাবপ্রতীক ও সমাজ এবং বুদ্ধদেব বসুর অ্যান একার অব গ্রীন গ্রাস বা সবুজ ঘাসের একফালি জমি। দুটিই ঝরঝরে সুন্দর ভাষায় লেখা। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর অপরিচিত ভারতবাসীর আত্মজীবনী [অটোবায়োগ্রাফী অব অ্যান আননোন ইণ্ডিয়ান] ও যাদুকরীর মহাদেশ [দ্য কন্টিনেন্ট অব সার্সি] এবং ষষ্ঠীব্রতের মাই গড ডায়েড ইয়ং [আমার ঈশ্বর তরুণ বয়সেই মারা যান] চমকপ্রদ লেখা, যদিও আগাগোড়াই তৃপ্তিপ্রদ নয়। নীরদ চৌধুরী ও ষষ্ঠীব্রত সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের চোখ নিয়ে দেখেছেন ভারত ও ভারতবাসীকে। স্বজাতিনিষ্ঠ ভারতবাসী তাই তাঁদের লেখার অনুরাগী নন। আরোও অনেক লেখা ও লেখকের কথা বলা যেত, কিন্তু এখানেই থামতে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী রচনা সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু বলা হল না, কারণ তাঁর বেশীর ভাগই বাংলা থেকে অনুবাদ। তবে গীতাঞ্জলি [সং অফারিংস] নামে নির্বাচিত বাংলা কবিতা ও গানের গদ্যানুবাদ লিখে তিনি নোবেল পুরস্কার পান [১৯১৩], একথা মনে রাখতে হবে। আর তাঁর একমাত্র মূল ইংরেজী লেখা হল ন্যাশনালিজিম নামক প্রবন্ধ পুস্তকখানি, আর দ্যা চাইল্ড নামক কবিতার বইখানি।

উনিশ ॥ আফ্রিকার সাহিত্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যে কটি রাজনীতিক গুরুত্ব সম্পন্ন ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে স্বাধীন আফ্রিকার আবির্ভাবই বোধ হয় সবচেয়ে বড়। এই সময় সীমায় এশিয়া থেকে ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজ ও পর্তুগীজের সাম্রাজ্যিক কারবার গুটিয়ে পলায়ন এবং চীনে সাম্যবাদী শাসনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় খুব তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু বিশ্বের মানচিত্রে আফ্রিকার দ্যুতিময় প্রকাশকে কেন অগ্রাধিকার দিচ্ছি, তার অবশ্যই যুক্তি আছে। এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ কবলিত দেশগুলো রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার মধ্যেও তাদের জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধ্যান ধারণার ঐশ্বর্য পৃথিবীর সামনে মেলে ধরতে পেরেছিল এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বিশ্বজনমতের সমর্থন অর্জন করতে পেরেছিল। চীন দুর্নীতিপরায়ণ কুয়োমিণ্টাং গোষ্ঠীর অযোগ্যতায় বিদেশী শোষণের সদর ঘাঁটি হয়ে উঠলেও, তারও সমুজ্জ্বল একটি ভাববিম্ব ছিল, যাকে সারা পৃথিবী সম্মান করত।

কিন্তু আফ্রিকা? জগতে তার পরিচিতিই ছিল অন্ধকার মহাদেশ নামে এবং ইউরোপীয় পর্যটকদের ভ্রমণ বিবরণে ও ট্রেডার হর্ন, আইভরি হাণ্টারস, কিং সলোমন'স মাইনস প্রভৃতি ছায়াচিত্রের মাধ্যমে সেই অন্ধকার রূপটাই তুলে ধরা হত তার। সুকৌশলে বোঝান হত যে গোরিলা হাতী হিপো গণ্ডার ও সিংহ জাতীয় হিংস্র জন্তুরা শুধু তার জঙ্গলেই কিলবিল করেনা, মাসাই হটেনটট বাণ্টু বুশম্যান শ্রেণীর যে মানুষরা লোকালয়ে বসতি করেন, তাঁরাও সমান অসভ্য, অজ্ঞান ও হিংস্র, প্রায় জন্তুরই শ্রেণীভুক্ত। তাঁরা বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে হয় জলে ফেলে দেন, নয় বনে বাঘ সিংহের মুখে ছেড়ে আসেন। বিদেশীদের বাগে পেলে তাঁদের ভীষণাকৃতি রাক্ষস দেবতাদের তৃপ্ত্যর্থে তেকাঠায় বেঁধে আগুনে ঝলসান এবং দল বেঁধে ঢাকঢোল বাজিয়ে সেই মাংস খান। তাঁদের না আছে সাহিত্য, কলা, কৃষ্টি, না আছে কোন সামাজিক আচার সংস্কার। যদৃচ্ছ আহার ও যৌন তৃপ্তিই তাঁদের জীবনের প্রধান কাজ। তার বাইরে আছে শিকার, আছে গোষ্ঠীযুদ্ধ এবং হাতীর চামড়ায় তৈরী বিরাট বিরাট জগঝম্প বাজিয়ে নৃত্যগীত। সারা গায়ে খড়ি মাখিয়ে এবং মুখে

রকমারি বন্য জন্তুর মুখোস পরে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সামনে সেই নাচের অনুষঙ্গ হল ধৃত বিদেশীদের দাহন, অথবা ভিন্ন গোষ্ঠী থেকে অপহৃত নারীদের পাইকারী হারে ধর্ষণ ও হনন।

সভ্য পৃথিবীর সামনে এই ছবি দিনের পর দিন এমনই কৌশলে মেলে ধরা হত যে কেউ তাতে অবিশ্বাসের কিছু খুঁজে পেতেন না। অথচ এই ছবি যে আগাগোড়া মিথ্যা তা আজ সমস্ত অভিজ্ঞ মানুষই বুঝতে পেরেছেন। এই আফ্রিকারই নীল নদ উপত্যকায় যেখানে পৃথিবীর অন্যতম সভ্যতার জন্ম হয়, সেই মিশর এবং তার নিকটতম প্রতিবেশী সুদান ও আবিসিনিয়ার অতীতের ইতিহাস যে গ্রীস রোম ও খ্রীষ্টীয় ইউরোপের চেয়ে ঢের প্রাচীন, একথা ভেবে দেখা হয়নি। ভেবে দেখা হয়নি যে ফিনিসিয়া ও কার্থেজ, বর্তমানের টিউনিসিয়া ও মরক্কো, উত্তর আফ্রিকার এই দুটি মুলুক সুপ্রাচীন কালেই সার্থকভাবে গ্রীকোরোমক হামলার মোকাবিলা করেছে। বাগদাদী খিলাফতের অধীনে এসে তারপর এইসব অঞ্চলকে বিরাট এক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে দেখি। খ্রীষ্টীয় ৭ম ও ৮ম শতকে গড়ে ওঠে পূর্ব আফ্রিকার মালিন্দী লামা মোম্বাসা প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সমুদ্র তীরবর্তী বাণিজ্য শহর, যার মধ্যে জাঞ্জিবারের খ্যাতি এক সময় সমাধিক ছিল। পশ্চিম আফ্রিকার ঘানা মালী ও সোঙ্গহাই সাম্রাজ্য এবং গিনি উপকূলে ও মধ্য আফ্রিকায় যথাক্রমে আশান্তি ও দাহোমি সাম্রাজ্য তৈরি হয় মধ্যযুগের শুরুতে। লক্ষণীয় যে আদি নিগ্রো সংস্কৃতির সঙ্গে কপটিক খ্রীষ্টান ও আরব সংস্কৃতির ব্যাপক মিশ্রণ হয়েছিল এসবের ফলেই। কাজেই আফ্রিকার মাটিতে কোনদিন সভ্যতার আলো প্রবেশ করেনি, জংলা আফ্রিকার মানুষও জংলী জন্তু বিশেষ, একথা শুধু মিথ্যা নয়, বদ মতলব প্রসূত। আফ্রিকায় শুধু পিরামিডই তৈরি হয় নি. শুধু নীলনদের জলধারা দীর্ঘ খালের সাহায্যে মরুময় মাটিতে অনুপ্রবিষ্ট করানোর উপায়ই আবিষ্কৃত হয়নি, মৃতদেহ সংরক্ষার জন্যে মমি তৈরি থেকে ব্রোঞ্জের লোহার কাঠের এমন সব শিল্প সামগ্রী তৈরী হয়েছে সুপ্রাচীন কালেই, যা দেখে অবাক হতে হয়। অবাক হতে হয় তার ভাস্কর্য, বয়ন ও কারুকার্য দেখে। সোয়াহিলি ভাষার গান, লোকগাথা ও প্রবাদ প্রবচনগুলি দেখেও বোঝা যায়, মস্ত একটা সভ্যতার উত্তরাধিকারই বহন করছেন এই বান্টু মাসাই হটেনটট প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষরা। আসলে সাম্রাজ্যবাদী শ্বেত জাতিগুলি উন্নত অস্ত্রবলেই পর্যুদস্ত করেছে একদিন আফ্রিকার মানুষকে এবং গোটা

মহাদেশটা নিজেরা ভাগাভাগি করে নিয়ে বাইরে তাকে চিহ্নিত করেছে মসীবর্ণে।

উত্তর আফ্রিকার টিউনিস মরক্কো ও আলজিরিয়া গেছে ফ্রান্সের কবলে। কেনিয়া, উগাণ্ডা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়া গ্রাস করেছে ইংরেজ। টাঙ্গানিকা দখল করেছে জার্মানি। বেলজিয়াম চেপে বসেছে কঙ্গোর ওপর। পর্তুগাল গিলেছে এংগোলা মোজাম্বিক। ইংরেজের সঙ্গে আপস চুক্তিতে মাদাগাস্কার নিয়েছে ফ্রান্স। অর্থাৎ বাঘের পেছনে ফেউয়ের মত একে একে ইউরোপের ছোট ছোট দেশও এসে জুটেছে এবং এইভাবে উনিশ শতকের সূচনাতেই ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে সমগ্র আফ্রিকার মাটি। যে মুল্লুকের প্রায় সবটাই সোনা হীরে বক্সাইট তুলো গজদন্ত বিচিত্র প্রাণীসম্পদে সমৃদ্ধ, যেখানে আছে কঙ্গো ও জাম্বেজীর মত বিশাল নদী, কিলিমাঞ্জারোর মত পাহাড় এবং কালাহারির মত মরুভূমি, সেখানকার মানুষ লাখে লাখে ধৃত ও জাহাজ বোঝাই হয়ে চালান গেছেন আমেরিকায় ক্রীতদাসরূপে, শ্বেত সওদাগরদের বাগিচায় খাটতে এবং সেখানকার কাঁচা মাল দুহাতে লুঠ করেই শ্বেত জাতিরা কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন, নিজেদের কল কারখানায় অজস্র ভোগ্যপণ্য বানিয়ে। কি নির্মম শোষণ ও স্বৈরাচার চলেছে দেড় শতাব্দী ধরে মানুষের ওপর, তার পরিচয় আছে জঁা সুরেত কানকে লিখিত আফ্রিকা নোয়ার অক্সিদেন্তালে অর্থাৎ পাশ্চাত্য কবলে আফ্রিকা নামক বইয়ে। তারই ইংরেজী সংক্ষিপ্তসার থেকে এই তথ্যগুলি সংগৃহীত।

সেই আফ্রিকা আজ স্বাধীন, আজ জগৎসভায় আর সকলের সঙ্গে তার কণ্ঠ সমভাবে সোচ্চার, এর মত বৃহৎ ঘটনা আর কি হতে পারে? ১৯৫২ থেকে ৬৫-র মধ্যে ছোট বড় পঁয়ত্রিশটি দেশ স্বাধীন হয়েছে আফ্রিকার। তার পরও অগ্রযাত্রা থেমে থাকেনি তার। এই স্বাধীনতার মিছিলে নূতন নূতন নাম যেমন যুক্ত হয়েছে একদিকে, অন্যদিকে তেমন চলেছে অবশিষ্ট অধিকৃত মুল্লুকগুলিতে বিদেশী শাসন উচ্ছিন্ন করে স্বশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে অক্লান্ত সংগ্রামও। অনেকেই জানেন আশাকরি যে আফ্রিকা ঐক্য সঙ্ঘের অধিবেশন ১৯৭৫-এ তাঁদের শেষ মুক্তিযুদ্ধে জাতি ধর্ম ও আদর্শ নির্বিশেষে সমস্ত পৃথিবীর সাহায্য প্রার্থনা করে যে ইস্তাহার জারি করেছিলেন, অধিকাংশ অগ্রগামী দেশই তাতে সহানুভূতি জানান ও যথাসম্ভব সহযোগিতার আশ্বাস দেন। পরবর্তী দু'বছরে আমরা লক্ষ্য করি পর্তুগীজ উপনিবেশ দুটির রাহুমুক্তি

এবং সেখানেই ধ্বসে পড়ে আফ্রিকার শেষ সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটি। সমগ্র মহাদেশের এই পরাধীনতাজনিত অন্তর্বেদনা ও সাংগ্রামিক ঐতিহ্যের আলোতে এবার তার সমাজ সংস্কার এবং ধর্মের ভিত্তিমূলক পরিচয় নিহিত যে সাহিত্যের মধ্যে, তার প্রসঙ্গ আলোচনা করব। উপকরণ বেশী নেই, বিষয়টি তাই সংক্ষেপে উপস্থাপন ছাড়া পথ নেই।

২.

পৃথিবীর সমস্ত পুরাতন জাতির মতই আফ্রিকার মানুষরাও আদিতে ছিলেন এনিমিষ্ট বা সর্বপ্রাণবাদী। তাঁরা আলো জল শস্য ও জন্মমৃত্যুর প্রতীক রূপে নানা দেব-দেবীর পূজো করতেন। যুদ্ধ ব্যাধি ভূতপ্রেত ইত্যাদিরও অনেক দেবতা বা উপদেবতা ছিল তাঁদের। সাধারণত মাটি পাথর গাছপালা ও জীবজন্তুকেই তাঁরা উপাস্য বলে গণ্য করতেন এবং পূজোর উপকরণ হিসাবে নূতন ফসল দুধ ও সদ্য নিহত পশুর রক্ত আগুনে নিক্ষেপ করতেন তাঁদের গোষ্ঠী পুরোহিতরা। পুরোহিত গোষ্ঠী এই সঙ্গেই করতেন জ্যোতিষী চিকিৎসক এবং সমাজনেতার কাজও। আদিকালের এই সরল আরাধনা পদ্ধতি পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং বিভিন্ন নৈসর্গিক দেবতার উপর এক আদি দেবতার কল্পনা জন্মগ্রহণ করতে শুরু করে, উন্নততর কোন কোন গোষ্ঠীর চিন্তায়। এই আদি দেবতার আসনে বেশীর ভাগ গোষ্ঠীতেই অধিষ্ঠিত হতে দেখা যায় সূর্যকে এবং তাঁদের মতে আকাশে ও সূর্যের একশো পুত্রকন্যা থেকেই মনুষ্য জাতির উদ্ভব। সূর্যের আর এক পত্নী বসুন্ধরা আগে সূর্যের সুহৃদই ছিলেন, পরে উভয়ের মধ্যে কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ বাধে এবং তার ফলেই তাঁর অসন্তুষ্ট পুত্র-কন্যারা ব্যাধি যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ও পাপরূপে মনুষ্য সংসারকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, এই হল জুলু মাসাই ও হটেনটটদের মধ্যে প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্ব।

লক্ষণীয় সে সুপ্রাচীনকাল থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত আফ্রিকার সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মপ্রত্যয় প্রায় অপরিবর্তিত ধারায় প্রবাহিত থাকে, যদিও ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশে ছোট বড় নানা সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও বিলয় ঘটে যায় এবং প্রত্যেক যুগই কিছু না কিছু গণনীয় ঐশ্বর্য দিয়ে যায় সংস্কৃতির ভাণ্ডারে। অবশ্য খ্রীষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতকে উত্তর আফ্রিকার আরব মুসলমানদের অভিযান শুরু হয় এবং টিউনিস মরক্কো ও আলজিরিয়ায় তাঁরা বড় বড় শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। কিন্তু আফ্রিকার গভীরে প্রথম প্রবেশ করেন ইউরোপীয়

অভিযাত্রীরা উনিশ শতকের সূচনায় এবং সেখান থেকেই যথার্থ দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ নেমে আসে তার আকাশে। কিন্তু সে যাইহোক, এসবের ফলে আফ্রিকার আদি সাংস্কৃতিক প্রত্যয় ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে বেশ কিছুটা ঐস্লামিক এবং খ্রীষ্টীয় প্রত্যয়ের সংমিশ্রণ হয় অনিবার্যভাবেই। তার সাহিত্যের ইতিহাসে এ তিনেরই প্রভাব লক্ষণীয়।

আদি আফ্রিকার ভাষাগুলি ছিল সবই মৌখিক। বর্ণমালার অভাবে ধর্মীয় বিধিবিধান ও আচার অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে সামাজিক কৃত্যাকৃত্য এবং কৃষি ও লৌকিক আমোদ প্রমোদ পর্যন্ত, সব কিছু সম্পর্কীয় প্রাচীন নির্দেশই প্রবাদ প্রবচন আকারে মুখে মুখে ফিরত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে। একই কারণে ধর্মসঙ্গীত, রণসঙ্গীত, প্রেমসঙ্গীত এবং ছড়া ও ঘুমপাড়ানি গানও শতাব্দীর পর শতাব্দী পাড়ি দিয়েছে মুখে মুখে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরাই প্রথম এই লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে মণিরত্ন আহরণ করে তা ইংরেজী ফরাসী ও পর্তুগীজ ভাষার মাধ্যমে জগতে ব্যাপ্ত করেন। মিশরী আসিরীয় জেন্দ সংস্কৃত হিব্রু চীনা প্রভৃতি ভাষাগুলি দূর অতীতেই লিপিবিদ্যার সহায়তা পেয়েছিল, তাই তাদের আদি সাহিত্য নিদর্শনগুলি বইয়ের আকারে কালের স্রোতে ভাসতে ভাসতে সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে। আফ্রিকায় আদি সাহিত্য বস্তুসম্পদে খুব ন্যূন না হলেও, কথ্যভাষার প্রাচীরে বন্দী ছিল, তাই তার পরিচয় বাইরে পৌঁছায়নি। ইউরোপীয় পর্যটক ও গবেষকরা যখন তাদের দিবালোকে উদ্‌ঘাটিত করলেন, তখন আফ্রিকা তার রাজনীতিক আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক ইজ্জতভ্রষ্ট, অন্ধকার মহাদেশ নামে অভিহিত। তাই তার কাঠ পাথর ব্রোঞ্জ লোহা ও গজদন্তে উৎকীর্ণ অসামান্য শিল্প সম্ভারগুলিও যেমন শিক্ষিত পৃথিবীর সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করেনি, তেমনি তার অতুলনীয় সঙ্গীত এবং উপকথাগুলিও উপেক্ষিত হয়েছে। কৃষি পশুপালন চিকিৎসা রোগপরিচর্যা ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাবাণীগুলিও সমুচিত গুরুত্ব লাভ করেনি। বিনা পরীক্ষাতেই ধিকৃকৃত হয়েছে তা বর্বর মানুষের অপবিশ্বাসসম্ভূত বলে। আজ কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, আফ্রিকার শিল্পসঙ্গীত এবং লোকসাহিত্য যে কোন সমুন্নত সভ্যতার সৃষ্টিকে নিজের ঔজ্জ্বল্য সৌন্দর্য ও মৌলিকতায় অনায়াসে লজ্জা দিতে পারে, কারণ এ সবের প্রাণলোকে নিহিত আছে এমন একটি বলিষ্ঠ মননশীলতার উত্তরাধিকার, যা মানব ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়ে জন্মান সম্ভবই নয়। লোকজীবনের মান যদি যথেষ্ট উন্নত না হয় এবং প্রকৃতি ও মানুষের

স্বরূপ তথা সম্পর্ক বিষয়ে যদি স্বচ্ছ ধারণা ভাসমান না থাকে সমাজ মনস্তত্ত্বে, তাহলে সত্যকার রুচি ও শ্রীসম্পন্ন শিল্পসাহিত্য তৈরী করতে পারেন না কোন যুগের মানুষই।

পাশ্চাত্যের ও এশিয়ার অগ্রগামী দেশগুলির মত আফ্রিকায় একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠেনি ইদানীংকালের আগে। তার সমাজ জীবনে রাজা সর্দার সামন্ত পুরোহিত ও বণিকদের একাধিপত্য মেনে নিয়েই সৈনিক কারিগর ও ভূমিদাস কৃষকদের দিন কাটাতে হত। শ্রুতিনির্ভর হলেও উপরতলায় কোন রকম শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই ছিল, যা নীচুতলা পর্যন্ত হয়ত পৌছত না। কিন্তু উপর নীচু সব মহলেই প্রচুর গান ছড়া ও প্রবচন রচিত হত এবং তা মুখে মুখে যুগ থেকে যুগান্তরে পাড়ি দিত। মনে করা যেতে পারে যে প্রাচীন পুরোহিতরা দেবমাহাত্ম্য ও জন্মমৃত্যুর রহস্য নিয়ে গান বাঁধতেন। সৈনিকেরা বাঁধতেন যুদ্ধবিষয়ক গান। কৃষি ও পশুপালন সংক্রান্ত গান এবং ছড়া তৈরি করতেন কৃষকেরা। ছেলে ভোলান ছড়া বানাতেন মায়েরা এবং তরুণ তরুণীরা রচনা করতেন প্রেম ও মিলন বিরহ সঙ্গীত। পোয়েটিকা আফ্রিকানা নামক সংকলনে এই বহু বিচিত্র গানের নিদর্শন গোটা আফ্রিকা থেকে সংগৃহীত এবং ইংরেজী অনুবাদে গ্রথিত হয়েছে। জুলু রণসঙ্গীত, হটেনটট প্রেমসঙ্গীত ও মাসাই অধ্যাত্মসঙ্গীতগুলি মনোযোগ সহকারে অনুধ্যান করলে, তাদের আদিম সারল্য ও শৈল্পিক কারুকর্মে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়। দেবগীতিগুলির মধ্যে হিব্রু ও বৈদিক বন্দনা গানের অনুরূপ আন্তরিকতা যেমন লক্ষণীয়, তেমনি প্রেম সঙ্গীতগুলি চীনা শিকিং গ্রন্থে সংকলিত অনেক গানের মতই মর্মস্পর্শী। কৃষি ও সামাজিক কৃত্যাকৃত্য সম্পর্কীয় রচনাগুলি অনেকটা আমাদের ডাক এবং খনার বচনের মত ভূয়োদর্শনের স্বাক্ষর বহন করে। ঘুমপাড়ানিয়া গানগুলি বা ফসল কাটা ও নৌকা বাওয়ার গানগুলি সবচেয়ে অনবদ্য। প্রথমগুলির সঙ্গে রেড ইণ্ডিয়ানদের একই জাতের গানের সাদৃশ্য দেখা যায়। শেষোক্তগুলি অনেকটা আমাদের ভাটিয়ালি গানের অনুরূপ। আধুনিক নিগ্রো স্পিরিচুয়াল গানগুলির উৎস এখানেই।

কৃষিভিত্তিক ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মন এইসব রচনার মধ্যে চমৎকার ফুটেছে। ওঁদের কাহিনী এবং উপকথার ভাণ্ডারও ঐশ্বর্যপূর্ণ। ঋগ্বেদের বিখ্যাত যমযমীর কাহিনীর মত একটি গল্প আছে, যাতে জ্যেষ্ঠ সহোদরা কর্তৃক বিপথে আকৃষ্ট অনুজ শেষ পর্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারান।

আর একটি গল্প আছে গ্রীকদের ঈডীপাস কাহিনীর সমধর্মী। ভ্রান্তিবশে অজাচারী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত পুত্র প্রকৃত তথ্য অবগত হয়ে মাতাকে হত্যা করেন এবং মা তাঁর কৃতকর্মের দণ্ড হিসাবে মরুভূমিতে কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষে পরিণত হন। হুবহু বাইবেল বর্ণিত জোসেফ ও তাঁর ভাইদের গল্পের মত একটি গল্পও আছে। এসব থেকে এই অনুমানই করা যেতে পারে যে পৃথিবীর আদি কাহিনী ও উপকথাগুলি সবই বোধহয় একটি দুটি সাধারণ উৎস থেকে জন্মেছে। নৃত্য সম্বলিত মূক অভিনয়ের সাহায্যে এইসব কাহিনীকে আফ্রিকার নানা অঞ্চলে রূপ দেওয়া হত। বোধহয় এখনো হয়।

৩.

আগেই বলেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আফ্রিকার আপন মেরুদণ্ডে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান নিশ্চিতই বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই আফ্রিকায় আধুনিকতার পদসঞ্চার লক্ষ্য করা যায়। তখনি সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীদের দ্বারা অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চলে নগর বন্দর বাণিজ্যকেন্দ্র রেলপথ কলকারখানা স্কুল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরি হতে শুরু করে এবং কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নতুন একটি শিক্ষিত শহুরে শ্রেণী গড়ে উঠতে থাকেন, যাঁরা ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও রাজনীতির পথেই আত্মোন্নতির কথা ভাবতে অভ্যস্ত হন। ইংরেজ ফরাসী ও পর্তুগীজ প্রধানত এই তিনের শাসনাধীন প্রজারূপেই তাঁরা স্ব স্ব প্রভুজাতির ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, তাঁদের চিন্তা ভাবনা ও আচার সংস্কার রপ্ত করে নেন এবং মূলত এ তিন ভাষাতেই একালীন সাহিত্য রচনায় মন দেন। এই জন্যেই আধুনিক আফ্রিকার গণনীয় সাহিত্যস্রষ্টারা সবাই এই সব পরভাষার আবরণে ঢেকে স্বকীয় রচনা প্রকাশ করেছেন। বর্ণমালার অভাব, আধুনিক কালোচিত জীবনচিন্তা প্রকাশের উপযোগী শব্দসম্ভারের অভাব, সর্বোপরি লিখিত সাহিত্যের ব্যাপারে পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যের অভাব তাঁদের মাতৃভাষা-গুলিকে সাহিত্য রচনার মাধ্যম হতে দেয় নি। দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে যা হয়েছে, তা মেনে নিতেই হবে। তবে লক্ষণীয় যে শুধু কবি সাহিত্যিকরা নন, আফ্রিকার একালীন বিশ্ববিখ্যাত চিন্তানায়ক ও শাসক যাঁরা, যেমন আলবার্ট লুথুলি, প্যাট্রিস লুমুম্বা, জোমো কেনিয়াট্টা, কোয়ামে এনক্রুমা, জুলিয়াস নীয়েরারে, সেকু তুরে, অর্থাৎ সমগ্রভাবে যাঁরা

নেগ্রিচুড বা নিগ্রো অভ্যুত্থানের অগ্রনেতা, তাঁরাও একই রকম রূপান্তরিত আফ্রিকান। বলাবাহুল্য এঁরা অনেকেই খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী ও খ্রীষ্টান নামের অধিকারী।

সাম্রাজ্যবাদের পেষণে এশিয়ায় এক ফিলিপিন ছাড়া আর কোন দেশেই কিন্তু এমন সর্বাত্মক রূপান্তর হয় নি। কোরিয়ায় একদা জাপান চেষ্টা করেছিল এই জিনিষ করতে, পারে নি। বোধহয় মাতৃভাষার অতুলনীয় ঐশ্বর্যই এশীয় জাতিগুলিকে আত্মচৈতন্য ভ্রষ্ট হতে দেয় নি। তাছাড়া ভারতবর্ষ আরব পারস্য চীন প্রভৃতি দেশে প্রতীচ্য কূটনীতি ও রাজনীতির অথবা যুদ্ধের ব্যাপারীরা যেমন এসেছেন, তেমনি এসেছেন প্রাচ্যবিদ্যাবিদ মনীষীরাও, যাঁরা প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের মৈত্রী বন্ধন গড়ে তুলেছেন জ্ঞান বিজ্ঞানের পথে। এসবের ফলেও আত্মস্থ থাকতে পেরেছেন প্রাচ্যের মানুষ। দুর্ভাগ্যের কথা যে আলবার্ট সোয়েইৎজার শ্রেণীর দু-একজন মহানুভব পশ্চিমী মানুষ ছাড়া যাঁরাই আফ্রিকায় গেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে কমবেশী সাম্রাজ্যবাদের সিপাই এবং লিভিংষ্টোন ও ষ্ট্যানলি থেকেই তাঁদের ধারা শুরু হয়, আর তা চলে বিশ শতকের প্রথম দুই তিন দশক পর্যন্ত।

কিন্তু ওকথা থাক। আফ্রিকার একালীন সাহিত্যের ওপর এবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। ইউরোপীয় ভাষা এবং খ্রীষ্টীয় জীবন দর্শন ও মূল্য-বোধের অনিবার্য সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েই এ সাহিত্যের বিচার করতে হবে, একথা অবশ্য না বললেও চলে। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের রাজ্যে সর্বাধিক অগ্রসর দেশ হল দক্ষিণ আফ্রিকা, যার সাহিত্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি অনিংরেজ দুনিয়ার ইংরেজী লেখা অধ্যায়ে। তারপরই স্থান নাইজেরিয়া, কেনিয়া, ঘানা প্রভৃতির। এই তিন দেশের লেখকরা সবাই ইংরেজী লিখেছেন। নাইজেরিয়ার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চিনুয়া একেবে ঈশ্বরের তীর নামক উপন্যাসে পরাধীন আফ্রিকাবাসীর বেদনাকে ভাষা দিয়েছেন। আর একজন ঔপন্যাসিক টি এস এলুকো তাঁর একটি মানুষ একটি স্ত্রী বইয়ে আদিম সমাজ কিভাবে যুগের আলোয় বিবর্তিত হচ্ছে তা দেখিয়েছেন। বিখ্যাত নাট্যকার দুরো লাদিপো লিখেছেন রাজা ফাঁসি দেন না নামক সংঘাতময় নাটক, যাতে ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে নতুন ভাবে ভাবার চেষ্টা হয়েছে। অধিকতর জনপ্রিয় আর একজন নাট্যকার হলেন ই কোলাওলে ওগুণসোলা। তাঁর ওরা শত্রু ছিল এবং টাকার নেশা তরল কমেডীর সুরে লেখা নাটক, কিন্তু

প্রথমটিতে জমিদার ও মহাজনের শোষক মূর্তিটি যেমন চমৎকার ফুটেছে, দ্বিতীয়টিতে তেমনি ফুটেছে ঘুষখোর সরকারী মহলের জঘন্য চেহারা। দানিয়েল ফাগুয়ানা নামক নাইজিরীয় ঔপন্যাসিক সমাদৃত তাঁর জঙ্গল ও জংলী জীবন-সংক্রান্ত বই প্রভুর অরণ্যের জন্যে। চতুর শিকারী তাঁর আর একখানি নামজাদা বই। তিনি অরুবা লোকভাষাতেই করেছেন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি। কেনিয়ার মুক্তি আন্দোলন মাউ মাউ-এর অন্যতম নায়ক মুগাগিকারু একজন শক্তিশালী সাহিত্যিকও। সূর্যোদয়ের দেশ নামক আত্মজীবনীতে তিনি তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামের কাহিনী বিবৃত করেছেন। কেনিয়ার জাতীয় কবি জন সবিটি তাঁর ওভার দ্য ফেন্স বা বেড়ার ওপর নামক কাব্যগ্রন্থেও স্বাধীনতাকেই দিয়েছেন সব কিছুর ওপর অগ্রাধিকার।

কেনিয়ার সুপরিচিত এবং অনেকের মতে সর্বপ্রধান ছোটগল্প লেখক হলেন গ্রেস ওগোটা। ইউরোপেও পৌছেছেন এই মহিলা ব্ল্যাক অর্ফিউস এবং অকিয়েমি নামক বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকাদ্বয়ের মাধ্যমে। জেমস নগুগি একাধারে ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার রূপে প্রসিদ্ধ। তাঁর ব্ল্যাক হারমিট বা কৃষ্ণাঙ্গ মুনি নাটক এবং দ্য রিভার বিটুইন বা মাঝখানের নদী উপন্যাস আধুনিক কেনিয়ার দুটি স্মরণীয় বই। প্রথমটিতে দেখান হয়েছে জীবনচিন্তায় নূতন ও পুরাতনের সংঘাত, দ্বিতীয়টিতে দাম্পত্য অসমন্বয়ের পরিণাম আঁকা হয়েছে। ঘানাতেও বিশিষ্ট সাহিত্যিক উঠেছেন অনেক। তাঁদের মধ্যে কবি উন্নুর ইউলিয়ামস পুনরাবিষ্কার নামক কাব্যগ্রন্থের জন্যে প্রসিদ্ধ। কবি ও ঔপন্যাসিক বেনিবেনগর ব্লেং ঘানার এককালীন সাহিত্যিক প্রতিনিধিরূপে প্রতীচ্যের অনেক দেশেই খ্যাতিমান। তাঁর একটি তরুণের ভাবনা নামক কবিতা পুস্তক এবং ডক্টর বেংটো একটি স্ত্রী চান নভেল সর্বত্র প্রশংসিত। শেষোক্ত বইটি কৌতুকে করুণে মেশান একটি সুন্দর রচনা। ঘানার শ্রেষ্ঠ কবি আকুয়া লালুয়া লিখেছেন কালো আফ্রিকার কবিতা। ভয়েস অব ঘানায় আর একজন নূতন ঔপন্যাসিকের দেখা পাই আমরা। তিনি কোয়েসিক্রু।

এককালের পর্তুগীজ উপনিবেশ এঙ্গোলা ও মোজাম্বিকে, ফরাসী অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকার দাহোমি ও ক্যামেরুনসে এবং একদা বেলজিয়াম কবলিত কঙ্গোতে স্বৈরাচারী বিদেশী শাসনের মধ্যেও বহু বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক উঠেছেন। এঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের সাহিত্য রচিত হয়েছে পর্তুগীজে, দাহোমি ক্যামেরুনস ও কঙ্গোতে তা হয়েছে ফরাসীতে। কিন্তু লক্ষ্য করার

বিষয় যে অধিকাংশ লেখকই জাতীয় মুক্তিযজ্ঞের অগ্রপুরোহিতরূপে সংগ্রাম ও স্বাধীনতার বাণী শুনিয়েছেন জাতিকে। কারাদণ্ড, এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত লাভ করেছেন বহু সাহিত্যস্রষ্টা। এঙ্গোলার প্রসিদ্ধ কবি মেরিয়ো পিণ্টা এণ্ডেড লিখেছেন অরণ্য ও সমুদ্রের মাঝখানে নামক কাব্যগ্রন্থ, যাতে একই সঙ্গে ভাষা পেয়েছে প্রকৃতিপ্রেম ও দেশপ্রেম। এঙ্গোলার জনপ্রিয় গল্প লেখক অস্কার বিরাস তাঁর টেরবা নামক গল্পের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। ইনি অন্ধ, অথচ এঁর গল্পগুলি নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও খুঁটিনাটি বিবরণের জন্যে বিস্ময়করূপে জীবন্ত। এঙ্গোলা মুক্তিযুদ্ধের নায়ক দেশ-প্রেমিক কবি অগাষ্টিনো নেটো জাতির মনোলোকে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর অমর রচনাবলীর জন্যে। মোজাম্বিকের ভালেন্তে ম্যালাংতানা একজন উদীয়মান সাহিত্যিক, যাঁর রচনা ধীরে ধীরে ইউরোপে পৌছাচ্ছে, যেমন পৌছাচ্ছে আগুইলেনাদো কোনসেকার লেখাও। কেপ ভার্দোর অধিবাসী কোনসেকাও একজন বিশিষ্ট পর্তুগীজ ভাষার লেখক।

কঙ্গোর অগ্রগণ্য কবি হলেন এণ্টনি রোজার বোলাম্বা। তিনি ফরাসীতে লেখেন শোন আমার গান নামক বই, যাতে নিপীড়িত কঙ্গোলীদের হৃদয়-বেদনা অপরূপ আন্তরিকতায় ভাষা পেয়েছে। কঙ্গোর আর একজন কবি ও নামী সাংবাদিক হলেন উতামসি তেহিকায়া। তাঁর এপিটোম বা চূড়া বহু পঠিত বই। দাহোমিতে আলম্পে ভেলিকুয়ে নামকরা কবি ও কথাসাহিত্যিক এবং ক্যামেরুনসে মঙ্গো বেটি সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক। প্রথমের অদৃশ্য শক্তি-সমূহ এবং দ্বিতীয়ের কালা অভিযান বিখ্যাত বই। ম্যালাগাসির কবি নাট্যকার ও রাষ্ট্রনায়ক জাঁ জ্যাক রাবেমেনানজারা এবং সেনেগাল সাধারণতন্ত্রের কবি প্রেসিডেণ্ট লিওপোল্ড সেংঘর ভারতবর্ষেও সুখ্যাত, তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার জন্যে। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে সোয়াহিলি ভাষাতেও কিছু কিছু সাহিত্য রচিত হয়েছে। তার মধ্যে তানজানিয়ার সাবান রবার্ট রচিত মাইসা ইয়াগু বা আমার জীবন এবং শেখ মুহিল ইদিন অল ওয়ালির দেয়া ইয়া কুয়ক্কিয়া মাইউয়া বা বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে। সাবান রচিত কুসাদিকি গালিভারের ধাঁচার একটি ভ্রমণ কাহিনী। এতে হাসির আড়ালে অনেক ভারী কথা বলা হয়েছে। মৌলানা কুপোনাও একজন বহু বিশ্রুত সোয়াহিলি কবি। তাঁর রচনা এখন ইংরেজী অনুবাদে প্রচারিত হচ্ছে।

এবার আমরা এশিয়ার সাহিত্য রাজ্যে প্রবেশ করব। কিন্তু তার আগে এশিয়ার সাংস্কৃতিক চালচিত্রটি একটু যাচিয়ে দেখতে হবে। পশ্চিমে সেমীয়, পূর্বে মুঙ্গলীয়, উত্তরে মুঙ্গল এবং তাতার ও দক্ষিণে আর্য দ্রাবিড় ·· মূল এই চতুর্বর্গ জাতিগোষ্ঠী নিয়ে এশিয়া। কিন্তু গোড়াতেই বলা দরকার যে ইউরোপীয় বলতে যেমন ধর্ম সংস্কৃতি ও আচার অভ্যাসের সুনির্দিষ্ট কতকগুলি বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন বৃহৎ একটি মানব-সংহতি বোঝায়, এশীয় বলতে তেমনটি হয় না। ইউরোপের জীবন ও মননের ক্ষেত্রে প্রথমে গ্রীকো-রোমক এবং খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার, তারপর রেনেসাঁস শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের সর্বাত্মক প্রভাবই তৈরি করেছে এই অন্তঃপ্রবাহী ঐক্যের বনিয়াদটি। ইউরোপও অবশ্য এশিয়ার মতই ছোট বড় বহুদেশের সমবায়ে গঠিত। স্যাক্সন টিউটন শ্লাভ, নানা জাতি গোষ্ঠীতে এবং রকমারি ভাষা, খাদ্যাভাস, রুচি চিন্তা ও দিনচর্যায় তাঁদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য আছে অবশ্যই। আর ভৌমিক আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাতে তাঁদের মধ্যে বার বার যুদ্ধবিগ্রহও হয়েছে ঠিকই। তবু সব কিছুকেই অতিক্রম করে এই অন্তর্নিহিত ঐক্যটি জিজ্ঞাসুর মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয়ই, এশিয়া আফ্রিকার ক্ষেত্রে যা হয় না। আফ্রিকায় নেগ্রিচুড বা নিগ্রো একাত্মতা আন্দোলনের মাধ্যমে ইদানীন্তনকালে এই ঐক্যে পৌছানর একটি প্রয়াস হচ্ছে। এশিয়ায় সে চেষ্টাও নেই। দ্রাবিড় আর্য মুঙ্গল সারাসেন তাতার, বিচিত্র নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা ধরে তার ছোটবড় বলয়গুলি গড়ে উঠেছে আত্মস্বতন্ত্র পথে। পরস্পরের মধ্যে আনাগোনা ও আদান প্রদান অবশ্যই হয়েছে। একে অন্যকে কম বেশী প্রভাবিতও করেছে।

কিন্তু এই সমস্ত কিছু সত্বেও সর্বেশিয়ার ওপর মাত্র একটি ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক একাত্মতা রাষ্ট্রীয় সমর্থনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বৌদ্ধেরা দূরপ্রাচ্যে ব্যাপ্ত হয়েছেন। ইসলাম একদিকে ইন্দোনেশিয়া অন্যদিকে উত্তর আফ্রিকার বার্বারি পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু দু'চারটি ছাড়া কোন বলয়েরই সার্বিক রূপান্তর ঘটাতে পারেনি এই শক্তিশালী ভাববিপ্লব দুটিও। জিমারম্যান

বলেছেন এই কথা, তাঁর এশিয়ার মুখ নামক বইয়ে। কথাটি সত্যিই ভেবে দেখার মত। সত্যিই একজন ইংরেজের সঙ্গে একজন ফরাসীর এবং একজন ফরাসীর সঙ্গে একজন জার্মান বা ইতালীয়ানের গরমিল যতটুকু, মিল তার চেয়ে অনেক বেশী। পক্ষান্তরে একজন ভারতবাসীর সঙ্গে একজন চীনার বা একজন জাপানীর সঙ্গে একজন আরবীয়ের পার্থক্য প্রায় আপাদমস্তক বলা যেতে পারে। এই রকমই আকাশপাতাল পার্থক্য দেখা যায় অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও। এর কারণ ইউরোপীয় জাতি গোষ্ঠীগুলি যে সাংস্কৃতিক মহাবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, তার একটি বা প্রায় একটি একাত্মিক ধরন গড়ে উঠেছে বহুশত বৎসরের সংঘাত সংমিশ্রণ ও সমন্বয় থেকে। এই সংঘাত ও সংমিশ্রণ এশিয়াতেও হয়েছে, কিন্তু সমন্বয় যে জন্যেই হোক হয় নি।

গ্রীকরা তাঁদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতা নিয়ে ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্রীক উৎস থেকে প্রাণরস আহরণ করে রোমানরা পশ্চিম এশিয়ার অনেকটা এবং প্রায় গোটা ইউরোপকে আত্মস্থ করেছিলেন। সেই তৈরি কাঠামোর ওপরই উঠেছে খ্রীষ্টীয় সভ্যতার ইমারত। তারপর ছোট বড় নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব হলে, ক্রমে তার সূত্র ধরেই যখন থেকে আজকের ইউরোপীয় দেশগুলির আবির্ভাব হয়েছে, তার একটু আগে থেকেই ইউরোপীয় জীবন ও মননের মূল ভিত্তিটা পোক্ত হয়ে গেছে। প্রতীচ্যে ঐশ্লামিক সম্প্রসারের বিরুদ্ধে জেরুজালেমে যীশুর কবর রক্ষার অজুহাতে খ্রীষ্টানদের সম্মিলিত ক্রুজেড প্রথম এই সংহতিতে শক্তি সঞ্চার করেছে। তারপর তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনাকে সঞ্জীবিত করেছে রেনেসাঁসের অনুপ্রেরণা, যা নিখিল ইউরোপের মানসিক মানচিত্রে একত্ব এনেছে। এশিয়ায় কোনদিন এরকম কোন সর্বাত্মক মহাপ্লাবন আসেনি ভাব ও কর্মের পথে। হুন শক মুঙ্গল তুর্কী তাতার পাথতুন—অনেক জাতিই এশিয়ায় ইতস্তত অধিকার বিস্তার করেছেন। কিন্তু ভৌমিক ও প্রাশাসনিক কর্তৃত্ব যতটা স্থাপন করতে পেরেছেন তাঁরা, জীবন মনন ও কলাকৃষ্টিকে সেই অনুপাতে প্রভাবিত করতে পারেন নি।

তা অনেকটাই পেরেছেন হয়ত বৌদ্ধেরা। কিন্তু তাঁরা আবার ধর্মীয় অভিযানের সাফল্যেই বেশী সন্তুষ্ট থেকেছেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকারের বা সাংস্কৃতিক সমীকরণের দিকে ততটা মনোযোগ দেননি। ফলে পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূভাগ ধর্মে বৌদ্ধ হয়েও, কর্ম ও মননের ক্ষেত্রে একাত্মতা লাভ করেনি।

ইসলামের ধর্মান্তরণ নীতির প্রভাবে পশ্চিম এশিয়ার অনেকটাই অবশ্য সংহত হয়েছে এবং আলগা ভাবে হলেও এক খিলাফতীর অধীনতায় এসেছে। কিন্তু খ্রীষ্টান ও ইহুদীর প্রবল প্রতিরোধের মোকাবিলা করতে হয়েছে তাকে পদে পদে। তাছাড়া পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় তার প্রভাব কোনদিনই নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে যায়নি। অর্থাৎ যে অর্থে ইউরোপ তার সংস্কৃতি ও জীবনচর্যায় একত্ব অর্জন করেছে, এশিয়া কোনদিনই তা করেনি সে অর্থে। বরং খ্রীষ্টীয় ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে এশিয়ার বিভিন্ন মুল্লুকে ছোট বড় ইউরোপীয় রাষ্ট্রের উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য তৈরি হওয়ায় এই একত্বের সুযোগ বা সম্ভাবনা আরো পিছু হঠেই গেছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূরা ভেবেছেন এশিয়াবাসীদের পরস্পরের মধ্যে রাজনীতিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক একত্ব যদি দৃঢ় হয়, তাহলে তাঁদের সযত্ন রচিত শোষণের ঘাঁটিগুলি অনিবার্যভাবেই একদিন ধ্বসে পড়বে। তাই যথাসম্ভব বিরোধ ও বৈষম্যের বীজই ছড়িয়েছেন তাঁরা দিকে দিকে। সুকৌশলে বাধ্য করেছেন পরস্পরকে পরস্পরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে। উন্নত জলযান ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ইউরোপ এশিয়ায় হানা দিয়েছিল বটে, কিন্তু বন্দী এশিয়ার অন্তর্লোকে সংহতি ও সম্মিলিত প্রতিরোধের চিন্তা বা প্রয়াস না জানাই তার দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ।

অবশ্য ইউরোপীয় একাত্মতাকে পশ্চিমী পণ্ডিতরা যতখানি উঁচু মর্যাদায় চিহ্নিত করেন, মানবতার মাপকাঠিতে বিচার করলে, তার বড়ত্ব ঠিক ততটা বলে হয়ত অনেকেই স্বীকার করবেন না। সব কিছু প্রচেষ্টারই মূল্য নিরূপিত হয় মানবমঙ্গলে কোনটা কতখানি সহায়ক হয়েছে, তা ধরে। সেখানে ইউরোপ কি সত্যিই খুব শ্রেষ্ঠ? রেনেসাঁসের প্রভাবে ইউরোপে যে সৌন্দর্যদৃষ্টি ও কল্যাণবুদ্ধি জেগেছিল, অথবা অষ্টাদশ শতকে বিশ্বকোষবাদীদের অনুপ্রেরণায় নূতন যে সাম্যাশ্রিত মানবতাবাদের জন্ম হয়েছিল, তা কি সার্বভৌম কল্যাণের মধ্যে মূর্ত হয়েছে? আমরা ত দেখি শিল্পবিপ্লবের পর থেকে, অর্থাৎ যখন থেকে বাষ্প ও বিদ্যুৎ উদ্ভাবন হয়েছে এবং তা গতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে ইউরোপ পাইকারি হারে পণ্য উৎপাদনে সমর্থ হয়েছে, তখন থেকে কাঁচা মালের ঘাঁটি ও তৈরি মালের বাজার খোঁজার নামে ইউরোপের সমস্ত জাতই বেরিয়েছেন একদিকে এশিয়া আফ্রিকায় সাম্রাজ্যের সন্ধানে, অন্যদিকে লুঠের বখরা নিয়ে বাধিয়েছেন নিজেদের মধ্যে বীভৎস হানাহানি। খ্রীষ্টীয় প্রেম ধর্ম রেনেসাঁসের মানবপ্রীতি, ফরাসী বিপ্লবের লিবার্তে

ইকোয়ালেতে ফ্রেতারনেতে, সব কিছুকেই নস্যাৎ করে দু'দুটো সর্বগ্রাসী যুদ্ধে ইউরোপ রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছে পৃথিবীকে।

পক্ষান্তরে এশিয়ায় পারস্পরিক রাজনীতিক আর্থনীতিক সংহতি যেমন নেই, তেমনি পরস্পরের মধ্যে ক্ষমাহীন বৈরিতাও নেই। তাই এ রকম সার্বভৌম অগ্নিবৃষ্টি বা রক্তবন্যা কোনদিন হয়নি। চীনে জাপানে, আরবে ইজরাইলে, ভারতে পাকিস্তানে খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে, হয়ত কোন কোনটা এখনো হচ্ছে। তা হয়েছে এবং হচ্ছে অন্যান্য দেশেও। কিন্তু এশিয়া মোটের ওপর শান্তিসন্ধানী। আর বলা যেতে পারে তার আত্মিক ঐক্য নিহিত এখানেই। তাছাড়া মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলি সবই জন্মেছে এশিয়ায়। তাই তাদের পরস্পরের মধ্যে দার্শনিক অনুচিন্তায় এবং আনুষ্ঠানিক আচার সংস্কারে ঐক্যও কি পাওয়া যায় না খোঁজ করলে? হিন্দুদের সোহং আর স্ফীদের আন্‌ল হক, বৌদ্ধদের শীল ও কংফুৎসীয়দের আচার বিশুদ্ধি, তাওপন্থীদের তাও ও বৈদান্তিকদের ব্রহ্ম এবং খ্রীষ্টানদের প্রেমার্তি ও বৈষ্ণবদের রাগমার্গ নিয়ে তুলনায় আলোচনা করলে যে ঐক্যের অন্তঃপ্রবাহী ধারাটি লক্ষ্য করা যায়, তা রাজনীতিক ঐক্যের মত প্রত্যক্ষ বা সোচ্চার হয়ত নয়, কিন্তু তা মূল্যহীনও নয়।

এশিয়ার সাহিত্য বিচারে এই ঐক্যেরই সম্মুখীন হতে হবে আমাদের বার বার। বহুধর্ম সংস্কৃতি ও সভ্যতার মিলনকেন্দ্র যেহেতু এশিয়া, তাই তার সাহিত্য ভুবনের ঐশ্বর্য স্বাভাবিক কারণেই প্রচুর। দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস কলাতত্ত্ব চিকিৎসা ব্যাকরণ ও জীববিদ্যা জাতীয় প্রজ্ঞামূলক রচনাই হোক, আর মহাকাব্য খণ্ডকাব্য নাটক কাহিনী ও উপকথা জাতীয় সৃষ্টিমূলক রচনাই হোক, এশিয়াবাসী বিগত তিন হাজার বছর ধরে যা কিছু লিখেছেন, প্রাচীনতায়, প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে তার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলি যে সবই এশিয়ায় জন্মেছে, অনেকের মতে এ ঘটনা হল মানবেতিহাসের বৃহত্তম বিস্ময়। এক পশ্চিম এশিয়াতেই ইজরাইলে উঠেছে ইহুদী ধর্ম, ইরাণে অর্থাৎ পারস্যে জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম, জুডিয়ায় খ্রীষ্টধর্ম, আরবে ইসলাম ধর্ম এবং ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম। এরমধ্যে ইহুদী ধর্ম সুপ্রাচীন কালেই তার স্বভূমি থেকে উৎখাত হয়েছে এবং নিছক বাঁচার তাগিদে ইহুদীরা পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছেন। জরথুষ্ট্রীয়েরাও নিজ ভূমি থেকে উৎখাত হয়ে ভারতবর্ষে চলে এসেছেন এবং এখানেই ছোট্ট একটি গোষ্ঠীরূপে নিজেদের সংস্কৃতি ও রীতিনীতি নিয়ে এখনো টিঁকে আছেন। খ্রীষ্টধর্মও ব্যাপ্ত হয়েছে ইউরোপে এবং সেখান থেকে গেছে আমেরিকায়। শুধু ইসলাম স্বস্থানে স্বশক্তিতে বেঁচে আছে এবং সেখানে শিকড় রেখেই অন্যান্য দেশে ব্যাপ্ত হয়েছে। যাই হোক, প্রায় আড়াই বা তিন হাজার বছর আগে যে দিন কিংবদন্তীর আদিপুরুষ মুসা মিশরের বন্দীদশা থেকে বের করে নিয়ে যান ইহুদীদের, তারপর থেকেই তাঁরা গৃহহারা। মধ্যযুগের গোড়া থেকে ওঁদের আমরা দেখি ইউরোপের নানা মুল্লুকে, বিশেষত স্পেন ইতালী হল্যাণ্ড বেলজিয়াম ফ্রান্স ও জার্মানীতে, ঐসব দেশের বাসিন্দায় পরিণত হয়ে যেতে এবং স্থানীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে একতালে পা ফেলে চলতে।

একটা জিনিস এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত যে যে দেশে ও যে জাতি গোষ্ঠীর মধ্যেই থাকুন, ইহুদীরা নিজেদের ধর্ম, নিজেদের ভাষা এবং জাতীয় কৃত্যাকৃত্য ভোলেননি কোনদিন। তাঁদের পিতৃ-পিতামহের প্রতিশ্রুত ভূমিতে ফিরে যাবার স্বপ্নও তাঁরা সযত্নে লালন করেছেন পুরুষানুক্রমে। এ থেকেই উঠেছে জিওন বা ইহুদী পুনরুত্থানের আন্দোলন এবং অদৃশ্য একটি আত্মিক অনুপ্রেরণারূপে তাই বহু দেশে বিক্ষিপ্ত ইহুদী জাতিকে চিন্তার রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে বিজ্ঞানী ভেইজম্যানের দান স্মরণে রেখে বৃটেন কথা দিয়েছিল, তাঁদের আদি পিতৃভূমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সেই বিখ্যাত ব্যালফুর ঘোষণা অনুসারে ১৯৪৮-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অন্তে যখন নূতন করে

ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল, তখন দলে দলে ইহুদীরা ঘরে ফিরলেন। দু'হাজার বছর পরে স্বগৃহে পুনর্বসতি পাওয়ার এ ঘটনা যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি বিস্ময়কর যে এত দিনেও তাঁরা হিব্রু ভাষাকে সম্মানে বহন করেছেন, বিচিত্র সাহিত্য সম্পদে তাকে দিনে দিনে সমৃদ্ধ করেছেন, ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান ও ধ্যান ধারণার পূর্ণ অংশীদার হয়েও এবং তার ঐশ্বর্য ভাণ্ডারে নিজেদের অজস্র দান সংযুক্ত করেও জীবন মননের ক্ষেত্রে স্বকীয়তা ভ্রষ্ট হননি।

আরামিক ভাষা গোষ্ঠী সম্ভূত হিব্রু সংস্কৃত জেন্দ গ্রীক প্রভৃতির মতই সুপ্রাচীন ভাষা। এই ভাষার আদি সাহিত্য নিদর্শন আমরা পাই বাইবেল প্রাচীন পুঁথিতে এবং তার ভাষ্যরূপে রচিত তালমুদ গ্রন্থে। এ দুইয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা এই গ্রন্থমালার শুরুতেই আলোচনা করেছি। যদিও বাইবেল প্রাচীন পুঁথিতে গীতিকবিতা, নাটক, কাহিনী ও তত্ত্ববিচার, সর্বশ্রেণীর সাহিত্য নিদর্শনই প্রচুর পাওয়া যায় এবং তার মানও যথেষ্ট উন্নত, তবু আধুনিক অর্থে যে শ্রেণীর রচনাকে আমরা সাহিত্য বলি, তার সাক্ষাৎ হিব্রুতে পাওয়া যায় যায় খ্রীষ্টীয় ১০ম শতক থেকেই। স্যামুয়েল হানাগিদ [৯৯৩-১০৫৫], জুডা হা লেভী [১০৮০-১১৪৩] ইবন এজরা [১০৯২-১১৬৭] এবং ইবন হাসাদী [?—১২৪০], এই চারজন হলেন প্রথম আমলের গণনীয় কবি, ধর্ম প্রবক্তা ও দার্শনিক এবং চারজনই এঁরা ছিলেন স্পেনীয়। হানাগিদ আরবী কবিতার ছাঁদে তত্ত্বপ্রধান কবিতা লিখেই প্রসিদ্ধ তিনি তালমুদের টীকা লেখেন একখানি। হা লেভী প্রাচীন হিব্রুর প্রধানতম কবি। ইহুদী পুনরুত্থানের বাণী প্রচার করেন তিনি জিওনের মন্ত্র গদ্যে এছাড়া একই উদ্দেশ্যে তিনি লেখেন কুজারী নামক গদ্যগ্রন্থ এবং প্রচারক রূপে যান মিশর ও প্যালেস্টাইনে।

ইবন এজরা অর্থাৎ আব্রাহাম বেন মেইয়া হিব্রু ভাষার ব্যাকরণ লিখে প্রথম এই ভাষার একটি লৈখিক রূপ বেঁধে দেন। তাছাড়া তিনি সমগ্র বাইবেল গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। তিনিও ইতালী বৃটেন নানা জায়গায় পরিভ্রমণ করেন। কবিতাও তাঁর নগণ্য শ্রেণীর নয়। হাসাদী আরবী লোককাহিনী বালাম ও জোসেফাত নিয়ে জনপ্রিয় গাথা কাব্য বেন হা মালেক লেখেন। এঁদের পর বিখ্যাত কবি হলেন রোম নিবাসী মোজেস রিয়াতি [১৩৮৮-১৪৬০], যাঁকে বলা হয় হিব্রু ভাষার দান্তে। পোপ দ্বিতীয় পায়াসের চিকিৎসক রিয়াতি দান্তের অনুকরণেই লেখেন আত্মার জাগরণ নামক কাব্য, যাতে স্বর্গ মর্ত্য ও রসাতল ঘুরে একটি মুমুক্ষু মানবাত্মার মুক্তি সন্ধানের কাহিনী

বর্ণিত হয়েছে। মোজেস জাকুতো [১৬২৫-৯৭] প্রথম হিব্রু নাট্যকার এবং তাঁর পথহারা পান্থ নাটকে পড়েছে রেনেসাঁসের ছায়া। আমষ্টার্ডামে তিনি ছিলেন দার্শনিক স্পীনোজার সহপাঠী এবং নিজেও তিনি ছিলেন দার্শনিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন। সত্যকার আধুনিক নাট্যকার হলেন মোজেস লুজাত্তো [১৭০৭-৪৭], যিনি স্বল্পায়ু জীবনে একদিন ও চিরদিন নামক একখানি সাংকেতিক নাটক, অনেকগুলি সজীব প্রেম কবিতা এবং একখানি তত্ত্ববিচারমূলক বই লিখে খ্যাতিমান হন। নিগ্রহের দরুণ তাঁকে ইতালী ছেড়ে হল্যাণ্ডে পালাতে হয়। শুধু ইতালীতে নয়, খ্রীষ্টান ইউরোপের সর্বত্রই সংখ্যাল্প ইহুদীদের কি রকম নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হত, তার একটি স্মরণীয় নজীর আছে খোদ শেকসপীয়ারের মার্চেণ্ট অব ভেনিসে।

সাহিত্যের যে বিভাগটি নিয়ে একালে সর্বাধিক অনুশীলন হয়, সেই উপন্যাসের আবির্ভাব হিব্রুতে হয়েছে একটু দেরীতে। প্রথম ঔপন্যাসিক হলেন আব্রাহাম মাপু [১৮০৮-৬৭] যিনি ধর্মগুরু ইশায়ার সমকালীন পটভূমিতে জেগে ওঠ জিওন উপন্যাসের লিখে গোটা হিব্রু সাহিত্যেরই মোড় ঘুরিয়ে দেন। মরমিয়াবাদী মাপু থাকতেন জার্মানীতে এবং তিনি দক্ষ লাতিন পণ্ডিত ছিলেন। অধিকতর শক্তিমান ঔপন্যাসিক হলেন ইয়াকব বোরমান [১৮২৫-৯০]। দক্ষিণ রাশিয়ায় একদা প্রোগ্রোমের নামে কি ভয়াবহ ভাবে ইহুদীরা উৎখাত হয়েছিলেন, তার মর্মান্তিক কাহিনী আছে তাঁর ঘরের ঠিকানা এবং তার পরবর্তী হায় মানবতা উপন্যাসে। দুটি বইই একত্রে ইংরাজীতে অনুবাদ হয়েছে গৃহহীন নামে। প্রাবন্ধিক মোশে লিলিয়েন ব্লুম [১৮৪৩-১৯০৯] এবং গল্প লেখক জেহুদা কাৎস্নেলসন [১৮৪৭-১৯১৭] হলেন রাশিয়ার অপর দুজন প্রসিদ্ধ হিব্রু লেখক। লিলিয়ান ব্লুম রুশ পজিটিভিষ্ট দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর আত্ম-জীবনীমূলক বই মিশানাও প্রসিদ্ধ রচনা। কাৎস্নেলসন প্যালেষ্টাইন পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের বিশিষ্ট নায়ক এবং গদ্যেপদ্যে বহু বিচিত্র কাহিনী লিখে গেছেন তিনি। নাইটিংগেলের গান তাঁর নামকরা বই।

হাজাভী পত্রিকার সম্পাদক এবং বিখ্যাত হিব্রু অভিধানে সংকলক বেন ইহুদা [১৮৫৮-১৯২২] স্মরণীয় হয়েছেন জাতীয় ভাষা হিব্রুকে কথ্যভাষা রূপে প্রবর্তন ও প্রচার করে। তিনি এবং বেন এভিগদর [১৮৮৬-১৯২১] দুজনেই ছিলেন ইহুদী জাতীয় সংহতি ও জিওন আন্দোলনের পুরোধা।

শেষোক্ত জন লিথুয়ানিয়ার অধিবাসী। এঁদের সঙ্গেই উল্লেখ্য জার্মানির মিকাজোসেফ বাদিচিউস্কি [১৮৬৫-১৯২১], যিনি ছিলেন নীৎসের শিষ্য এবং ধর্মীয় জিওন আন্দোলনকে তিনিই প্রথম রাজনীতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন। তালমুদীয় ভাষায় তিনি আধুনিক ইহুদী জীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। ইয়াকব ফিকম্যান [১৮০১-১৯৪৪] আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হন তাঁর হিব্রু সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের জন্যে। ইউক্রেনের মহিলা কবি রাহেল ব্লুভষ্টাইন [১৮৯০-১৯৫২] এবং শেকসপীয়ার পুস্কিন প্রভৃতির হিব্রু অনুবাদক আব্রাহাম সোলনস্কী [১৯০০-?] পাঠকদের এককালীন প্রিয় লেখক। আর একজন সমাদৃত লেখক হলেন বাস্তবতাবাদী কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার ইৎঝাক বার্কোভিৎচ। রাশিয়ার পূর্বাঞ্চল থেকে তিনি প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রে ও সেখান থেকে প্যালেস্তাইনে যান। তাঁর বিখ্যাত বইয়ের নাম মানুষের জন্মমৃত্যু। প্রথম ধাপে লাঞ্ছনা ও অমর্যাদাসম্ভূত হীনমন্যতা এবং বেদনাবোধ তাঁর সমস্ত লেখাতেই কেমন একটা অসুস্থ আক্রোশের মূর্তিতে প্রকাশমান হত। পরের ধাপে তা কাটিয়ে উঠে তিনি সর্বমানবিক কল্যাণ-দৃষ্টির অধিকারী হন।

বাইশ ॥ আরবী সাহিত্য

সংস্কৃত চীনা গ্রীক লাতিন ও হিব্রুর মত অত প্রাচীন না হলেও, আরবীও পৃথিবীর একটি ভাষা এবং এই ভাষায় কাব্য কবিতা কাহিনী ও উপকথার ঐশ্বর্য যেমন অজস্র, তেমনি দর্শন ইতিহাস গণিত এবং চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মূল্যবান বই পুঁথিও অনেক। আর সৃষ্টি ও প্রজ্ঞামূলক সাহিত্যের ধারা আরবী ভাষায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে বিগত দেড় হাজার বছর ধরে। বলে রাখা দরকার যে ভৌগোলিক দিক থেকে যে ভূমি আজ আরব নামে পরিচিত, আরবী ভাষা ও সাহিত্য কিন্তু শুধু সেইটুকু গণ্ডীর মধ্যেই সীমিত নয়। ইরাক, সৌদী আরব, জর্ডন, সিরিয়া লেবানন ও মিশর থেকে শুরু করে আলজিরিয়া, টিউনিস ও মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিভাগ জুড়ে আরবী ভাষার ব্যাপ্তি। এই পরস্পর-সংলগ্ন সুবৃহৎ অঞ্চল সম্মিলিত আরব বলয়রূপে চিহ্নিত।

তথ্যসন্ধানী মাত্রেই জানেন খ্রীষ্টীয় ৫৭০ অব্দে হজরত মহম্মদের আবির্ভাব হয়, আর তিরোভাব হয় ৬৩২ অব্দে। এই বাষট্টি বছর হল আরবী ভাষা ও আরব সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি অনুপেক্ষণীয় ছেদবিন্দু। এর পূর্বার্ধে পাই প্রাক্ মুসলীম, প্যাগান বা নিসর্গ উপাসক আরবদের, আর পরার্ধে পাই ঐস্লামিক আরবদের সাক্ষাৎ। প্রথমার্ধে মরুচর বেদুইন ও যাযাবর মানুষরা যত্রতত্র তাঁবু ফেলে বাস করতেন। কিন্তু তাঁদের অন্তরে ছিল গভীর সৌন্দর্য বোধ, ছিল অকপট সঙ্গীতানুরাগ, আর ছিল জগৎ ও জীবনের অন্তরালবর্তী কতকগুলি অজ্ঞাত শক্তি সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা। এইসব অনুভূতিই ব্যক্ত হয়েছে তাঁদের সহজাত গান ও কবিতায়। ক্রমে যখন তাঁরা সমাজবদ্ধ হয়েছেন, অনিবার্য ভাবেই তাঁরা দেশ জাতি ও মানুষের কথা ভেবেছেন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে তখন করেছেন কবিতা রচনা। তারপর যখন ইসলামের ছত্রছায়ায় এসে তাঁরা একটি সংহত জীবন দর্শন লাভ করেছেন এবং শক্তিশালী নায়কদের প্রভাবে ঐস্লামিক সাম্রাজ্য দিকে দিকে বাহু বিস্তার করেছে, তখন যে সাহিত্য-রচনা করেছেন তাঁরা, তা স্বাভাবিক কারণেই হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের সহযাত্রী।

এই মহম্মদোত্তর সাহিত্য এবং ইসলাম অধিকৃত স্পেন বা আন্দালুসিয়ায় জন্মেছে সে সাহিত্য, তাই হল প্রাচীন আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ-সম্পদ।

নবী মহম্মদ আরবদের শুধু একটি নতুন ধর্মই দেননি, উন্নত সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসনের মাধ্যমে তিনি তাঁদের একটি সংস্কৃতিমান জাতি হিসাবেও সংগঠিত করেন। উদ্দীপ্ত করেন তাঁদের রাজনীতিক সম্প্রসারণের আদর্শেও। তাঁর জীবনান্তের পর আবুবক্কর ওসমান ওমর ও আলি, তাঁর এই চার অনুগামী পরের পর খলিফার আসন অধিকার করেন। আলির পর ওঠে বিদ্রোহের সুর। মহম্মদ শিষ্য মবিয়া এবং তাঁর পুত্র এজীদ তখন হন খলিফা। এই বংশের উমাই গোষ্ঠী বেশ কিছুদিন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকেন। তারপব আবার মহম্মদবংশীয় আব্বাস গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। দুই আমলেই আরবী সাহিত্যে কলাকৃষ্টি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হয়। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকে দুর্ধর্ষ মুঙ্গলদের অভিযান ডেকে আনে বিপর্যয় এবং আরবরা তাঁদের সংস্কৃতির সম্পদ বুকে আড়াল করে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। স্পেনের আন্দালুসিয়ায় এরপর হয় আরবী সংস্কৃতির পুনর্বিকাশ, যার উপর যবনিকাপাত হয় দুই শতাব্দী পরে ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা স্পেনে ইনকুইজিশনের নামে মুসলীম ও ইহুদী খেদান শুরু করলে। আগেই বলেছি প্রাক্-মহম্মদ ও মহম্মদোত্তর আরবী সাহিত্যে শুধু কবিতাই লেখা হয়েছে। ইমরুল কোরাইজ নজীব অল ধুবাইনী, আহশা, লাবিদ, আমীর বিন কুলখুন, তারাফা এবং আনতাবা……এই সাতজন হলেন আরবের প্রাচীনতম কবি সপ্তক, যাঁদের লেখা ওড অর্থাৎ কাসিদা মুল্লাকাত নামক কবিতাগুচ্ছ হিসাবে আজও সম্মানিত।

এঁরা শিক্ষিত নাগরিক কবি। এঁদের আগে বেদুইন যাযাবররা যে সব গান কবিতা লিখেছেন, তার মধ্যে পাই হিদা, হিজা ও রাজাজ, তিন শ্রেণীর রচনা, যা আসলে হল যথাক্রমে প্রেম কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা ও যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা। উমাই গোষ্ঠীর অভ্যুদয়কালে যে সব কবি ওঠেন, তাঁদের মধ্যে স্বয়ং মবিয়া ও এজীদ আছেন, আছেন আখতাল, ফারাজদাক, আর কাব্য গাথায় নায়করূপে প্রসিদ্ধ মজনু ও তাঁর প্রণয়িনী লায়লা। আব্বাসী আমলে আবু নুরাজ বাসাহার বিন বুর্দ অল মতানবী প্রভৃতি হলেন প্রখ্যাত কবি। লায়লার মত এই আমলেও ফদল নাম্নী এক মহিলা কবির সাক্ষাৎ মেলে। বলে রাখা দরকার যে চতুর্থ খলিফা আলি মহম্মদকন্যা ফতিমা এবং উপকথার নায়ক হারুন অল রসিদের নামেও কবিতা আছে। বেদুইন কবিতায় আমরা পাই

মুক্তমনা যাযাবর মানুষের খোলা চোখ ও সজীব অনুভূতির অভিব্যক্তি। মুল্লাকাত বিদগ্ধ মানুষের সৃষ্টি হলেও, তাও গীতিকবিতা হিসাবে যথেষ্ট প্রাণবন্ত। কিন্তু মহম্মদোত্তর কালের কবিতা বেশীর ভাগকেই দেখি অনেকটা বাঁধা ছকের অনুবর্তিতা করতে। এঁদের মধ্যে আবু নুরাজ, অলমুতানবী এই দুজন তা সত্ত্বেও মহাকবি, যাঁদের রচনায় ধ্বনিত হয়েছে মহাজীবনের বাণী। আন্দালুসীয় কবিদের মধ্যে ইবন হানি ইবন কামলজা এবং খলিফা মুতামিদের নাম সর্বাগ্রগণ্য। ইবন হানিকে বলা হয় আরবী সাহিত্যের লুক্রেশিয়াস।

কবিতা ছাড়াও আরবী সাহিত্যে অবশ্য অমূল্য ঐশ্বর্য আরো অনেক সঞ্চিত হয়েছে মধ্যযুগে। গল্প উপকথা ইতিহাস জীবনী ভ্রমণ কাহিনী দর্শন গণিত জ্যোতিষ জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু বিচিত্র বিভাগেই লেখনী চালনা করেছেন পণ্ডিতরা। তাঁরা অনেকে গ্রীক লাতিন সংস্কৃত ফরাসী স্প্যানিশ নানা ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, পর্যটনও করেছিলেন নানা মুল্লুক। মাসুদী রচিত সোলালী ময়দান বইয়ে খলিফাদের কাহিনী সংকলিত হয়েছে। ইবন খলিফা ১২১১ খ্রীঃ অব্দে লেখেন বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনান্ত নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ। ইবন খালদুনের বুক অব একজাম্পল বা দৃষ্টান্তের বই হল বিশ্ব ইতিহাসের এক বৃহৎ কোষগ্রন্থ। ইবনবতুতা ১৩০৪ খ্রীঃ অব্দে লেখেন দেশ বিদেশের বিস্ময়কর বস্তুসমূহ এবং দ্রষ্টাদের জন্যে উপহার নামক অসামান্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত যাতে ভারতের কথাও আছে। পণ্ডিত আলবিরূণী ভারতে এসে ভারততত্ত্ববিষয়ক বই তারিখ-উল-হিন্দ লেখেন ১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি। এভিসেনা [আবুসিনা] ইমাম গজ্জালী এবং আবুল ওয়ালেদ এভেরোয়েজের আত্মা-বিষয়ক নিবন্ধ মধ্যযুগীয় মানব মনীষার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে একদা সারা ইউরোপে সম্মানিত হয়েছিল। গজ্জালীর ভ্রান্তি থেকে মুক্তি ন্যায় ও তর্কশাস্ত্রের বই হিসাবে আরিষ্টটলীয় চিন্তাধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। রোজার বেকন প্রথম ও তৃতীয় জনকে দার্শনিক চিন্তায় সেকাল থেকে একালের পথে পৌছানোর অদ্বিতীয় সেতু নামে অভিহিত করেছেন।

যে আরব্য উপন্যাস আমরা আগ্রহের সঙ্গে পড়ি, তা আরবী ভাষায় সংকলিত হয় ৯০ শতকের কোন সময়। সব কাহিনীই এর আরবী উৎস থেকে ওঠেনি হয়ত। তুরানী, ফার্সী ও মুঙ্গল এমনকি ভারতীয় লোককথা থেকেও হয়ত এসেছে কিছু। কিন্তু সবটা একত্র মিলিয়ে অপূর্ব যে গল্পমালা গাঁথা হয়েছে এই এক হাজার এক রাত্রি নামক সংগ্রহে, তার তুল্য বই সত্যিই

দ্বিতীয় নেই দুনিয়ার কোন দেশে। উত্তর ইউরোপের সাগাগুলির, শার্লেমাঁ ও আর্থারের কাহিনীগুলির বা অনুরূপ গল্প সংকলনগুলির কোনটাতেই মানবিক আবেদন, হাসি কান্না ও মিলন বিরহের সুর এমন গাঢ় নিবদ্ধ বা শিল্পরুচিসম্মত মনে হয় না। আর একখানি সুপরিচিত সংকলন গ্রন্থ হল আবুল ফারাজের বুক অব সংস বা সঙ্গীত সংগ্রহ। প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকে আনুমানিক ১২০০ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত রচিত বহু বিশিষ্ট আরবী কবিতা ও গানের নির্বাচিত নিদর্শন এতে গ্রথিত হয়েছে। ইহুদীদের মহাসঙ্গীত চীনাদের শিকিং বা হিন্দুদের সদুক্তি কর্ণামৃত এই শ্রেণীর সংকলন রূপে জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ১২৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদ ধ্বংস হবার পর থেকেই আরবী সংস্কৃতির গতিবেগ স্তিমিত হতে থাকে এবং এক শতাব্দীর মধ্যেই নেমে আসে অন্ধকার যুগ, যে যবনিকা আবার নূতন করে ওঠে উনিশ শতকের সূচনায়।

২.

প্রাক-মহম্মদ ও মহম্মদোত্তর আরবী সাহিত্যের মাঝখানে জাতীয় সংস্কৃতির অবিনশ্বর কীর্তি স্তম্ভরূপে দাঁড়িয়ে আছে পবিত্র কোরাণ, যা সৃষ্টিতত্ত্ব জীবনচর্যা, নৈতিক অনুশাসন ও মানবিক কৃত্যাকৃত্য সম্পর্কীয় এক বিরাট গ্রন্থ। একই সঙ্গে তা কাব্য দর্শন ও ইতিহাস এবং বিগত দেড় হাজার বছর ধরে তা মুস্লীম অমুস্লীম নির্বিশেষে সমস্ত মানব জাতিকে জ্ঞান কর্ম ও বিবেকের পথে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু কোরাণ তার ভাষ্যরূপে প্রভু মহম্মদের মুখনিঃসৃত নির্দেশিকা গ্রন্থ হাদিস এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর সযত্নে রচিত তফসির বা ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধমালার শুরুতেই আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। তার আর পুনরুল্লেখ করব না। পূর্ব অধ্যায়ের সূত্র ধরে বলা দরকার যে ত্রয়োদশ শতকে মুঙ্গল আক্রমণের পর থেকে একটানা পাঁচ শতাধিক বৎসর আরবী সাহিত্যে গণনীয় সৃষ্টিকর্ম খুব বেশী হয় নি। ধর্মতত্ত্ব আইন চিকিৎসা ইত্যাদি সম্পর্কে বই পুঁথি অবশ্য বরাবরই লেখা হয়েছে, হয়েছে গতানুগতিক ধারায় কবিতা এবং উপকথা রচনাও। তারপর উনিশ শতকে এল সৃষ্টির জোয়ার, যাকে বলা হয় আন নাহদা অর্থাৎ রেনেসাঁস বা নব জাগৃতি।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই জাগৃতি সম্ভব হয় ইউরোপীয় সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার ফলে। নেপোলিয়ান মিশর ও ইরাণে সশস্ত্র অভিযান চালানোর পর তাঁর দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে ইংরেজরাও পশ্চিম এশিয়ার মঞ্চে

আবির্ভূত হন। এরপর থেকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও লুণ্ঠন যেমন অবাধে চলতে থাকে, তেমনি ফরাসী ও ইংরেজের রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবও সমগ্র মুস্লীম দুনিয়ার দৃষ্টি ও চিন্তায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। এই পরিবর্তনের প্রধান প্রধান পরিচয় হল সাবেকী সামন্ত শাসনের ক্রমিক অবক্ষয়, সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষণ, বিজ্ঞানেতিহাস ভিত্তিক একালীন শিক্ষা দীক্ষার প্রচলন, প্রতীচ্য ছাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় গঠন এবং পরিবেশ প্রকৃতি ও জীবন সচেতন সাহিত্য সৃষ্টি। অর্থাৎ আধুনিক ধারায় কবিতা নাটক গল্প উপন্যাস ও প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা।

নতুন কালের যে আরবী কবিতা লেখা শুরু হল, তা তাই পুরাতন হিদা হিজা বা কাসিদার ধারা না ধরে ইউরোপীয় গীতিকবিতা, সনেট ও মুক্ত ছন্দের কবিতারূপে আত্মপ্রকাশ করল। তার প্রাণলোকে ঐস্লামিক সংস্কৃতির ছোঁয়া অবশ্যই ছিল এবং আছে, কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে হয়েছে সর্বহারার কবিতা। সিরিয়ায় ওঠেন নাসিফ অল ইয়াজিজি [১৮০০-৭১], ইরাকে আল ফারুকী [১৭৮৯-১৮৬১], আল আখরাশ [১৮০৫-৭৩], মিশরে মাহমুদ আল বারুদী [১৮৩৯-১৯০৪]। নূতন কালের এই চার প্রখ্যাত কবি দিয়ে যাত্রা শুরু হল আধুনিক কবিতার। এদের সঙ্গেই উল্লেখ্য হাফিজ ইবরাহিম [১৮৭১-১৯৩২], যাঁকে বলা হয় নীলনদের কবি। বিদেশে বসবাসকারী কবিদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওঠেন আমিমুল রাইহান [১৮৭৬-১৯৪০] এবং রঁদা-শিষ্য প্রখ্যাত শিল্পী, দার্শনিক ও কবি খলিল জিব্রান [১৮৮৩-১৯৩১]। জিব্রান ইংরেজী এবং ফরাসীতেও কবিতা লিখেছেন, আবার মাতৃভাষাতেও লিখেছেন। এঁদের মধ্যে প্রকৃতির কবি হাফিজ ইবরাহিম শেলীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করেছেন তিনি এক প্রাণময় সত্তার এবং মানব জাতির জন্যে স্বপ্ন দেখেছেন উজ্জ্বল আশাদীপ্ত ভবিষ্যতের। জিব্রানের কবিতায় বিশ্ববোধের অভিব্যক্তি যেমন লক্ষণীয়, তেমনি তাঁর শব্দ চিত্র অংকণের নৈপুণ্যও নজর করার মত।

উপন্যাস সাহিত্য যাত্রা আরম্ভ করে সিরিয়ার সলিম অল বুস্তানি [১৮৪৮-৮৪] রচিত দামাস্কাসের বাগানে বেড়ান এবং এই শতাব্দীর মেয়ে নামক দুখানি বই দিয়ে। প্রথমখানি ঐতিহাসিক, দ্বিতীয়খানি সামাজিক উপন্যাস এবং দুইই উনিশ শতকী ইংরেজী উপন্যাসের অনুকারী। দাখিল উল মুদাবার [১৮৬২-১৯২৪] গোড়ার দিকের আর একজন ঔপন্যাসিক। তিনি লেখেন

হারুণ অল রসিদের কাল নামক উপন্যাস। এই দলের মধ্যে বিশিষ্টতম ঔপন্যাসিক হলেন জিরজি জায়দান [১৮৯১-১৯২৪], যিনি ঐস্লামিক মহাজনদের পুরুষানুক্রমিক ইতিবৃত্ত নিয়ে বহু খণ্ডে বিভক্ত এক বিরাট উপন্যাস লেখেন। জন গলসওয়ার্দি রচিত ফরসাইট সাগা এবং রোশার মাঁর্তা মুগা রচিত হাউস অব থিবো শ্রেণীর মহা-উপন্যাসগুলির কোন না কোনটার আদর্শ পথ দেখিয়েছে নিশ্চয় তাঁকে। এছাড়া জায়দান কাইরো থেকে বিখ্যাত আলহিলাল পত্রিকা প্রকাশ করতেন, যা আধুনিক আরবী সংস্কৃতিসেবীদের বিশিষ্ট মিলন কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বেইরুটের ইয়াকুব সারফ [১৮৫২-১৯২৭] আর একজন জনপ্রিয় লেখক, তিনি মিশর কুমারী উপন্যাস লিখে খ্যাতিমান হন। ফারা আমতুন [১৮৭৪-১৯২২] লেখেন নূতন জেরুজালেম নামক বই, যাতে ঐতিহাসিক আরব বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ছোট গল্পে খুব বড় মাপের লেখক কেউ যদিও ওঠেন নি আরব মুল্লুকে, তবু মহম্মদ তোমার [১৮৯২-১৯২১] এবং মুস্তাফা লুতফার [১৮৭৬-১৯২৪] নাম করা যেতে পারে। প্রথমের থিংস সীন বা দৃষ্ট বস্তুগুলি চমৎকার একখানি গল্প সংগ্রহ। লুতফীর এবং কবি জিব্রানের গল্প ত আন্তর্জাতিক গল্প সংকলনে সবাই পড়েছেন। নাটকে ইবরাহিম আহদাব [১৮২৬-৯১] প্রথম গণনীয় লেখক। তিনি দিগ্বিজয়ী আলেকজেণ্ডারের জীবন নিয়ে লেখেন শেক্সপীয়ারী ঢঙের ঐতিহাসিক নাটক। সামাজিক নাটক আব্দুল মালেক লেখেন অষ্টাদশ শতকী ইংরেজী কমেডীর আদর্শে। খলিল ইয়াজিজী [মৃত্যু ১৮৮৯] ঔদার্য ও বিশ্বাস নামে এক কাব্য নাট্য লেখেন, তাও শেক্সপীরীয় ট্রাজেডীর অনুকরণে লেখা। এছাড়া নজীব হাদাদ মূল শেক্সপীয়ারকেই অনুবাদের মাধ্যমে তুলে দেন আরবদের হাতে। তিনি হলেন আরব দুনিয়ার স্লেগেল স্বরূপ। লেবাননের মিখায়েল নুয়ায়েম এবং মিশরের আনতুন ইয়াকুব হলেন আর দুজন বিখ্যাত নাট্যকার এবং দুজনই লিখেছেন লঘু সুরের কমেডী, যাতে সমাজ ও সংসারের বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাতে উদ্বেল প্রতিদিনের বাস্তব রূপটি যেমন ফুটেছে, তেমনি চিরন্তন মানুষের সুখ দুঃখের রূপও সার্থকভাবেই ছায়াপাত করেছে। শেষোক্ত দুজনই, বিশেষত নুয়ায়েম মলেয়ারের অনুগামী এবং তাঁর পিতাপুত্র সত্যকার একখানি সুলিখিত নাটক। ইয়াকুবের ভিকটিম বা আক্রমণের লক্ষ্য ভাল নাটক।

গদ্য লেখকের সংখ্যাও আধুনিক আরব মণ্ডলে অজস্র। তার মধ্যে

লেবাননের আল বুস্তানি [১৮১৯-৮৩] খুবই সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত বিশ্বকোষ একদা জিজ্ঞাসুদের আশ্রয়রূপী আকরগ্রন্থ ছিল। লুই সেইকো [১৮৫৯-১৯২৮] প্রণীত আরবী সাহিত্যের ইতিহাস আর একখানি প্রসিদ্ধ বই। দেশের রাজনীতিক আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে রেখে যুগ পর্যায়ে সাহিত্যের মূল্যায়ন করা হয়েছে বলেই, বইটি অর্ধশতাব্দী পার করে আজও বকেয়া হয়ে যায় নি। সাহিত্য লক্ষণাক্রান্ত সুন্দর গদ্য রচনার নিদর্শন-রূপে জিব্রান খলিল জিব্রানের ডায়েরি একখানি অসাধারণ বই। বিপ্লবী আব্দুল রহমান অল কাওয়াকিবি [১৮৬৯-১৯০৩] নেচার অব টিরানি বা অত্যাচারের স্বরূপ নামে যে বই লেখেন এবং যা একদা রাজরোষে নিষিদ্ধ হয়েছিল, আন্তরিকতার গুণে তাও একটি অতুলনীয় রচনা। বিশ্বের সমস্ত মুক্তিকামী মানুষেরই মনের কথা ধ্বনিত হয়েছে এতে। বইটি অবশ্য পরে পাঠকসমাজে আবার মুক্তিলাভ করেছে।

হিব্রু এবং আরবীর মত ফারসী বা পারসীও পশ্চিম এশিয়ার একটি পুরাতন ভাষা। ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর আদি উৎস থেকে জন্মায় যে জেন্দ বা প্রাচীন ফারসী, তার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার গোত্র সম্বন্ধ অতি নিকট। এই ভাষার নিদর্শনই পাওয়া যায় আবেস্তায় এবং বিহিস্তানে প্রাপ্ত বাণমুখো লিপিতে উৎকীর্ণ সম্রাট দারায়ুসের শিলালিপিতে। এই ভাষা থেকেই কালে ওঠে পহলবী, আর তারই ক্রমিক রূপান্তর হল ডারি বা আধুনিক ফারসী। ইতিহাস পড়ুয়ারা জানেন, বৈদিক আর্যদেরই একটি শাখা খ্রীঃ পূঃ ৭০০ অব্দ নাগাদ ইরানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন এবং মাজদা উপাসক জরথুষ্ট্র হলেন এঁদের আদি পুরুষ। অর্থাৎ নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে ভারতীয় আর্যেরা আর এঁরা জ্ঞাতি সম্পর্কীয়। মোটের ওপর পারস্য দেশ হিসাবে যেমন প্রাচীন, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসও তেমনি প্রাচীন। তাই গ্রীস থেকে কাস্পিয়ান সাগর ও অক্সাস পর্যন্ত একদা পরিব্যাপ্ত ছিল তার সীমানা, আর খাস ইরান সহ আফগানিস্তান বালুচিস্তান ও উত্তর ভারতের বৃহৎ একাংশ তার সাংস্কৃতিক ভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। একেমেনীয় [খ্রীঃ পূঃ ৫৫৮-৩৩০], পার্থীয় [খ্রীঃ পূঃ ২৫০-খ্রীঃ অঃ ২২৬] এবং সাসানীয় [খ্রীঃ অঃ ২২৬-৬৫১] শাসকরা পরের পর শাসনতন্ত্র অধিকার করে থাকেন পারস্যের এবং বিখ্যাত দারায়ুস [খ্রীঃ পূঃ ৫২১-৪৮৬] যিনি গ্রীস আক্রমণ করেন, তিনি এই একেমেনীয় বংশ সম্ভূতই ছিলেন।

সপ্তম শতাব্দীতে পারস্যে ঐস্লামিক শাসন প্রবর্তিত হলে, মাজদা উপাসকরা দলে দলে ভারতবর্ষে চলে আসেন। ভারতীয় পারসী সম্প্রদায় হলেন তাঁদেরই সর্বশেষ ধারারক্ষক। অবশিষ্টেরা সবাই ইসলামকে স্বাগত করে নেন এবং সমগ্র পারস্যে বিশেষত উত্তর পূর্বে স্বাধীন রাজবংশরূপে সামানী গোষ্ঠী [খ্রীঃ ৮৭৪-৯৯৯] একশ পঁচিশ বৎসর প্রভুত্ব করেন। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি উদ্ভব হয় সেলজুকদের এবং ১৩ শতকে মুঙ্গলদের আক্রমণ কাল পর্যন্ত তাঁরা অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজত্ব করেন। ৯ থেকে ১৪, এই পাঁচ শতাব্দী হল

ফারসী সাহিত্যের মহা সমৃদ্ধির সময়। কাব্য কবিতা দর্শন ইতিহাস অজস্র সৃষ্টি হয় এই সময়।

দশম শতকের সূচনায় প্রথম আমরা গণনীয় দুজন কবির সাক্ষাৎ পাই। তাঁরা হলেন রুদকী এবং দাকিকী। শেষোক্ত জন প্রখ্যাত পারসিক বীর ও মহাপুরুষদের জীবন নিয়ে একখানি কাব্য কাহিনী লেখা শুরু করেছিলেন, যার সামান্য অংশই পরে খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রথমোক্তজন লেখেন বহু নীতি উপদেশ ও তত্ত্বকথা মূলক কবিতা। তারপর মহামুদ গজনীর [৯৯৮-১০৩০] আবির্ভাবকালে ওঠেন মহাকবি ফারদৌসী, যাঁর শাহনামা বা রাজবংশাবলী মহাকাব্য ফারসী ভাষার এক অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ। রোমাঞ্চকর নানা নাটকীয় কাহিনী ও চরিত্র বর্ণনায়, বিশেষত যুদ্ধ বর্ণনায় ফারদৌসী অতুলনীয় গৌরবের অধিকারী। এই কাব্য অনেকটা কালিদাসের রঘুবংশ জাতীয় বই, যাতে পুরুষানুক্রমিক ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। এর, কোন কোন কাহিনী যেমন সোহরাব ও রুস্তমের কাহিনী, বিভিন্ন দেশে কাব্য ও নাটকের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ইউসুফ ও জুলেখার প্রেম নিয়ে একখানি রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্যও আছে তাঁর। কিন্তু ফারসী ভাষার প্রকৃত ঐশ্বর্য হল তার গীতিকবিতা। কাসিদা, মসনবী, রুবাই, গজল, প্রধানত এই চার জাতের কবিতা লিখেছেন কবিরা। কাসিদা হল স্তোত্র জাতীয় কবিতা, মসনবী দুই চরণে নিবদ্ধ শ্লোকের মত, রুবাই চার চরণের কবিতা, অনেকটা জাপানী হাইকুর মত, গজল প্রেমগীতি। ১১শ থেকে ১৪শ শতকের মধ্যে বিরাট এক ঝাঁক কবির আবির্ভাব হয়, তার মধ্যে সেলজুক আমলে ১১-১২ শতকে ওঠেন আনভারী, খাকিনী, নিজামী, নাসিরী, খুশরু, ওমর খৈয়াম, সানাই আত্তার এবং রুমী। ১৩শ শতকে ওঠেন সাদী এবং ১৪ শতকে হাফিজ ও জামী। এঁরা সবাই সুফী মতাবলম্বী এবং সাকী ও সরাবের রূপকে প্রেম ভক্তি সমাশ্রিত বিচিত্র কবিতা লিখে প্রসিদ্ধ।

ওমর খৈয়ামের রুবাই ফিটজেরাল্ডের ইংরেজী অনুবাদে সমস্ত পৃথিবীতেই প্রখ্যাত। সাদীর বোস্তাঁ, গোলেস্তাঁও সর্ব-সমাদৃত রচনা। সাদী এই দলের মধ্যে সর্বাধিক প্রাজ্ঞ এবং জালালুদ্দীন রুমী ও হাফিজ সর্বাধিক মর্মগ্রাহী বলে গৃহীত হন। হাফিজের দীওয়ানকে বৈষ্ণব পদাবলী ও খ্রীষ্টীয় প্রেম সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করা হয়, আত্মিক সমধর্মিতার কারণে। কিন্তু মুঙ্গল অধিকারের ফলে ক্রমশ কাব্য-সাহিত্যের ধারা শুকিয়ে যেতে থাকে এবং বিশিষ্ট কবি ও

সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের রচয়িতারা অনেকেই ভারতে চলে আসতে থাকেন। পারস্যে এই সময় জুয়া ইনি [১২২৫-১২৮৩], রশিদ [১২৪৭-১৩১৮] প্রমুখ ইতিহাসবিদের উদ্ভব হয়। প্রথমজন লেখেন মুঙ্গল অভিজেতাদের ইতিহাস, দ্বিতীয়জনও তারিখ ই গজনী বইয়ে তুর্কী ও মুঙ্গলদের ইতিহাস বিবৃত করেন। এছাড়া ফিরোজ শা তুঘলকের ইতিহাস লেখেন কর্ণে এবং তৈমুর বংশের ইতিহাস লেখেন মীরখদ।

ভারতবর্ষে যে ফারসী লেখকরা বিভিন্ন সময়ে এসে বসবাস করেন এবং এখানেই সাহিত্য সেবা করে যশস্বী হন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে পুরাণ হলেন আমীর খসরু [১২৫৩-১৩২৫], যাঁর নাম ভারতীয় সাহিত্যের ও সঙ্গীতের ইতিহাসে অমর হয়েছে। তুঘলক আমলের মানুষ ইনি এবং আলেকজেণ্ডারের দর্পণ এঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। ফারসী সাহিত্যের অনুশীলন সবচেয়ে বেশী হয় মুঘল আমলে। খোদ বাদশাদের মধ্যে বাবর ও জাহাঙ্গীর তাঁদের আত্মজীবনী লেখেন। [বাবর অবশ্য লেখেন তুর্কী ভাষায়।] আকবর সম্বন্ধে দুখানি মূল্যবান বই লেখেন আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী ও আকবর নামা। তাঁর ভাই ফৈজী প্রসিদ্ধ কবি [মৃত্যু ১৫৯৫], নল দময়ন্তীর উপাখ্যান নিয়ে চমৎকার একখানি কাব্য-কাহিনী লেখেন তিনি। রামায়ণ মহাভারত ও উপনিষদের পূর্ণাঙ্গ ফারসী অনুবাদও হয় এই সময়।

জাহাঙ্গীর বাদশার দরবারে ছিলেন কবি তালিব, শাজাহানের দরবারে সয়েব। আর মিরজা আবদুল বেইদিল ভারতে আসেন আওরংজেবের সময়। বেইদিল ভারতে আগত কবিবৃন্দের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী এবং তাঁর সমুদ্র ও ইরফান কাব্যদ্বয় তাঁর অসাধারণ কবিত্ব তথা গভীর তত্ত্বজ্ঞানের নিদর্শন বলে বিবেচিত হয়। এই সময়ই শাজাহান পুত্র দারা শিকাহ লেখেন মজমে উল বাহেরিন বা দুই সমুদ্রের মিলন, যাতে কোরান ও উপনিষদের মধ্যে তত্ত্বগত একত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন তিনি। আওরংজেব দুহিতা জেব উন্নিসাও হাফিজের দীওয়ান অনুসরণ করে বহু অপূর্ব প্রেম কবিতা লিখেছেন। অবশ্য আগে থেকেই মুঘল হারেমে হুমায়ুন পত্নী হামিদা বেগম এবং সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কিছুটা কবিপ্রসিদ্ধি ছিল। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় ফারসী সাহিত্যেরও ঐশ্বর্য-যুগ শেষ হয়।

পারস্যে এর পর উনিশ শতকে প্রতীচ্য জাতি গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটল এবং তার অনিবার্য প্রভাবে ইরানীয় সমাজ সংস্কৃতি শিক্ষা সাহিত্য, সর্বক্ষেত্রে

দেখা দিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ১৮৫১ সালে প্রথম তেহরান থেকে, তারপর তাবরিজ ও ইস্পাহান থেকে সংবাদপত্র প্রকাশিত হল। ১৮৫২তে আধুনিক ধাঁচের কলেজ স্থাপিত হল এবং বিদেশী অধ্যাপকদের সেখানে আমন্ত্রণ করা হল। ফারসী ভাষার অভিধান সংকলিত হল, আইন কানুনের বই নূতন করে লিখিত হল এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান ভাষা থেকে বিখ্যাত বইয়ের অনুবাদ শুরু হল। অর্থাৎ নূতন এক পারস্য জন্মগ্রহণ করল ১৮৯৬ থেকে ১৯২১ এর মধ্যে। এই অধ্যায়ে যে সাহিত্য রচিত হয়, তার স্রষ্টাদের মধ্যে প্রবন্ধকার দেখুদা, ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার সাদিক হিদায়েৎ, জামাল জাদা, সমালোচক দস্তি, কবি তঘীবাহার, রাজনীতিক চিন্তাবিদ আব্বাস ইকবাল প্রসিদ্ধ। ভারতীয় কবি মহম্মদ ইকবালও এই তালিকাভুক্ত।

ফারসী সাহিত্যের আধুনিক অধ্যায় সম্বন্ধে এবারে আর দু-একটি কথা বলে প্রসঙ্গ শেষ করব। পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে পারস্যের মানুষ নব জীবনের স্পন্দনে জেগে উঠলেন, এ কথা আগেই বলেছি। এই জাগরণ শুধু সাহিত্য সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে সীমিত রইল না, জনগণ মধ্যযুগীয় সমাজ এবং রাষ্ট্র কাঠামোকেও যুগের আলোয় নূতন করে ঢেলে সাজানর দাবী তুললেন। দায়িত্বশীল সংসদীয় শাসনের দাবীতে দেখা দিল বিদ্রোহ এবং সেই সুযোগে ইংরেজ ও রাশিয়া এসে মাথা গলাল পারস্যের রাজনীতিতে। এই নানামুখী বিপর্যয়ের স্রোতে পাড়ি দিয়ে অবশেষে পারস্য যথার্থ আধুনিক কালে পৌঁছল বিশ শতকের প্রথম ধাপে এবং তার আধুনিক সাহিত্যের যাত্রারম্ভ সেখান থেকেই।

এই সূচনার অধ্যায়ে দুজন বিদ্রোহী কবির সাক্ষাৎ পাই আমরা, আরিফ এবং ইশাকী। দুজনেই এঁরা প্রচলিত রীতির বিরোধী, সে জীবনেও লিখনেও। আরিফ ছিলেন নারীমুক্তির অগ্রনায়ক। ইশাকী একদিকে প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্যের জয়গান করেন তার নওরোজ নামক বইয়ে, অন্যদিকে সর্বাত্মক সামাজিক ও রাজনীতিক স্বাধিকারের বাণী ব্যক্ত করেন কালো কাফন বইয়ে। তঘীবাহার হলেন এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর কবিতায় একদিকে যেমন ইউরোপীয় ভাবধারার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে তেমনি মেলে প্রাচীন খোরাসানী ধারার প্রতি আনুগত্যও। তাঁর গণনীয় গদ্য রচনাবলীর মধ্যে ফারদৌসী জীবনী ও শ্বেত ক্রীতদাস প্রসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের পারস্য ভ্রমণকালে রাজকবি রূপে তিনি তাঁকে স্বাগত জানান। এঁদের অল্প আগে

কনস্তান্তিনোপলে ওঠেন জৈনুল আবেদিন মারাধী, তাঁর উপন্যাস ইব্রাহিম বেগ দেশে তীব্র রাজনৈতিক চাঞ্চল্য এনেছিল। দেখুদা রচিত আল বেরুনির জীবনী এবং আবদুল রহমানের ধর্ম ও প্রত্যয়ের পক্ষে বই দুখানিও বিশেষভাবে স্মরণীয়। শেষোক্ত বইখানি প্রচণ্ড আলোড়ন জাগিয়েছিল সমাজে। বিজ্ঞানের আলোয় ধর্মের মূল্যায়ন করা হয়েছে এতে। জামাল জাদার উপন্যাস ফেরারী এবং প্রিন্স মলকম খাঁর নাটক কালের হাওয়ার অনুবাদ বিদেশে খুব প্রশংসা পেয়েছে। দস্তির শিল্পের অর্থ এবং একালের সাহিত্যচিন্তা বই ছাত্র সমাজে এখনো সাগ্রহে পঠিত হয়। হিকমৎ এবং আখতার পত্রিকা দুটির কথাও মনে রাখতে হবে।

চব্বিশ ॥ তুর্কী সাহিত্য

মুসলীম দুনিয়ার তৃতীয় বৃহৎ ভাষা হল তুর্কী এবং প্রভূত সাহিত্যের ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়েছে তাতেও। মধ্য এশিয়ার যে দুটি অঞ্চল এখন কাশগড় ও সিংকিয়াং নামে পরিচিত, সেখান থেকে পূর্ব তুর্কীস্তান পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল একদা এক প্রাচীন তাতার সাম্রাজ্য। তাই হল তুর্কীদের আদি বাসভূমি। এঁদের একটি শক্তিশালী শাখার নাম উইগার, তাঁরা কালে বৌদ্ধ হন এবং দীর্ঘদিন অক্ষুণ্ণ প্রতাপে মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য করেন। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে এঁরা যে সাহিত্য রচনা করেন, তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় এখনো, হিউ এন সাংএর জীবনী এবং রাজকুমার কল্যাণালঙ্কারের কাহিনী প্রভৃতি বইয়ে, যা উইগুর ভাষায় রচিত হয়। মুঙ্গল আক্রমণের ধাক্কায় এঁরা দূর পশ্চিমে অর্থাৎ বর্তমান তুরস্কে সরে আসতে বাধ্য হন এবং সেখানে স্থিতিলাভ করে ক্রমশ আসেন ইসলামের প্রভাবে। নিজেদের আদি তুর্কী ভাষার সঙ্গে আরবী ফারসীর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তুর্কী ভাষার আধুনিক ছাঁটটি গড়ে তোলেন তাঁরাই।

পঞ্চদশ থেকে একেবারে বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত অটোমান বা ওসমানীরা এখানে সগৌরবে দেশ শাসন করেন। একটানা চার শতাব্দী, তার মানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের [১৯১৪-১৮] সমাপ্তি ও কামাল আতাতুর্কের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত, খিলাফতী থাকে তুর্কী সুলতানের হাতে। তারপর রাজতন্ত্রের অবসান হয় এবং আসে পশ্চিমী ধাঁচের প্রজাতন্ত্র। নারীর অবরোধ মোচন, সমাজ থেকে পুরোহিত শ্রেণীর প্রভুত্ব লোপ, আরবীর বদলে রোমান হরফ প্রবর্তন এবং শিক্ষাদীক্ষায় আধুনিকতা বিধান কামালের অবিস্মরণীয় দান। তাই তাঁকে কৃতজ্ঞ দেশবাসী বলেছেন আতাতুর্ক বা তুর্কীদের পিতা।

তুর্কী সাহিত্যে প্রতিভাধর কবি সাহিত্যিকের উদ্ভব অবশ্য হয়েছে সম্রাট সুলেমানের [মৃত্যু ১৫৬৬] আমল থেকেই। প্রথম গণনীয় কবি হলেন বাকি [১৫২৬-১৬০০], তাঁর বিখ্যাত রচনা গোলাপের স্বপ্ন সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি তাঁকে বিচারপতির সম্মানিত পদ দেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওঠেন কবি নেফী, যাঁর ভাগ্যের তীর নামক ব্যঙ্গ রচনা সুলতান চতুর্থ মুরাদের মন্ত্রী

বৈরাম পাশাকে লোকচক্ষে হেয় করে। তার ফলে হয় তাঁর মৃত্যুদণ্ড। অষ্টাদশ শতকে কবি প্রাবন্ধিক ও দার্শনিক বহুজনের যেমন একে একে উদ্ভব হয়, তেমনি আস্তে আস্তে তুরস্ক ইউরোপীয় রাষ্ট্র কর্ণধারদের সলোভ দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে শুরু করে। এই যুগটাকে বলা হয় টিউলিপ যুগ। নেদিম [মৃত্যু ১৭২৭] এবং ঘালিব [মৃত্যু ১৭৯৫] এই যুগের প্রধান দুজন কবি। নেদিম সংশয়বাদী এবং দুঃখময় পৃথিবীতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মঙ্গলময়ত্ব নিয়ে মাথা ঘামান তাঁর মতে নিরর্থক। তুর্কী গদ্য সাহিত্যেরও বিশেষ খ্যাতি আছে। বাবরের আত্মজীবনীর উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। এছাড়া ওঠেন সাদেদ্দিন, নায়মা, রসিদ প্রমুখ ইতিহাসকার। ভ্রমণের বই রচয়িতা চেলেবি গদ্যলেখক হিসাবে প্রসিদ্ধ।

আধুনিক কালের সূচনায় সারা দেশ জুড়ে শুরু হয় রাজনীতিক বিক্ষোভ। এ যুগের সাহিত্যও তাই বিপ্লবধর্মী। সাবেকী মূল্যবোধ পরিহার করে নূতন পথ খোঁজার প্রয়াস চোখে পড়ে অধিকাংশ কবি ও সাহিত্যিকের সৃষ্টিতেই। উনিশ শতকের প্রারম্ভে ওঠেন বিখ্যাত সাংবাদিক সিনাসি [১৮২৬-১৮৭১] এবং জাতিকে প্রথম আধুনিকতার বার্তা শোনান তিনি। নামিক কেমাল [১৮৪০-১৮৮৮] ওঠেন এরপর। কেমাল সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী। প্যারিস থেকে লিবার্টি নামক পত্রিকায় তিনি জাগরণের বাণী শোনান জাতিকে। তারপর লেখেন ওয়াতন বা পিতৃভূমি এবং আকিফ বো নামক দুখানি নাটক ও জাগরণ নামক উপন্যাস। সমাজের নানা গ্লানি গলদ এবং উপর মহলের বিবিধ দুষ্কৃতির স্বরূপ উন্মুক্ত করে দেখান তিনি এইসব রচনায়। শেষোক্ত বইয়ে পতিতা বৃত্তির অন্ধকারে নিপতিত এক নারীর জীবন অঙ্কিত করেছেন কেমাল।

আব্দুল হক হামিদ [১৮৫২-১৯৩৪] আর একজন বিখ্যাত কূটনীতিবিদ ও সাহিত্যিক। তাঁর অসুখী নারী নাটকে পারসীয় এক গণিকার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিদেশী বধূ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে এক তুর্কী নর্তকী ও ইংরেজ ভদ্রলোকের প্রণয় ও তার দুঃখজনক পরিণাম। এছাড়া টুম্ব বা সমাধি কবিতা পুস্তকে শোক করেছেন তিনি তাঁর মৃতা পত্নীর জন্যে। বোম্বাইয়ে হামিদ যখন বাণিজ্য দূত ছিলেন, তখন তাঁর সহধর্মিণীর মৃত্যু হয়। হামিদের সঙ্গেই উল্লেখ্য বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক জিয়াগক আলপের নাম। তাঁরই মত উল্লেখ্য বিখ্যাত স্বাধীনতা যোদ্ধা ও সাহিত্যিক হালিদা এদিব

[১৮৮৩-১৯৩৬]। তিনিই প্রথম তুর্কী মহিলা, যিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারিণী হন। তাঁর স্মার্না দুহিতা এবং আগুনের কামিজ বিখ্যাত উপন্যাস। কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে রাজনীতিক বিরোধের জন্যে তিনি দেশত্যাগ করে কিছুকাল ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতে কাটান। তারপর আবার দেশে ফেরেন। তাঁর আত্মজীবনীও অতুলনীয় বই।

তুরস্কের প্রথম কম্যুনিষ্ট কবি নাজিম হিকমত [১৯০২-৬৩] ওঠেন এই এই সময়ই। মুক্তছন্দের প্রবর্তকরূপে একালীন কবিদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি, যদিও রাজনীতিক কারণে তাঁকে রাজরোষ ও নিগ্রহ বরণ করতে হয়েছে প্রচুর। দেশের দরিদ্র চাষী ও শ্রমকারী সাধারণ মানুষের দুঃখব্যথাকে ভাষা দিয়ে তিনি সারা পৃথিবীতেই খ্যাত হয়েছেন। তাঁর নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ হয়েছে ইংরেজী ও ফরাসীতে। হয়েছে বাংলাতেও। তিনি যথার্থই জনগণের কবি।

পঁচিশ। চীনা সাহিত্য

পশ্চিম এশিয়ার রঙ্গমঞ্চ থেকে এবার আমরা আসছি পূর্ব এশিয়ায়। পশ্চিম এশিয়া যেমন মূলতঃ ঐস্লামিক বলয়রূপে খ্যাত, পূর্ব এশিয়াও তেমনি খ্যাত প্রধানত মুঙ্গলীয় বলয়রূপে। চীন, জাপান, কোরিয়া, মুঙ্গলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আনাম, বর্মা, থাইল্যাণ্ড, ছোট বড় নানাদেশ ও বিচিত্র জাতি গোষ্ঠী অধ্যুষিত পূর্ব এশিয়ায় উঠেছে বিভিন্ন সময়ে তাও কংফুজীয় শিন্তো, নানা ধর্ম। অনুপ্রবেশ হয়েছে বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মের। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবন চর্যার ধারাটি পূর্ব এশিয়ার মানুষরা আজও অনেকটাই রক্ষা করে চলেছেন, আবার যুগ ও জীবনের আহ্বানে যথাযোগ্য সাড়াও দিয়েছেন তাঁরা। এঁদের মধ্যে চীন উত্তর কোরিয়া ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ আজ কম্যুনিষ্ট আদর্শ গ্রহণ করেছে। জাপান দক্ষিণ কোরিয়া ফিলিপিন ও থাইল্যাণ্ড নিয়েছে মার্কিনী ছাঁচ। আর বর্মা ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি এখনো চলেছে জাতীয়তাবাদের ছক অনুসরণ করে, যদিও কম্যুনিষ্ট আদর্শ পরিব্যাপ্তির প্রয়াস কম বেশী আছে সর্বত্রই।

এদের মধ্যে বৃহত্তম দেশ হল মহাচীন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস তার ভারতের মতই প্রাচীন ও গৌরবময়। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দ থেকে যাত্রা শুরু, তারপর একের পর এক চৌ চীন হান ও সুই বংশের উদ্ভব ও অবসান হতে হতে অবশেষে ট্যাং আমলে [৬১৮-৯০৭] এসে তার ইতিহাস এ কালের মাটি ছোঁয়। সাহিত্য শিল্প ও জ্ঞান বিজ্ঞানে তার শতমুখী ব্যাপ্তিও হতে আরম্ভ করে এই সময় থেকেই। পরবর্তী তিনশো বছরে সুং ও চারশো বছরে যথাক্রমে উয়ান ও মিং বংশের উত্থান পতনের স্রোত পাড়ি দিতে দিতেই ক্রমে আমরা স্পর্শ করি সপ্তদশ শতকের মধ্যপর্ব। তারপর ১৬৪৪ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত চলে একটানা মাঞ্চু বংশের শাসন। তার অবসান ঘটিয়ে ডাঃ সান ইয়াৎ সেন প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন চীনা সাধারণতন্ত্রের এবং ১৯৪৯-এ বিরাট গৃহযুদ্ধের পর জন্ম নেয় আজকের জনগণতন্ত্রী চীন। সুদীর্ঘ রাজতান্ত্রিক শাসনে চীনের সাধারণ মানুষ প্রচুর দুঃখ কষ্ট ভোগ করলেও তাঁদের সাংস্কৃতিক

ও সামাজিক চেতনা কিন্তু চিরদিনই উন্নত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তি যখন চীনের ওপর চড়াও হয়, তখনো চীন তার আত্মিক বল হারায় নি। আজ চীন হয়েছে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তি এই পৌরুষের বলেই।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন দেশের মত চীনের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনও গঠিত হয়েছে দুজন মহাগুরুর শিক্ষায়। এঁরা হলেন কংফুৎস এবং লাওৎজে। বুদ্ধ সমসাময়িক এই দুই মহাজন যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ চীনে আবির্ভূত হন। কংফুৎস ঈশ্বর আত্মা ও মোক্ষের তত্ত্ব প্রচার করেননি, তিনি দিয়েছেন দৃঢ়বদ্ধ নৈতিক আচরণবিধি, আর লাওৎজে দিয়েছেন তাও তত্ত্ব, যা অনেকটা আমাদের বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদেব মত। এই দুই মতবাদ আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে পরবর্তীকালে চীনের দার্শনিক প্রজ্ঞা. ঐতিহাসিক চেতনা ও সামাজিক শুভবুদ্ধি। তারপরে ভারতবর্ষ থেকে যায় বৌদ্ধ ধর্ম এবং জনগণের বৃহৎ একাংশ গ্রহণ করেন সে মতও। চীনের জীবনে এই তিন আদর্শেরই প্রতিফলন দেখা যায় এবং প্রাচীন দর্শন ও ইতিহাসের বইগুলি সবই লিখিত হয়েছে বলা বাহুল্য এই তিনের প্রভাবকে বেষ্টন করে।

কিন্তু এ আলোচনায় আমরা সেই তাত্ত্বিক রচনাবলীর উল্লেখ করব না। আমরা বলব শুধু বিশুদ্ধ সাহিত্যের কথা, যার প্রাচীনতম নিদর্শন আমরা পাই শিকিং গ্রন্থে। কংফুৎসের দ্বারা সংকলিত বলে কথিত এই গ্রন্থে অজস্র ক্ষুদ্র কবিতা ও গান স্থান পেয়েছে, যা খ্রীঃ পূঃ ৬ শতক থেকে আজ পর্যন্ত জনসমাজে মহাসমাদরে পঠিত ও গীত হয়। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে, অর্থাৎ ট্যাং আমলেই প্রথম বিকাশ হয় সার্থক জাতীয় সাহিত্যের। একে একে ওঠেন ট্যাং চিউ লিং [৬৭৩-৭৪০], ওয়াং উই [৭০১-৬১], লিপো [৭০১-৬২], তু ফু [৭১২-৭০] উই ইং উ [৭৩৫-৮৩০] এবং চ্যাংচি [৭৬৮-৮৩০] প্রমুখ মহান কবি। এঁদের মধ্যে লিপো ও তু ফু অসামান্য প্রতিভাধর। শেষোক্ত জন দার্শনিক ও জীবনবেত্তা কবি, প্রথম জন স্বপ্নমগ্ন রোমান্টিক প্রেমের কবি এবং এই দুইয়ের ধারাই দীর্ঘ হাজার বছর ধরে চীনা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে নানা আকারে প্রকাশমান হয়ে চলেছে। অষ্টাদশ শতকের কুও লিন [১৭৬৭-১৮৩১] কুংজু চেন [১৭৯২-১৮৪১], উনিশ শতকের হুয়াং স্থন সিয়েন [১৮৪৮-১৯০৫], বিশ শতকের লিউ তা পাই [১৮৮০-১৯৩২], লু শী [১৮৯১-?] কেউ এই ঐতিহ্যের বাইরে যান নি। ঐতিহ্য

বহির্ভূত নূতন কবিতা লেখা হয়েছে ও হচ্ছে আজকের চীনে, যার নিদর্শন খুব বেশী এসে পৌছায়নি এখনো আমাদের হাতে। অনুবাদের মাধ্যমে একটু একটু করে আসতে শুরু করেছে মাত্র।

জীবন মৃত্যু প্রেম ও পার্থিব সুখ ও দুঃখই অবশ্য সব কবিতার মত চীনা কবিতারও প্রধান অবলম্বন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, তাঁরা দীর্ঘ কবিতা লেখেননি। মহাকাব্য ত নয়ই, খণ্ডকাব্য বা কাহিনী কাব্যও না। গীতধর্মী ছোট্ট লিরিকই তাঁরা দিয়েছেন মানুষকে। কিন্তু গদ্য লেখায় বিশেষত আখ্যায়িকা, নাটক ও ইতিহাসে তাঁদের দানের হাত খাটো নয়। প্রাচীন লেখক কুয়ান হান চিং [২২০-১৩০০] লেখেন তাঁর মধ্য গ্রীষ্মের তুষার নামক সুবৃহৎ নাটক, যার সংক্ষিপ্তসার অভিনয়ে এখনো উপভোগ্য হয়। সত্যিই সুলিখিত বই এটি। ষোড়শ শতকে লিখিত হয় চিন পিং মেই নামক উপন্যাস, শী মিন কর্তৃক সোনালী পদ্ম নাম্নী সুন্দরীর অপহরণ কাহিনী হল যার বিষয়বস্তু। এটিও চমৎকার বই। হুং সিং [১৬৪৬-১৭০৪] কবি ও নাট্যকার লেখেন চিরন্তন যৌবনের প্রাসাদ। মধ্যযুগে লিখিত হলেও আধুনিক দৃষ্টি সম্পন্ন গীতিনাট্য রূপে আজো এটি পড়তে ভাল লাগে। পু সুংলিং [১৬৪০-১৭১৫] রচিত চীনা শিল্পগৃহের অদ্ভুত কাহিনী গ্রন্থও গোড়ার দিককার ছোট গল্প হিসাবে অনুল্লেখযোগ্য নয়, যদিও অলৌকিক উপকরণের প্রাচুর্য ঘটেছে অনেক গল্পে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রসঙ্গ এই পর্যন্তই থাক। শুধু তাও এবং কংফুজীয় দর্শন ব্যাখ্যাতা ইনি উ [৭৬৮-৮২৪], সাদা ঘোড়া বইয়ের রচয়িত্রী লি চিং চাও [১০৮৪-১১৫১], সব মানুষই ভাই উপন্যাসের লেখক শিনিয়ান আন [১৪ শতক] এবং ঐ একই সময়ের লেখক লো কুয়ান চং এর নাম উল্লেখ করব। সান কুয়ো বা তিন রাজধানীর চমকপ্রদ কাহিনী চংএর বিখ্যাত বই। এরপর উল্লেখ্য লাল কুঠির স্বপ্ন লেখক শো চান [১৭১৬-৬৪]। আধুনিক যুগ শুরু হয় দর্পণে ফুল উপন্যাসের লেখক লি জু চেন [১৭৬৩-১৮৩০] থেকে। তাঁর অল্প পরে ওঠেন লিউ ই [১৮৫৭-১৯০৯], তাঁর লাও সানের ভ্রমণ উপন্যাস প্রাচীনকালেব মূল্যবোধ ও আধুনিককালের বিদ্রোহী চেতনার মধ্যে নিঃশব্দে প্রবাহিত প্রতিদিনের সংঘাতকে ভাষা দিয়েছে। যথার্থ একালের লেখা এটিই। কিন্তু সত্যকার আধুনিকতার অগ্রনেতা হলেন চৌ সু জেন [১৮৮১-১৯৩৬], যিনি লু সুন নামে সারা পৃথিবীতে খ্যাত। তাঁর যুদ্ধের হাঁক এবং দ্বিধা

দুখানি অসামান্য উপন্যাস। জীবনবোধ, সত্যদৃষ্টি ও মনস্তাত্ত্বিক গভীরতায় অতুলনীয় লু চীনের শরৎচন্দ্র স্বরূপ। তাঁরই সঙ্গে উল্লেখ্য সেন ইয়েন পিং [১৮৯৬], যিনি মাও তুন নামে বেশী পরিচিত। তাঁর বন্যগোলাপ ও রামধনু উপন্যাসে আদিযুগ থেকে আধুনিক যুগে চীনা মনের বিবর্তনটি পরিষ্কার বোঝা যায়। বই দুখানি সারা বিশ্বেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও ওয়েলসের অন্তরঙ্গ বন্ধু কবি সু সিমো [১৮৯৬-১৯৩১] এবং বিখ্যাত রিক্সাওয়ালা বইয়ের লেখক সুচিং চুন অর্থাৎ লাও শি [১৮৯৮] বিস্তৃততর আলোচনার অপেক্ষা রাখেন, যেমন রাখেন নাট্যকার তিয়েন হান। লাও শির এক ছাদের নীচে চারপুরুষ উপন্যাস এবং তিয়েন হানের কাফেতে এক রাত্রি নাটক বিখ্যাত বই। হান একাঙ্ক নাটকেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কম্যুনিষ্ট চীনের সাম্প্রতিক সাহিত্য অনূদিত হয়ে এখনো বাইরে বিশেষ ব্যাপ্ত হয় নি। তবে নূতন চীনের স্রষ্টা মাও জে তুং স্বয়ং কবি ছিলেন, ছিলেন বিরাট তত্ত্বপ্রবক্তা প্রাবন্ধিকও। তাঁর রচনা আমরা সবাই পড়েছি অনুবাদের মাধ্যমে।

ছাব্বিশ ॥ জাপানী সাহিত্য ॥

চীনা সাহিত্য সম্পর্কীয় আগের অধ্যায়ের সীমায়ত আলোচনায় চীনা ভাষা সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নি। সংস্কৃত গ্রীক লাতিন হিব্রু ও আরবী ফারসীর মত চীনাও পৃথিবীর একটি প্রাচীন ভাষা। কম বেশী চার হাজার বছর ধরে এই ভাষা জীবিত আছে এবং ক্রমবিবর্তিত হতে হতে আজকের অধ্যায়ে এসেছে। চীনা ভাষা হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের দ্বারা বিশেষিত এবং তা লিখতে হয় চিত্র হরফের সাহায্যে। চিত্র হরফগুলি সবই সংকেত-বহ এবং তা উপর থেকে নীচে নামে, ডান থেকে বাঁয়ে বা বাঁ থেকে ডানে যায় না। কোন আদি মুঙ্গলীয় ভাষা থেকে এই লিপির উদ্ভব হয়েছে এবং এই লিপিই কোরিয়া জাপান ও অন্যান্য মুল্লুকে প্রচলিত লিপির উৎস, যেমন চীনা সভ্যতা সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধই তাঁদের মানসিক গঠনেরও ভিত্তিস্বরূপ। বিশেষ করে জাপানের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ত অনেকটাই চীনা সংস্কৃতির প্রতিফলিত দ্যুতিস্বরূপ। জাপানের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অবশ্য চীনের মত প্রাচীন নয়, তবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতক থেকেই জ্ঞানবিজ্ঞান ও কলাকৃষ্টিতে জাপানের সগৌরব অভ্যুত্থান দেখা যায়।

সাধারণভাবে সমগ্র জাপান দেশ সম্রাটের শাসনাধীন থাকলেও, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজে রণপ্রভু সামন্তদের অর্থাৎ সামুরাইদেরই ছিল প্রকৃত ক্ষমতা। কৃষক শ্রমিক এবং শিল্পী সাধারণের অবস্থা তাই খুব সুখের ছিল বলা যায় না। তবে জনগণের মধ্যে ছিল উন্নত শিল্পরুচি ও কঠোর শ্রমশীলতা। এ দুইয়ের মিলিত প্রভাবেই অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত জাপানের একটানা বৈষয়িক অগ্রগতি চলেছে। উনিশ শতকে তাঁরা প্রথম ইউরোপ ও আমেরিকার সান্নিধ্যে আসেন এবং তার ফলেই গড়ে ওঠে আধুনিক জাপানের কাঠামো। পুরাতন শিন্তো ধর্ম [পূর্বপুরুষের আরাধনা] এবং চীন থেকে আগত জেন বৌদ্ধ ধর্ম অবশ্য বজায় রাখলেন তাঁরা। কিন্তু রাজনীতিক ও সামাজিক ছাঁচটা প্রায় ষোলআনাই পাল্টে ফেললেন। পাল্টে ফেললেন প্রশাসন, শিক্ষাদীক্ষা ও সাহিত্যের ছাঁচ। শিল্পে-বাণিজ্যে তাঁরা হলেন প্রতীচ্যের অনুগামী এবং এই

শক্তিতেই ১৯০৪ সালের রুশ জাপান যুদ্ধে জয়ী হয়ে জাপান সমগ্র এশিয়ায় জাতীয় আত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করে।

জাপানী সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন রূপে পাওয়া যায় দুখানি বই, কোজিকি ও ম্যানিওস্যু। প্রথমটি হল ৭১২ অব্দে সংকলিত পুরাবৃত্তমূলক গদ্য বই, দ্বিতীয়টি হল সুপ্রাচীন কবিতা সংকলন, যার আনুমানিক সময় ৭৯৪ অব্দ। এই সংকলনে হিতোমারো, ইয়াকো মোচি, ওকুরা প্রমুখ কবিদের রচিত অসংখ্য কবিতা গ্রথিত হয়েছে। সাধারণত জাপানী কবিরা লিখেছেন হাইকু [হক্কু] ও তানকা, দুই-ই ক্ষুদ্রকায় কবিতা, যাতে বেশীর ভাগ বক্তব্য থাকে ইঙ্গিতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। এই সংগ্রহে স্বীকৃত কবিদের মধ্যে হিতোমারো যথার্থই একজন শ্রেষ্ঠ কবি। আজও জাপানের জনমনে আছে তাঁর জন্যে গভীর শ্রদ্ধার আসন। ম্যানিওস্যুর কিছু পরে গ্রথিত হয়েছিল কায়ফু সো নামে আর একখানি সংকলন, যাতে জাপানীদের লেখা চীনা কবিতা স্থান পায়। চীনাকে তখনো তাঁরা নিজেদের ক্ল্যাসিকাল ভাষা বলে ভাবতেন, এই ভাষায় পারদর্শিতা লাভকে তাই গণ্য করতেন বৈদগ্ধ্যের লক্ষণ বলে। একই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে মধ্যযুগে বাঙালী বৈষ্ণবরা অনেকে সংস্কৃতে কাব্য নাটক লিখেছিলেন।

এরপর আসে হেইয়ান যুগ, যার স্থিতি প্রায় চারশো বছর। এই যুগটি [৭৯৪-১১৮৪] জাপানী সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে জমকালো যুগ। এই যুগে আরিওয়ারা নো নারিহারা [৮২৩-৮৮০] লেখেন ইজে মোনাগাবারি বা ইজের কাহিনী, যাতে বিচিত্র খোসগল্প সংগৃহীত হয়েছে এবং তাদের একটার সঙ্গে আর একটাকে যুক্ত করা হয়েছে ছোট ছোট কবিতা দিয়ে। মিচিৎসুনার মা নাম্নী কোন অজ্ঞাত মহিলা লেখেন কাগেরো নিক্কি নামক আত্মসমীক্ষামূলক বই, যাতে তাঁর অসুখী বিবাহিত জীবনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ৯৫৪ থেকে ৯৭৪ পর্যন্ত বিশ বছরের মধ্যে আবদ্ধ এই কাহিনী এবং এতে পাওয়া যায় মোটের ওপর একটা উপন্যাসেরই ধাঁচ।

সার্থক উপন্যাস লেখেন এই সময়ই অভিজাত মহিলা মুরাসাকি সিকিবু [৯৮০-১০৩০] তাঁর উপন্যাসধর্মী গেন্‌জি বিগত হাজার বছরেও পুরান হয়নি। কাহিনীর গাঁথুনি ও চরিত্র বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে বইখানি সত্যিই অসাধারণ। সেই সোনাগণ নাম্নী আর এক মহিলা ১০০২ নাগাদ লেখেন পাশ বালিসের পুঁথি, যা উজ্জ্বল উপভোগ্য ডায়েরী ও রম্য রচনা হিসাবে চমৎকার। আরো এক মহিলা লেখেন চুনাগন মনাগাতারি নামক বই, যা অভিজ্ঞতা ও ভূয়ো-

দর্শনের স্বাক্ষর হিসাবে অতুলনীয়। অর্থাৎ মহিলা প্রধান গদ্য রচনার যুগ এটি। অবশ্য কোকিনস্থ এবং আরো কতকগুলি কাব্য সংকলনও তৈরি হয়, যাতে মিৎস্থনে, কোমাচি, তোমোনারি প্রমুখ কবির লেখা গ্রথিত হয়।

এর পরবর্তী দুটি যুগ হল কামাকুরা যুগ [১১৮৫-১৩৩৩] ও মুরোমাচি যুগ [১৩৩৩-১৬০০]. যা পূর্ববর্তী হেইয়ান যুগের তুলনায় ঢের বেশী নিরুজ্জ্বল। প্রথমটিতে আমরা পাই তায়রা এবং মিনামোতো গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতাদ্বন্দ্ব নিয়ে লেখা হিরেকের কাহিনী। পাই কামো নো চোমেই [১১৫৩-১২১৬] লিখিত হোজিকি নামক আত্মকথা. আর পাই উজি সংগ্রহ নামক বই, যাতে বৌদ্ধ কাহিনী ও উপকথা সমূহ সংগৃীত হয়। জোসিদা কেনকো [১২৮৩-১৩৫০] নামক কবির আলস্য কালের প্রবন্ধ নামক আর একখানি বইও পাই, যা সুখপাঠ্য লঘু রচনা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। মুরোমাচি অধ্যায়ের সব চেয়ে গণনীয় সৃষ্টি হল বহুকাল থেকে প্রচলিত নো লোকনাট্যের সাহিত্য রূপায়ণ। জিয়েমি মতোকিয়া [১৩৬৩-১৪৪৩] হলেন নো নাট্যের শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টা ও ব্যাখ্যাতা। তাঁর উতো বা দুর্ভাগ্যের পাখী এবং গৌরবের পটহ অনূদিত হয়ে বিদেশেও সমাদৃত হয়েছে। নো হল গীতিনাট্য বা অপেরাধর্মী রচনা এবং তা সাধারণত ব্যঞ্জনাগর্ভ দুঃখের কাহিনীকেই রূপ দেয়। কিয়োজেন হল এর বিপরীত, তা অনেকটা হাল্কা কমেডির মত। সাধারণত দেশাচার নিয়ে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে তা রচিত ও অভিনীত হত। সতোবা কোমাচি নামে কানামি কিয়োৎস্থগু রচিত আর একখানি নো নাট্য আছে. যাতে কোমাচি নাম্নী এক হৃদয়হীনা নারীকবির অহংকৃত অতীতের পরিণাম দেখান হয়েছে। ওতোগি সো সী অর্থাৎ রূপকথাও রচিত এবং প্রচারিত হয় অনেক এই সময়। এরপর তাকুগাওয়া যুগ [১৬০০-১৮৬৮] যার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পৌছাই একালে। এই অধ্যায়ের প্রথম গণনীয় লেখক হলেন ইহারা সাইকাকু [১৬৪২-১৬০৩], যাঁর লেখা প্রেমকে খুঁজেছিলেন এমন পাঁচ নারী সত্যিকার একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। গেন্‌জির পরই উল্লেখ্য এর নাম। কৌতুকে-করুণে অনবদ্য তাঁর রচনা।

প্রখ্যাত কবি মাৎস্থয়ো বাসো [১৬৪৪-১৬৯৪] এযুগের বিশিষ্টতম লেখক। তাঁর ওকু নো হোসোমিচি নামক গদ্যরচনা এবং অজস্র হাইকু জাপানী সাহিত্যে চির স্মরণীয় হয়ে আছে। কাবুকি নৃত্যের দেশ জাপানে পুতুল নাট্য বা পাপেট

ড্রামারও খুব প্রচলন আছে। চিকামাৎসু মোলাজানা [১৬৫৩-১৭২৫] এই বিভাগের একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁর সোনেজাকিতে প্রেম ঘটিত আত্মহত্যা নামক বই অধ্যয়ন ও অভিনয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাকাদো ইজুমো [১৬৯০-১৭৫৬] রচিত নাটক সুগাওয়ারা পরিবার এবং জিপেনসা ইক্কুর [১৭৬৬-১৮৩১] হিজাকুরিজে কৌতুক উপন্যাসও উৎকৃষ্ট রচনা। এরপরই সেকালের শেষ এবং একালের শুরু, যার কথা পরের অধ্যায়ে বলব।

২.

পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার প্রধান প্রধান দেশগুলি সবাই ইউরোপীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে নিজেদের সমাজ সংস্কৃতি শিক্ষা ও জীবন চর্যার ধরণ-ধারণগুলি সম্পূর্ণ নূতন করে গড়ে পিটে নিতে থাকেন উনিশ শতকের শুরু থেকেই। এই ভাঙাগড়ার ছাপ সবচেয়ে বেশী প্রকট হয় এইসব দেশের সাহিত্য চিত্রকলা নাটক ইত্যাদিতে। এখানে আমরা শুধু সাহিত্যের কথাই বলব। কে না জানেন এইসব দেশে সুপ্রাচীন কাল থেকেই উন্নতমানের সাহিত্য রচিত হয়েছে। কিন্তু পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার রূপে যে ধরণের কবিতা কথা সাহিত্য ও নাটকাদি লিখেছেন পূর্বতন কালের সাহিত্য স্রষ্টারা, তার ধারা আদৌ অনুসরণ না করে নূতন যুগের লেখকরা অনুসরণ করেন প্রতীচ্য সাহিত্যের ছাঁদ। একালের প্রাচ্য সাহিত্যে তাই প্রাণধর্মে সেকাল থেকে ষোল আনা তফাৎ হয়ে পড়ে। একথা আরব পারস্য ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যেমন সত্য, তেমনি সত্য চীন জাপান সম্বন্ধেও। আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি জাপানে কবিতা, উপন্যাস, আত্মসমীক্ষামূলক ডায়েরী, রম্য রচনা এবং গীতধর্মী নাটকের একটি নিজস্ব ধরণ ছিল, যাকে কেন্দ্র করে হাজার বছরের ওপর সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস চলেছে।

ব্যতিক্রমের হাওয়া প্রথম নিয়ে আসেন জিপেন সাইক্কু [১৭৬৫-১৮৩১] এবং কিয়োকুতেই বাকিন [১৭৬৭-১৮৪৮], নূতন কালের আদর্শে সাহিত্য রচনা করে। প্রথমের শাংকের মাদী ঘোড়া এবং দ্বিতীয়ের আটটি কুকুরের জীবন ব্যঙ্গের সুরে লেখা হাল্কা দুখানি উপন্যাস। মুরাসাকি ও সাইকুকুর ধারা থেকে এরা সম্পূর্ণ আলাদা মেজাজের আলাদা আদর্শের লেখা। এঁদের খুলে দেওয়া পথেই এরপর আসে উপন্যাস সাহিত্যের জোয়ার। একে একে উঠতে থাকেন শিরাকাতা বা সাদা পাকুড় গাছ বইয়ের লেখক মুসাকজি সানেৎসা [১৮৫৫-?],

বুনো হাঁসের পাল উপন্যাসের লেখক মোরি ওগাই [১৮৬২-১৯২০], একটি সৈনিক এবং সহধর্মিণী প্রভৃতির রচয়িতা তোয়ামা কাতাই [১৮৭১-১৯৩০]। অন্ধকারের যাত্রী রচয়িতা সিগান্যাওয়া [১৮৮৩-?], নরকের ফুলগুলি বইয়ের স্রষ্টা নাগাই কাফু [১৮৭৯-১৯৫৯], আমি একটি বিড়াল কৌতুক উপন্যাসের লেখক নাৎসুমে সোজেকি [১৮৬৭-১৯২৬], ঘরে ফেরা বইয়ের লেখক ও সারাগি জিরো [১৮৯৭-?] প্রমুখ অসংখ্য সাহিত্যস্রষ্টা দেখা দেন একে একে।

শুধু উপন্যাস রচনা নয়, উপন্যাস সাহিত্যের রীতি প্রকৃতি কি হওয়া উচিত, সমসাময়িক কালের উপন্যাস লিখিয়েদের মধ্যে তুলনাত্মক মূল্যায়নে কার কি স্থান, তা নিয়েও প্রভূত আন্দোলন হতে থাকে এই সময় থেকে। মাকোইকা ভগিনীরা নামক বিখ্যাত উপন্যাসের লেখক তানিজাকি জুনিচিরো [১৮৮৬-১৯৬৫] বিশেষভাবে এই আন্দোলনে বেগ সঞ্চার করেন, যদিও সুবোচি সোজি [১৮৫৯-১৯৩৫] লিখিত দ্য এসেন্স অব নভেল্স বা উপন্যাসের সারবস্তু বইয়েই প্রথম সূত্রপাত হয় নূতন উপন্যাসের প্রকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণের এই ধারা। শুধু উপন্যাস নয়, কাব্যের আঙ্গিক ও প্রাণবস্তু নিয়েও নূতন করে দেখা দেয় দেশব্যাপী আন্দোলন।

কবি সিমাজাক তোসন [১৮৭২-১৯৪৩] এবং ইশিকাওয়া তাকুবকু [১৮৮৫-১৯১২] কবিতার ক্ষেত্রে নূতন পরীক্ষার পথ প্রশস্ত করেন। প্রথমের ওয়াকানস্থ বা কচি পাতার গোছা এবং দ্বিতীয়ের একমুঠো বালি এই নূতন আদর্শের সার্থক কবিতা গ্রন্থরূপে সর্বজনের অনুরাগ আকর্ষণ করে। তোসন অবশ্য পরে কবিতা ছেড়ে উপন্যাসে মন দেন এবং তাঁর ভগ্ন প্রতিশ্রুতি একখানি সত্যকার ভাল উপন্যাস। ইয়েনে নোগুচির নামের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই আছে অধিকতর পরিচয়, তার কারণ জাপানীর মত তিনি ইংরাজীতেও বহু উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন। তাছাড়া চীন জাপানের যুদ্ধের সময় জাপানের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অনুকূলে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন অর্জনের জন্যে তাঁর চিঠি এবং তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সমর্থনে এবং বিশ্ব রাজনীতির তৎকালীন আগ্রাসী ধারার বিরুদ্ধে সেই তেজোদ্দীপ্ত পত্র তাঁকে এদেশে বেশী পরিচিত করেছে। কিন্তু সে যাইহোক নোগুচি কবি হিসাবে সত্যিই বিশিষ্ট শক্তির অধিকারী। জাপানী সাহিত্য, চিত্রকলা এবং জীবনচর্যা সম্বন্ধীয় তাঁর গদ্য রচনাবলীও অনুল্লেখযোগ্য নয়।

বলা দরকার যে হাইকু ও তানকা শ্রেণীর বাঁধা মাত্রার ছোট কবিতার পরিবর্তে মুক্ত ছন্দের দীর্ঘ কবিতা লেখা শুরু হয় এ যুগেই। যেমন নো নাট্য ও পুতুল নাট্যকে একান্তে সরিয়ে দিয়ে জীবন সমস্যামূলক একালীন নাটক রচনা এবং অভিনয়ও শুরু হয় সর্বত্র। এই নবনাট্য আন্দোলনের নায়কদের মধ্যে কিকুচি কান [১৮৮৮-১৯৪৮] খুব প্রসিদ্ধ। তাঁর দুখানা বই ছাদে ওঠা পাগল, আর বাবা ফিরে এলেন ইংরেজী অনুবাদে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। প্রথমটির বাংলা রূপান্তরও আশা করি অনেকেই পড়েছেন এবং অভিনীত হতে দেখেছেন।

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধে জাপানে আর যে সব অগ্রণী সাহিত্যিক দেখা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ঔপন্যাসিক আকুতোগাওয়া রিয়ানোস্থকে [১৮৯২-১৯২৯], ইয়াস্থনারি কাওয়াবতা [১৮৯৯-১৯৭২] ওসারানি জিরো [১৮১৭-?] কাবাইয়াসি তাকিজি [১৯০৩-৩৩], উকা সোহেই [১৯০৯-?], উকিয়ো মিসিমা [১৯২৫-?] প্রভৃতির নাম স্থখ্যাত। রিয়ানোস্থকের রাসোমন উপন্যাস বই এবং ছায়াচিত্র উভয় রূপেই সকলকে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর আর একখানি স্থন্দর বই হল নাক। কাওয়াবাতা ত নোবেল প্রাইজ পেয়ে বিশ্বসাহিত্যেই গণনীয় স্থান লাভ করেছেন। তাঁর ইজু নর্তকী, তুষার দেশ, এক হাজার সারস প্রভৃতির মধ্যে পুরাতন রোমান্টিক আদর্শবাদ ও একালীন বাস্তবতার সংঘাত অপূর্ব কাহিনীর আকারে মূর্ত হয়েছে। মনস্তত্ত্বের জটিল গ্রন্থি উন্মোচনে ও সরস সংলাপ গঠনেও তিনি বিশেষ শক্তিশালী।

ওসারানি জিরোর বাড়ী ফেরা, উকা সোহেই-এর সমতলে অগ্নিকাণ্ড, তাকিজির খেয়া নৌকা, মিসিমার প্রেমের তৃষ্ণা, ঢেউয়ের শব্দ, নিষিদ্ধ আনন্দ ইত্যাদি বই ইদানীন্তন জাপানী কথাসাহিত্যের সর্বোত্তম নিদর্শন। সোহেই-এর সমতলে অগ্নিকাণ্ড যুদ্ধ বিরোধী উপন্যাস রূপে খুবই বিখ্যাত। মিসিমার ছোটগল্পও অসাধারণ কারুকলার গুণে সর্বত্র সমাদৃত। আধুনিক ধারার কবিদের মধ্যে হারা তামিকি [১৯০৫-৫১], তাকিতারা মিচিজো [১৯১০-৩৯], কিনোসিতা জুজি [১৯১০-?] তামুরা রিউচি [১৯২৩-?] প্রমুখ খুবই প্রতিষ্ঠাবান হয়েছেন।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালের পারমাণবিক বোমার আঘাত সহ্য করেও জাপানের অজেয় পৌরুষ, জীবনবোধও সৌন্দর্যরুচি

নিত্য নূতন সাহিত্য এবং শিল্পের ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে চলেছে, এ এক আশ্চর্য ঘটনা। অবশ্য তার সাম্প্রতিকতম সাহিত্যের খুব বেশী নিদর্শন এখনো অনুবাদ মাধ্যমে এসে পৌঁছয়নি আমাদের হাতে। জড়ান চুলের ফাঁস কবিতা সংগ্রহের লেখিকা ইয়োসানো আকিকো [১৮৭৮-১৯৪২] সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনার প্রয়োজন ছিল, যা আপাতত করা যাচ্ছে না উপকরণের অভাবে। দু-একটি বিচ্ছিন্ন অংশমাত্র তার ইতস্তত অনুবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে ইংরেজীতে। জাপানী সংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রসঙ্গে শিল্পবেত্তা পণ্ডিত ওকাকুরার নাম অবশ্যই উল্লেখ্য। ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনে তাঁর দান খুব অল্প নয়।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে মঙ্গলিয়া, তিব্বত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, বর্মা, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, সিংহল [শ্রীলঙ্কা] প্রভৃতিও বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে প্রভূত ঐশ্বর্য দিয়েছে। এবার সংক্ষেপে তাদের প্রসঙ্গ একে একে আলোচনা করছি। বলা দরকার যে এইসব দেশ যেহেতু ভারত ও চীন এই দুই সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ সুপ্রাচীন দেশের সাংস্কৃতিক বলয়ের অন্তর্ভুক্ত, তাই এদের জীবনে মনন এবং শিল্পের সর্বত্র এই দুইয়ের সমুজ্জ্বল প্রভাব দেখা যায়। বস্তুত আদি অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় নবম দশম শতাব্দী থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত চীন ও ভারত সংস্কৃতির প্রাণরস আহরণ করেই এরা বেড়ে উঠেছে। তারপর এসেছে ইসলাম এবং অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে এসেছে ইউরোপের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। বলা বাহুল্য এ দুইয়ের প্রভাবও পড়েছে এদের ওপর। তার ফলে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলীম ও খ্রীষ্টান, এই চতুর্বর্গ সংস্কৃতির মিলিত প্রভাব লক্ষ্য করা যায় আজকের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে।

এই সবের অতিরিক্ত আরো একটা ধারারও প্রভাব দেখা যায়, তা হল সাম্যবাদের আদর্শ, যা উত্তর কোরিয়া ভিয়েৎনাম মঙ্গলিয়া প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। বলা বাহুল্য এ হয়েছে রাশিয়া ও চীনের রাজনীতিক অনুপ্রেরণার ফলে। কিন্তু এই প্রসঙ্গ এই আলোচনার ক্ষেত্রে বোধহয় নিষ্প্রয়োজন! শুধু এইটুকু বলে রাখা দরকার যে চীন ভারত সাংস্কৃতিক মিলন সম্বন্ধে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সমাজ সংস্কৃতি ধর্ম সাহিত্য ও শিল্পের উপর ভারতীয় প্রভাব সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, নীহাররঞ্জন রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, হিমাংশুভূষণ সরকার প্রমুখ পণ্ডিতের নাম সর্বাগ্রগণ্য। তাঁদের রচনাবলীও বিদেশী পণ্ডিতদের মতই পথ প্রদর্শকের কাজ করেছে সন্ধানীদের।

মঙ্গলিয়ার সাহিত্য শুরু হয় খ্রীষ্টীয় ১৩ শতকে রচিত মঙ্গলদের গোপন

ইতিহাস নামক বই দিয়ে। এই বইটি প্রকৃতপক্ষে চেঙ্গীজ খাঁর জীবন নিয়ে লিখিত একখানি মহাকাব্যোপম কাহিনী। ১৭ শতকে সানাগসেৎস্থন রচনা করেন এর একখানি সংক্ষিপ্তসার এবং তাই এখন পৃথিবীর সর্বত্র চলে। ১৩ থেকে ১৬ শতক পর্যন্ত মুঙ্গল সাহিত্যে কবিতা, কাহিনী, নীতিকথা ইত্যাদি যা লিখিত হয়েছে, তার বহু খণ্ডিত নিদর্শন এ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেছে। এসবের মধ্যে আলেকজেণ্ডার সম্পর্কীয় মহাকাব্যের ভগ্নাংশই সবচেয়ে গণনীয়। ১৬ শতকে মুঙ্গলিয়া অধিকৃত হয় চীন কর্তৃক এবং তখনই সেখানে হয় বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ। এই সময় সংস্কৃত, পালি ও চীনা থেকে বহু বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থ এবং ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ক বই অনূদিত হয়। প্রার্থনা-মূলক লামা সাহিত্যও রচিত হয়, রচিত হয় জাতকাশ্রিত বহু উপকথা। প্রার্থনা গীতগুলি লোকসাহিত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন, আর এরা বোধহয় খুব প্রাচীনও।

১৭ ও ১৮ শতকে চীনা ছাঁদের উপন্যাস, গাথা কবিতা, গীতিনাট্য ইত্যাদি লিখিত হয়, যার মধ্যে মৌলিক কিছুই প্রায় নেই। বিচ্ছিন্ন গীতিকবিতাগুলি অবশ্য সুন্দর। আর ওগুলি উঠেছিল জাতির প্রাণলোক থেকে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে চীনা দখলদারি উচ্ছিন্ন হয় এবং স্বাধীন মুঙ্গলিয়া সাধারণতন্ত্র জন্ম নেয়। এখান থেকেই আসে সোভিয়েত প্রভাবে এবং তার জীবন ও মননে ফুটে ওঠে নূতন যুগ ও জীবন চিন্তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। বিরিনৎসেনের পাহাড়ী খাদে ঊষাগম এই যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'ৎস দাম দিন সুরেনের ছোট গল্পেও লক্ষ্য করা যায় নূতনের পদক্ষেপ।

মুঙ্গলিয়ার চেয়ে তিব্বতের সাংস্কৃতিক জীবন প্রাচীনতর। খ্রীষ্টীয় ৭ থেকে ১৩ শতকের মধ্যে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র ও তত্ত্বগ্রন্থ সমূহ সংস্কৃত থেকে অনুবাদ হতে থাকে। তাছাড়া তার নিজস্ব ইতিহাস, উপকথা এবং নীতিগ্রন্থও রচিত হয় প্রচুর। তিব্বতী শাস্ত্র গ্রন্থগুলিকে ভাগ করা হয় দুই অংশে, কাঞ্জুর বা ক্যাঙ্গুর আর তেঞ্জুর বা ত্যাঙ্গুর। কাঞ্জুর হল গুরুমুখী তত্ত্বজ্ঞান, তেঞ্জুর লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থ। সহস্র সঙ্গীতের সংকলক মহাযোগী মিলারো এবং রত্নালংকার রচয়িতা গামশোপা মধ্যযুগীয় তিব্বতের দুই স্মরণীয় পুরুষ। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস লেখক লামা তারনাথের নাম এবং তিব্বতে মহাচার্যরূপে স্বীকৃত বাংলার বরেণ্য সন্তান অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞানের

নাম ত বাঙালী পাঠক সমাজে খুবই পরিচিত, যেমন পরিচিত তিব্বতী তন্ত্র বৌদ্ধ সংমিশ্রিত সহজিয়া তত্ত্বের কথা। কিন্তু মিলারো সংকলিত সহস্র গীতি এবং মৃতের পুঁথি নামক তত্ত্ব নিবন্ধটি ছাড়া তিব্বতী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন নিদর্শন বাইরের মানুষের হাতে আসেনি। একালীন সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিচায়ক কিছু লেখা ত পাওয়াই যায় না। ১৯৫৯ তিব্বত কম্যুনিষ্ট চীনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আশা করা যায় এই রহস্য যবনিকাবৃত দেশের জীবন মননে এবার নূতন কালের আলো হাওয়া লাগবে।

আজ যে দেশকে ইন্দোনেশিয়া বলা হয়, অতীতে তা বালী, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্বয়ং সম্পূর্ণ কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি ছিল। একদা ভারতীয় শৈলেন্দ্র বংশ এই দ্বীপময় দুনিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল এবং তার ফলেই সেখানে হিন্দুধর্ম, সাহিত্য ও স্থাপত্য রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। বালী অদ্যাবধি হিন্দুত্বেই অধিষ্ঠিত আছে। কিন্তু অন্য অঞ্চলগুলি পঞ্চদশ শতক থেকে ইসলামের প্রভাবে ধর্মান্তরিত হয়। তারপর অষ্টাদশ শতকে ওঁরা আসেন ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে। ওঁদের সাহিত্য ও কলাকৃষ্টিতে তাই হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীষ্টান তিন সংস্কৃতিরই মিলিত মূর্তি দেখা যায়।

বালীতে জয়প্রেম নামক কাব্য কাহিনী এবং কিছু গান ও লোককথার নিদর্শন ছাড়া মূল্যবান সাহিত্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নি। জাভায় অবশ্য ওঁদের পুরাতন কাওয়ী ভাষায় বহু হিন্দু বৌদ্ধ বইয়ের অনুবাদ পাওয়া গেছে, গেছে রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে রচিত ছায়ানাট্যের অনেক পালা, যার স্থানীয় নাম ওয়াং। ১৪ শতকে প্রপঞ্চ রচিত নগরক্রেতা গামা নামক দার্শনিক গ্রন্থটির নামও করা যেতে পারে। এছাড়া রাদেনপঞ্জী নামক জনৈক উপকথার নায়কের প্রণয় কাহিনী নিয়ে লেখা একখানি আখ্যান কাব্যও আছে, যা অত্যন্ত সুখপাঠ্য।

১৫ শতকে জাভা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং তখন মুসলমান দুনিয়ার বীর নায়ক আমীর হামজার বৃত্তান্ত নিয়ে লেখা হয় মেদাক নামক আখ্যান কাব্য। ১৮শতকে চেন তিনি নামে আর একখানি বই লেখা হয়, যা কাব্য হলেও, প্রকৃতিতে বিশ্বকোষ শ্রেণীর তত্ত্বপ্রধান রচনা। এছাড়া বাবাদ বা ঐতিহাসিক রচনাবলী এবং টুকরো কবিতা ও ছায়ানাট্য লেখা চলতে থাকে বরাবরের

মতই। সুমাত্রা [মালয়] সাহিত্য সম্পদ সৃষ্টি করেছে সবচেয়ে বেশী। বিশেষত বিখ্যাত হল তার লারা ও পানতুম, যা আসলে উপকথা ও চার চরণের ক্ষুদ্র কবিতা। এছাড়া সেজারা মালায়ু নামে প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থও রচিত হয়েছিল ১৭ শতকে। আব্দুল রউফ সিংকেল, সামসুদ্দীন পাসাই প্রমুখ কবি এই সময়ই সুফীভাবাপন্ন কবিতাবলী রচনা করেন। ১৮ শতকে ওঠেন আবদুল্লা বিন আব্দুল, যিনি প্রথম পাশ্চাত্য প্রভাব নিয়ে আসেন শিক্ষা দীক্ষা ও সাহিত্য চিন্তায়। কিন্তু ১৮৭০ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত চলে ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক দাসত্বের কাল এবং এই সময় লক্ষ্য করার মত সাহিত্য বিশেষ কিছুই সৃষ্টি হয় নি। এখন সময় এসেছে ওঁদের নূতন যুগ ও জীবনের ডাকে সাড়া দেবার।

২.

১৯২২ নাগাদ জাভা বালী ও সুমাত্রার আঞ্চলিক ধারাগুলি একত্র হয়ে গড়ে উঠল ইন্দোনেশীয় সাহিত্য এবং জাতীয় ভাষারূপে ইন্দোনেশীয় ভাষার পক্ষেও জোর আন্দোলন শুরু হল। বেন হামজার সম্পাদনায় পুদিয়ানুগ্গা বারু বা নূতন লেখা নামে প্রগতিশীল সাহিত্য পত্র প্রকাশিত হল। তৈরি হল বালাই পুস্তক নামে প্রকাশন সংস্থা এবং নূতন উদ্যমে কবিতা ও গল্প উপন্যাস লিখতে লাগলেন সাহিত্যিকরা। প্রথম আধুনিক উপন্যাস স্থত্তি নরবাইয়া লিখলেন মারা রুসলি [১৯২২], প্রথম আধুনিক কবিতার সংগ্রহ প্রকাশ করলেন মহম্মদ ইয়াসিন। পুরাতন কাকাউইন ছাঁদের কবিতায় ছেদ পড়ে এখান থেকেই। ১৯৩৩ থেকে তারপর একে একে উঠতে লাগলেন রোস্তম এফান্দী, সানুগী পানে, তকদির আলিস জাহাবুয়া। এঁদের নাম দেওয়া হল আংতাল এমপাতপুলু লিমা অর্থাৎ নূতন কালের লেখক। ১৯৪৫-এ এই প্রজন্মই ডাচ ভাষা পরিহারের এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অনুকূলে প্রবল আন্দোলন শুরু করেন, যার পরিণতিতে কয়েক বৎসরের মধ্যেই গোটা ইন্দোনেশিয়া হয় বিদেশী শাসনমুক্ত। এই অধ্যায়ের বিশিষ্ট লেখক হলেন চারিল আনওয়ার এবং প্রমোয়ে দিয়ে অনন্ত প্রমুখ স্বনামধন্য কবি ও কথা-সাহিত্যিক। অবশ্য এখনো ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের পূর্ণায়তন আধুনিক রূপটি পৃথিবীর সামনে ভালভাবে উদ্ঘাটিত হয়নি।

থাইল্যাণ্ডের সাহিত্যও খ্রীষ্টীয় ১৩-১৪ শতক থেকে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ

করতে থাকে। রাজধানী শুকথাই থেকে আউথিয়ায় স্থানান্তরিত হবার পর রাজা নারাইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সারা দেশে [১৬৫৭-৮৮] নাটক ও কাব্য কাহিনী রচনার ঝোঁক প্রবল হয়। লাখন আর চাত্রী এই দুই ধারার নাটক সুপ্রাচীন কাল থেকেই লেখা হত থাই ভূমিতে। সব নাটকই রামলীলা বিষয়ক এবং ভ্রাম্যমান অভিনেতারা ইতস্তত দেখিয়ে বেড়াতেন এইসব নৃত্যগীত প্রধান নাটক। এছাড়া একান্ত ভাবে মানুষ নায়ক নায়িকা নিয়ে লেখা কাব্য কাহিনীর বিশেষ প্রচলন ছিল। ১৬-১৭ শতকে রচিত ফ্রালো, খুন চাব খুন ফায়েন প্রভৃতি কাহিনীর এখনো আদর আছে। এই শেষোক্ত কাব্যটির রচয়িতা স্থন থান ফু বলে অনুমান করা হয়। অন্যগুলির রচয়িতারা সবই অনামা।

১৬ থেকে ১৯ শতকের মধ্যে থাই ভাষায় অনেকগুলি ঐতিহাসিক কাব্য লিখিত হয়, তার মধ্যে যুয়ান ফাই এবং তেদাং ফাই প্রসিদ্ধ। এছাড়া জাতক কাহিনী ইনাও, রামায়ণ রামকিয়েন এবং জীবজন্তুর উপকথা, লোকগল্প ও লোক-নাট্যও রচিত হয় প্রচুর। ১৭ শতকে তত্ত্বকবিতা লেখার একটা ঢেউ আসে এবং তাও চলে ১৯ শতক পর্যন্ত। লক্ষণীয় যে এই সাহিত্যের বেশীর ভাগই ভারতীয় হিন্দু-বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট। তারপর রাজধানী ব্যাঙ্ককে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৮৫০ নাগাদ গদ্য লেখা শুরু হয়। বলা বাহুল্য আধুনিক থাই সাহিত্যের অগ্রণী লেখকরা সবাই সাবেকী ঐতিহ্য পরিহার করে ইউরোপীয় ছাঁচ গ্রহণ করেছেন এবং প্রধানত উপন্যাস ছোট গল্প ও নাটকই লিখেছেন তাঁরা। আধুনিক কবিতাও হয়েছে অবশ্য, তবে পরিমাণে কম।

বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে ডক মাই সং [১৯০৬-৬৩] লেখেন দুখানি উপন্যাস জগৎ এই রকমই [১৯৩২] এবং সাধু সজ্জন [১৯৩৭]। এই মহিলা কথাসাহিত্যিক নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও নারীর মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সিবুরাফা [১৯০৫] আর একজন শক্তিশালী লেখক। তাঁর ছবির পিছনে এবং জীবন সংগ্রাম উপন্যাস দুটি যথার্থ সমাজ সচেতন বলিষ্ঠ রচনা। ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী কুক্রুৎ প্রমোজ [১৯১২] আর একজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। তাঁর দীর্ঘ উপন্যাস চার রাজত্ব এবং অনেক জীবন ইংরেজী অনুবাদে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া প্রিন্স আকাত দামকোয়েৎ, প্রিন্সেস পিসমাই দিসকুল্লা এবং বিদুষী কে সুরাং কানাং প্রভৃতিও থাই সাহিত্যে প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক-লেখিকা। বলা প্রয়োজন যে থাইরা

ছিলেন মধ্যযুগ থেকেই রামচন্দ্রের অনুরাগী। থাই সম্রাটরা তাই অনেকেই রামনামধারী এবং তাঁদের রাজধানী আউথিয়াও ছিল আসলে অযোধ্যারই রূপান্তরিত সংস্করণ।

আধুনিক থাইল্যাণ্ডে অবশ্য মার্কিন প্রভাবই বিশেষভাবে প্রকট, যদিও তরুণ সমাজ ইদানীং দ্রুত চীনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন এবং নবীন অধ্যাপক সাংবাদিক ও সাহিত্যসেবীদের মধ্যে রাজতন্ত্র বিরোধী মনোভাব দানা বাঁধছে, যার পরিচয় পাওয়া যায় তরুণতম কবি ও কথাসাহিত্যিকদের রচনাবলী ঘাঁটলে। মডার্ন থাই পোয়েমস এণ্ড ষ্টোরিজ নামক সংকলনটি সবাই উল্টে দেখতে পারেন।

এবার ভিয়েতনামের সাহিত্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। অনেকেই জানেন বোধ হয় যে ভিয়েৎনামীদের নিজস্ব কোন হরফ ছিল না, খ্রীষ্টীয় ৮-৯ শতক থেকে একটানা ১৯ শতক পর্যন্ত ওঁরা চীনা হরফেই নিজেদের ভাষা লিখতেন, আর সাহিত্য রচনার রীতিতেও করতেন চীনা সাহিত্যের অন্ধ অনুসরণ। কম্বোডিয়া লাও আনাম টনকিং প্রভৃতি অঞ্চল ফরাসী অধিকারে এসে ইন্দোচীন নাম ধারণ করলে, উনিশ শতকী মিশনারীরাই প্রথম কুয়োকনু হরফ প্রবর্তন করেন। কিন্তু গণনীয় সাহিত্য বিশেষ কিছুই লিখিত হয়নি আনামী ভাষায় আধুনিককালের আগে। কিছু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ও নীতিশাস্ত্র এবং কিছু ঐতিহাসিক ব্যাপার বৃত্তান্ত মাত্র পাওয়া যায় ওঁদের নিজস্ব লেখা বলতে। অবশিষ্ট সবই হল চীনা সাহিত্যের অনুবাদ বা নকল।

আধুনিক কালের সূচনায় দেখা দেন কয়েকজন কবি যাঁদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হলেন তানদা, ভুংলাম, হুয়ান থাক প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে ১৯২৫ থেকেই শুরু হয় আনামী ভাষার মুক্তির দিন। ঐ সময় থেকে নতুন সাহিত্যের আন্দোলন জন্ম নেয় এবং অজস্র ধারায় কবিতা, উপন্যাস ও নাটক লেখা হতে থাকে। ১৯৩৬-এ কবি দিলু লেখেন অরণ্যের আর্তনাদ নামক কবিতা গ্রন্থ। অন্যান্য কবিদের মধ্যে ওঠেন হান মাক তু, তু হুয়ো, ওয়ান দিয় প্রভৃতি। ১৯৩৮ থেকে ৪০-এর মধ্যে প্রকাশিত হয় দুখানি কবিতা সংকলন, যাতে একালীন কবিতার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

উপন্যাসে ন হাট লিন, নান তিউ, গল্পে বুই হিয়েন, নাটকে ভাই হুয়েন দাক, দোয়েন ফু তু খুবই প্রসিদ্ধ। লিনের উপসংহার ও উপেক্ষা এবং তিউ-

য়ের মহিষ সত্যকার জীবনধর্মী উপন্যাস। চাষী জীবনের সংকট ও দুঃখ বেদনা ভাষা পেয়েছে তিউয়ের রচনায়। হুয়েন দাকের টাকা এবং ফু তুর ঈর্ষা নাটকেও বঞ্চিত নীচু সোপানের মানুষদের সমস্যাকে গভীর দরদের সঙ্গে রূপ দেওয়া হয়েছে। বিখ্যাত কাই লুয়াং নাট্যালয়ে এই সব নাটক শত শত মানুষকে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করেছে। ১৯৪৫-এর বিপ্লব এবং পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধ ভিয়েৎনামের জীবন ও মননে এনেছে নূতন ভাবের স্পন্দন। এই সময়ের বিখ্যাত প্রতিরোধের কবি হলেন নগুয়েন বিন। তাছাড়া নূতন ভিয়েৎনামের সংগঠক মহান হো চি মিন স্বয়ং একজন অগ্রগণ্য কবি। তাঁর নেতৃত্ব যেমন গোটা দেশকে সংহতির সূত্রে বেঁধেছে, তেমনি তাঁর অসংখ্য গান ও কবিতা গোটা জাতিকে দিয়েছে নব জীবনের প্রেরণা। তাঁর বাঁশবনের ড্রাগন সাংকেতিক নাটক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের মতই গভীর তত্ত্ব দৃষ্টিসম্পন্ন রচনা।

৩.

কোরিয়ার সাহিত্য যাত্রা শুরু করেছিল আদিতে চীনা কবিতা নাটক ও উপকথার অনুকরণ ও অনুসরণ দিয়ে। গোড়ার দিকে তার একখানি ইতিহাস গ্রন্থ হল সাংগুক সাগি, যার সংকলকের নাম কিম পাইক। দ্বাদশ শতকের কোন সময় এটি সংকলিত হয়। এরপর কিম মানযুগ [১৬৭৩-৯২] নয়জনের মেঘ স্বপ্ন নামক কাহিনীটি লেখেন। সান পাইকুকু নামে একখানি নাটকেরও বহুল প্রচার ছিল। এছাড়া ছিল এবং এখনো আছে কুয়ান সং রচিত গীতি কবিতা ও গাথাগুলির সমাদর। কোরিয়ার এই সাহিত্য শুধু চীনা সাহিত্যের প্রতিধ্বনি স্বরূপ নয়, লেখাও হয়েছিল বেশীর ভাগই চীনা হরফে। পঞ্চদশ শতকে রাজা সেজং [১৪১৯-৫১] ওনসান বর্ণমালা উদ্ভাবন করলে, তখন থেকে কোরিয়ার লিখন পঠনে নিজস্ব লিপি প্রচলিত হয়। কিন্তু আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চিহ্নিত হবার মত সাহিত্য সৃষ্টি কোরিয়ায় সম্ভব হয় নি বিশ শতকের আগে, যদিও ধর্মগ্রন্থ এবং আইনকানুন ও ইতিহাস বিষয়ক বই বরাবরই প্রচুর লেখা হয়েছে। তাত্ত্বিক ও সৃষ্টিধর্মী রচনার মধ্যেকার পার্থক্যটুকু ওঁরা স্বীকারই করতেন না।

দুঃখের বিষয় কোরিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতি আধুনিক কালের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়ের অন্ধকার, ১৯১০-এ

জাপান কর্তৃক গোটা দেশ অধিকারের ফলে। ১৯৪৫-এর আগে এই দখলদারি শেষ হয়নি। এই সময়টা জাতির জীবনে গেছে চরম দুর্ভাগ্যের দিন, যদিও ওরই মধ্যে জেগেছে পৌরুষদীপ্ত প্রতিরোধের মানসিকতাও। চৈ নাম সান সম্পাদিত সোনিয়েন পত্রিকা এই কাজে নিয়েছে অগ্রণী ভূমিকা। তাছাড়া তৈরী হয়েছে এসোসিয়েশন অব প্রলেতারিয়ান লিটারেচার এণ্ড আর্ট, যার নেতৃত্বে লী জী জেৎ, হান জেল ইয়া, কিম টঙ্গ ই প্রমুখ লেখক চেতনার রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছেন মানুষের। প্রথমের হতভাগ্য মানুষ এবং দ্বিতীয়ের সেই সাংঘাতিক রাত্রি এবং ক্ষুধা—এই তিনখানি উপন্যাস নূতন যুগচেতনার স্বাক্ষরবাহী রচনা হিসাবে খুবই উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ইয়ং হিল কাং লেখেন ঘাসের ছাদ উপন্যাস এবং গিয়াক ইন দিয়ান লেখেন লি বংকু বা দিনরাত্রির কবিতা নামক কাব্য, যা প্রতিরোধ যুগের সাহিত্য হিসাবে মূল্যবান।

মহিলা কবি মাই উয়ান সিক এবং বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ও কবি ই ধুয়াং সু আরো দুটি গণনীয় নাম। শেষোক্তের জীবনের সৌরভ উপন্যাস ও ভোরের ভাষা কবিতা গ্রন্থ স্মরণীয় সাহিত্য কীর্তি বলে আজও স্বীকৃত। সকলেই জানেন আশা করি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দারুণ এক গৃহযুদ্ধে কোরিয়া বিভক্ত হয় এবং তখন থেকে উত্তরে কম্যুনিষ্ট ও দক্ষিণে জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদিও কোরিয়ার ভাষা সাহিত্য ও জীবনাদর্শ প্রায় একই আছে। অবশ্য তার আধুনিকতম সাহিত্যের খবর আমরা এখনো পর্যন্ত কমই পেয়েছি বা পাই।

বর্মার সাহিত্যও প্রাচীনতার দিক থেকে কোরীয় সাহিত্যেরই প্রায় সমসাময়িক। দ্বাদশ শতকে নির্মিত মন্দির ও প্যাগোডায় যে সব শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতেই পাওয়া যায় তার আদি কালের গদ্য ও পদ্য রচনার নিদর্শন। এছাড়া বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র ও ইতিহাস বিষয়ক প্রাচীন তালপাতার পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে প্রচুর, যার সামান্যই এখনো পর্যন্ত বই আকারে ছাপা হয়েছে। ১৫০০ থেকে ১৭৫২ পর্যন্ত এরপর চলে একই সঙ্গে দরবারী কবিতা ও পণ্ডিতী শাস্ত্র রচনার যুগ। হিন্দী চৌপাই ও ফার্সি রুবাইয়ের অনুরূপ একশ্রেণীর ক্ষুদে কবিতার বিশেষ আদর ছিল বর্মায়। তার মাধ্যমে প্রেম, বুদ্ধভক্তি, সংসারের অনিত্যতা ইত্যাদি বিষয়ক তত্ত্ব জ্ঞানই প্রচার করা হত প্রধানত।

বিশুদ্ধ কবিত্বও অবশ্য উপেক্ষিত হত না ষোল আনা। আর গদ্য লেখায়

জটিল দার্শনিক তত্ত্ব, মূলত নির্বাণ কর্মফল ও মোক্ষ সম্পর্কীয় তত্ত্বাদিকেই গুরুত্ব দেওয়া হত। কবিতা লেখকরা সবাই অনামা, যদিও গদ্য লেখকদের মধ্যে সিন রথসার, সিন শীল বংশ, পরে থায়াজা প্রভৃতির নাম জানা যায়। সিংহলী মহাবংশ গ্রন্থের একটি বর্মী ভাষ্য রচিত হয় সপ্তদশ শতক নাগাদ। উ (উত্তম) কাজা [১৭১৪-৮০] এরপর লেখেন তাঁর নব্য ইতিহাস, যা ১৮৩২-এ রাজা বাগিয়াদের আদেশে কাঁচ প্রাসাদের ইতিবৃত্ত নামে সংশোধিত হয়।

১৮৫২ নাগাদ একটি নূতন সাহিত্য সৃষ্টিমূলক আন্দোলন দেখা দেয় ব্রহ্মদেশে। আর তখন থেকেই শুরু হয় কবিতায় গানে ও নাটকে নূতন ধারা। নৃত্যগীতবহুল রাম কাহিনী ও জাতক কাহিনী নিয়ে লেখা পালাগান বর্মায় প্রচলিত ছিল বহুকাল থেকেই। এইসব পালার নাম ছিল নিবাত কিন ও হাস। এ সবের আধুনিকীকরণ শুরু হল এ সময়। আর হল ইয়াগান নামে লম্বিত পর্বের নূতন কবিতা লেখাও। কিন্তু ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক অস্ত্রবলে পরাভূত হয়ে বর্মা গেল ইংরেজের কবলে। তার ফলে তাঁর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা গেল, যদিও বাইরের জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগের সুযোগ বাড়ল এবং তা থেকেই এল নূতন সাহিত্য সৃষ্টির জোয়ার। জাপানের দখলদারিতে কোরিয়ায় সাহিত্যিকের কণ্ঠরুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু ভারতে ও বর্মায় ইংরেজাধিকারের মধ্যেই সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে সবচেয়ে বেশী।

উনিশ শতকে অনেক পালা নাটক ছাপা হল, লেখা হল বহু গল্প উপন্যাস, যার পরিচয় বাইরের মানুষ পান নি খুব বেশী। তারপর ১৯৩০-এ দেখা দিল থিৎশান আন্দোলন, যার ফলে ইংরেজীর পরিবর্তে বর্মী ভাষা সারা দেশে প্রবর্তিত হল শিক্ষা ও প্রশাসনের মাধ্যমরূপে। লেখাও হতে থাকল নূতন জাতীয় উদ্দীপনাপূর্ণ প্রচুর নাটক ও উপন্যাস। উ (উত্তম) কিন উ এবং উপন নু দেখা দিলেন বিশিষ্ট দুই নাট্যকার রূপে। প্রথমের পারপাহাইন এবং দ্বিতীয়ের বিজয় নাটক বর্মার প্রথম আধুনিক নাটক, যেমন ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী থাকিন নুর ব্যাঘ্রমানব প্রথম আধুনিক উপন্যাস। এইসব নাটক উপন্যাস ও কিছু সংখ্যক আধুনিক বর্মী কবিতার ইংরেজী অনুবাদ একালের জিজ্ঞাসু পাঠকরা অনেকেই আশা করি পড়েছেন।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে ফিলিপিন মালয়েশিয়া ও সিংহল [শ্রীলংকা] সম্বন্ধেও দু-একটি কথা বলা দরকার। ফিলিপিন বহুদিন স্প্যানিশদের উপনিবেশ ছিল, তারপর যায় মার্কিন অধিকারে। প্রথম ধাপে

স্প্যানিশে ও পরের ধাপে মার্কিনী ইংরেজীতে ওখানকার মানুষ সাহিত্য রচনা করেছেন। সে সাহিত্যে বৈশিষ্ট্য বা মৌলিকতার নামগন্ধও নেই, তাই তা নিয়ে আলোচনারও কিছু নেই। মালয় সিঙ্গাপুর সারাওয়াক ও বৃটিশ বোর্ণিও নিয়ে ১৯৬৩ সালে তৈরি হয় মালয় ফেডারেশন। সিঙ্গাপুর পরে তার বাইরে চলে গেছে এবং বাকীটার নাম হয়েছে মালয়েশিয়া। এখানকার অধিবাসীরা বেশীর ভাগই চীনাভাষী ও তামিলভাষী এবং এই দুই ভাষাতেই তাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন, যা ফিলিপিন সাহিত্যের মতই নিজস্বতা ও বৈশিষ্ট্যহীন।

সিংহলী সাহিত্য অবশ্য নিজস্বতার গৌরবেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, কেননা লোকসাহিত্য ও শিষ্ট সাহিত্য দুই বিভাগেই তার ভাণ্ডারে যথেষ্ট ঐশ্বর্য সঞ্চিত হয়েছে একাদশ ও দ্বাদশ শতক থেকে। লোকসাহিত্য বিভাগের রচনাগুলি অনেকটা বাংলা মঙ্গল কাব্যের মত, যার কাহিনী দেবতা এবং মানুষের পারস্পরিক সংঘাত ও সম্মেলন নিয়ে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে পট্টনা হল্লা ও নানুমুরা হল্লা প্রসিদ্ধ। রামায়ণ হিন্দু পুরাণ ও বৌদ্ধ জাতক নিয়েও রচিত হয়েছে বহু কাব্য। জাতক কাহিনী নিয়ে কবি ধর্মানন্দ রচিত কভমতুহার বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল এক সময়।

বিশুদ্ধ লৌকিক প্রেম কাব্যও লেখা হয়েছে, যার মধ্যে রাজা পরাক্রম বাহু রচিত কপাসলুমিনা এবং শ্রীরাহুল রচিত কাব্য শেখারতে বাস্তব মানব মানবীর মনস্তত্ত্বসম্মত মিলন বিরহ গাথাই স্থান পেয়েছে। কোন অলৌকিকতা প্রবেশ করতে পারেনি কোথাও। এইসব কাব্য কাহিনীর সঙ্গেই লেখা হয়েছে অনেক খণ্ড কবিতা ও গান, যার লেখক তালিকায় গ্যাসকন নামক পর্তুগীজ কবিয়াল থেকে বলভত্তুলা নাম্নী মহিলা কবি পর্যন্ত বহুজনের দেখা মেলে। এছাড়া মধ্যযুগ থেকে দীপবংশ ও মহাবংশ শ্রেণীর ইতিহাসগ্রন্থ এবং শাস্ত্রার্থ বিচারমূলক বহু তত্ত্বগ্রন্থও লেখা হয়েছে। পরের পর পর্তুগীজ ডাচ ও ইংরেজ অধিকার যদিও সিংহলের একালীন সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টিকে সহায়তা করেছে, তবু এখনো পর্যন্ত সার্থক সৃষ্টিমূলক সাহিত্য অল্পই তৈরি হয়েছে সেখানে। অন্তত দেশের বাইরে প্রচার হয়নি কোন গণনীয় লেখা বা লেখকেরই।

আঠাশ ॥ সংস্কৃত সাহিত্য

এবার আমরা আসছি ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনায়। বৈদিক আর্যদের আদিগ্রন্থ ঋক্‌বেদ হল ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন, যা সংকলিত হত শুরু করে খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দ নাগাদ। পরবর্তী হাজার বছরে সংকলিত হয় অন্যান্য বেদ এবং তাদের ভাষ্যরূপে রচিত হয় সূত্র ও উপনিষদগুলি। কিন্তু এই প্রবন্ধ মালার শুরুতেই আমরা ঐ সব বইয়ের কথা সংক্ষেপে বলেছি। এখানে তার আর পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তাছাড়া ওরা বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবে আলোচনীয়ও হয়ত নয়। যথার্থ সাহিত্য হল আমাদের মহাকাব্য দুটি, রামায়ণ ও মহাভারত, যা যথাক্রমে ঈশ্বর পুরুষ বলে অভিহিত রাম ও কৃষ্ণ জীবন কাহিনীর কাব্যরূপ আর সেই কারণেই যা হিন্দু ভারতে শুধু কাব্য হিসাবে নয়, পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মর্যাদাতেও গৃহীত। রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে উত্তর ভারতীয় আর্যদের দক্ষিণামুখী অভিযান, যার নেতৃত্বে ছিলেন রাম, আর মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে আর্য জাতি-গোষ্ঠীর গৃহযুদ্ধ, যার কেন্দ্রীয় পুরুষ ছিলেন কৃষ্ণ এবং তিনি আর্য অনার্যে শুভ সম্মেলন ঘটিয়ে বর্তমান হিন্দু সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে যান।

প্রেম, মনুষ্যত্ব, ত্যাগ ও শৌর্যের আদর্শে দুটি মহাকাব্যই অতুলনীয়। মহাভারত তদুপরি উচ্চ রাজনীতিক বিচারবুদ্ধি ও দার্শনিক প্রজ্ঞার জন্যেও প্রসিদ্ধ। প্রথমখানি বাল্মীকির ও দ্বিতীয়খানি ব্যাসের রচনা বলে প্রচারিত এবং ধরা হয় যে ও-দুটি খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দ নাগাদ লিখিত। রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গেই উল্লেখ্য ভাগবত হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ এবং অন্যান্য পুরাণের নামও। মহাভারতে আমরা পাই কৃষ্ণ-জীবনের মধ্য পর্বের ইতিহাস, আর ভগবতে ও হরিবংশে পাই যথাক্রমে তাঁর প্রথম ও শেষ জীবনের বৃত্তান্ত। ভাগবত বৈষ্ণবদের আদিগ্রন্থ, সেই কারণেই তা ভক্তিশাস্ত্র বলে বিবেচিত। পুরাণগুলি ধর্মনীতি ও লৌকিক আচরণবিধি শেখানর উদ্দেশ্যে বিচিত্র কাহিনী এবং তত্ত্ব কথার মাধ্যমে লিখিত হয়েছে। কোন কোন পুরাণ, যেমন ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ যথেষ্ট প্রাচীন নয় বলে মনে করেন বিশেজ্ঞরা।

কৃষ্ণ জীবনের প্রসঙ্গে রাধার নাম আমরা পরবর্তীকালের সাহিত্যে যদিও একই সঙ্গে উচ্চারিত হতে দেখি। মহাভারত ভাগবত হরিবংশ শ্রেণীর প্রামাণ্য বইগুলিতে তাঁর উল্লেখ নেই। মূল পুরাণ সংখ্যায় আঠারখানি, তাছাড়া আছে অনেক উপপুরাণ। সবই বেদব্যাস রচিত বলে প্রচারিত। বলা বাহুল্য তা সম্ভব নয় কোন মতেই। এই জন্যেই কেউ কেউ মনে করেন বেদব্যাস একটি বংশপদবী, ব্যক্তিনাম নয়।

খাঁটি লৌকিক জীবন নিয়ে কাব্য, নাটক, উপন্যাস, খণ্ড কবিতা ও তত্ত্ব বিচারমূলক বই লেখা শুরু হয় সংস্কৃত ভাষায় খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী থেকে এবং তার ধারা একটানা ৮ শতক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তারপর হর্ষবর্ধনের মৃত্যু ও হিন্দু শাসনের অবসান হলে, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের দ্রুত অবক্ষয় শুরু হয় এবং একাদশ শতক থেকে তা স্তব্ধই হয়ে যায় বললে চলে। তখন ওঠে প্রাদেশিক মাতৃভাষাগুলি এবং তাই ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে সাহিত্যের মাধ্যম। এই অল্পাধিক আটশো বছরে সংস্কৃত ভাষায় দেখা দেন অশ্বঘোষ [১ শতক], ভাস [২ শতক], কালিদাস [৪ শতক], ভবভূতি [৭ শতক] বাণভট্ট [৭ শতক] শ্রীহর্ষ, ভারবি, মাঘ, রাজশেখর, ভর্তৃহরি [সকলেই ৮ শতক] প্রমুখ মহান সাহিত্য স্রষ্টা।

অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ কাব্য এবং শারিপুত্র প্রকরণ নাটক লেখেন। ভাস লেখেন স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিমা, বালচরিত, চারুদত্ত, মধ্যম-ব্যায়োগ প্রভৃতি নাটক। অশ্বঘোষ ও ভাসের রচনা বহুকাল পর্যন্ত বিলুপ্ত থাকার পর বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় প্রথম আবিষ্কৃত হয়। অশ্বঘোষ মহান দার্শনিক কবি, ভাস জীবনবেত্তা নাট্যকার। তাঁর বাসবদত্তার প্রভাব কালিদাসে লক্ষ্য করা যায়। চারুদত্তের বিষয়বস্তু নিয়েই পরবর্তীকালে শূদ্রক লেখেন মৃচ্ছকটিক নাটক। মধ্যমব্যায়োগ চমৎকার একাঙ্ক নাটক, ভীম-ঘটোৎকচ যুদ্ধ এবং ভীম-হিড়িম্বা মিলন নিয়ে লেখা হয়েছে উপভোগ্য এই একাঙ্ক নাটকটি।

কালিদাস ভারতীয় কাব্য ও নাট্য-সাহিত্যের মুকুটহীন সম্রাট। ঋতু সংহার মেঘদূত কুমারসম্ভব রঘুবংশ তাঁর অবিস্মরণীয় কাব্য। মালবিকাগ্নিমিত্র শকুন্তলা বিক্রমোর্বশী তাঁর অতুলনীয় নাটক। সৌন্দর্য ও মানব কল্যাণের প্রবক্তা কালিদাস প্রেম ও প্রকৃতির কবিরূপে জগদ্বিখ্যাত। ভবভূতির মালতী মাধব ও উত্তর রামচরিত, শ্রীহর্ষের রত্নাবলী, নাগানন্দ, বিশাখদত্তের মুদ্রা রাক্ষস,

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার সংস্কৃত ভাষার আরো কতকগুলি স্মরণীয় নাটক। এর মধ্যে মুদ্রারাক্ষস মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের কাহিনী নিয়ে রচিত। মৃচ্ছকটিকের নায়িকা বসন্তসেনা একজন রূপোপজীবিনী। নাগানন্দে বর্ণিত হয়েছে মাতার বন্ধন মুক্তিতে গরুড়ের দুষ্কর সংগ্রামের ইতিহাস। বেণীসংহারে আছে দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিবাদে দুঃশাসনের রক্তপানের কাহিনী। বলা নিষ্প্রয়োজন যে শকুন্তলার মাধুর্যে বা বিক্রমোর্বশীর গাম্ভীর্যে উন্নীত হয় নি আর কোন নাটকই, যদিও নিজস্ব ভাবে অতুলনীয় প্রত্যেকটি বইই। ভারবির কিরাতার্জুনীয়, মাঘের শিশুপাল বধ, হর্ষদেবের নৈষধ, ভট্টির ভট্টিকাব্য সংস্কৃত ভাষার কয়েকখানি সুবিদিত কাব্য। অলংকার বিন্যাসের কড়াকড়ি ও কাব্যরসের স্বল্পতার জন্যে এসব কাব্য আধুনিক পাঠকের কাছে বেশ একটু বিরস লাগে। মেঘদূতের রসাবেশ বা কুমারসম্ভবের ভাবগাম্ভীর্য এদের কোথাও মেলে না। মেলে না রঘুবংশের প্রসন্ন প্রাঞ্জলতা।

সংস্কৃত নাট্য ও কাব্য সাহিত্যের গতিবিধি অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মকানুন দিয়ে এত কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত যে কোন কবিই তার ব্যতিক্রম করতে পারেন না। নাটকে নারী ও অনুন্নত জনকে প্রাকৃত ভাষায় কথা বলতে হবে। নাটকে কোন দ্বন্দ্ব সংঘাত, হত্যা বা মৃত্যু দেখান চলবে না, বা তাকে বিয়োগান্ত পরিণতিতে নেওয়া চলবে না। কাব্যেও ঈশ্বর বা ঈশ্বরোপম মানুষের মহিমাত্মক কাহিনীর অবতারণা করতে হবে এবং সেজন্যে এমন সমস্ত রীতি পদ্ধতির আনুগত্য স্বীকার করতে হবে, যা অলঙ্ঘনীয়। আশ্চর্যের কথা যে এত কড়াকড়ির মধ্যেও এই সাহিত্যে মহান কবি এবং নাট্যকার উঠেছেন এত অধিক সংখ্যায়। সংস্কৃত ভাষায় আমরুর প্রেম-শতক এবং ভর্তৃহরির বৈরাগ্য শতক নামে দুটি বিখ্যাত খণ্ড কবিতা সংগ্রহ আছে, যা সত্যই সুন্দর ও সুখপাঠ্য।

এবারে বলি সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের কথা। বাণভট্টের লেখা কাদম্বরী সংস্কৃত ভাষার একখানি বিখ্যাত উপন্যাস। ঠিক আধুনিক অর্থে উপন্যাস অবশ্য নয়, একে বলা যেতে পারে কাব্যধর্মী গদ্য আখ্যায়িকা, কিন্তু অপূর্ব। বাণভট্টের হর্ষচরিতও সম্রাট হর্ষবর্ধনের জীবন নিয়ে রচিত রোমান্স হিসাবে সুন্দর। দণ্ডীর দশকুমার চরিতও চমৎকার আখ্যায়িকা। এছাড়া কথা-সরিৎসাগর ও দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা নামে আছে সংস্কৃত ভাষায় দুখানি গল্প

সংগ্রহ, যার মধ্যে লৌকিক অলৌকিক দুই শ্রেণীরই বিচিত্র খোসগল্প সংগৃহীত হয়েছে। কথাসরিৎসাগর গুণাঢ্য রচিত বৃহৎ কথা বইয়ের সংক্ষিপ্ত পুনর্লিখন বলে অনুমান করেন অনেকে। জীবজন্তুর রূপকে লেখা বিষ্ণুশর্মার উপকথা সংগ্রহ পঞ্চতন্ত্রও সুখ্যাত।

এই সব গল্পই যে গড়াতে গড়াতে পৃথিবীর নানাদিক দেশে ব্যাপ্ত হয়েছে, এ কথা ফোকলোর বা লোকবিদ্যার সন্ধিৎসু পাঠকরা অবশ্যই জানেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভাগেও সংস্কৃত ভাষায় ঐশ্বর্য কম নেই। আস্তিক্য ও নাস্তিক্য উভয়বিধ দর্শনের কথা আগেই বলেছি। ভরতের [২ শতক] নাট্যশাস্ত্র, কৌটিল্যের [৪ শতক] অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের [৪ শতক] কামশাস্ত্র, চরক [৬ শতক] ও সুশ্রুতের [৭ শতক] সংহিতা, ভাস্করাচার্যের সূর্যসিদ্ধান্ত [৮ শতক], দণ্ডীর [৮ শতক] কাব্যাদর্শ, বিশ্বনাথের সাহিত্য-দর্পণ [৮ শতক] ভারতীয় মনীষার নিদর্শন হিসাবে আজও সকলের বিস্ময় উদ্রিক্ত করে। পাণিনির [২ শতক] অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ ও তার কাত্যায়নকৃত ভাষ্যও বিদ্বৎ সমাজে সবিশেষ সম্মানিত। এ ভিন্ন সঙ্গীতশাস্ত্র, যোধশাস্ত্র [যুদ্ধ বিজ্ঞান], পশু চিকিৎসা এবং সামাজিক কৃত্যাকৃত্য সম্বন্ধে আছে অজস্র বই ও তার প্রত্যেকটির পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা টিপ্পনী, যা একাদিক্রমে ১৫ ও ১৬ শতক পর্যন্ত লেখা হয়েছে।

প্রত্নেতিহাসবিদদের অনুমান যে মধ্য এশিয়ার ভল্গা তীরবর্তী কোন এলাকা থেকে বৈদিক আর্যেরা প্রথম ভারতে আসেন এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধু উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন করেন খ্রীঃ পূঃ ১৭০০ অব্দের কাছাকাছি কোন সময়। আর এখানে বসবাসকালেই ঋগ্বেদ সংকলিত হয় খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ নাগাদ। ঋগ্বেদে আমরা যে ভাষার নিদর্শন পাই, তা তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, না এখানে এসে আহরণ করেছিলেন, তা জানা যায় না। তবে বৈদিক সংস্কৃতই যে ক্রমশ রূপান্তরিত হতে হতে সূত্র উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদির যুগে এসেছে এবং সেখান থেকে ভাস কালিদাস প্রমুখের হাতে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে, একথা সুবিদিত। পৃথিবীর সুপ্রাচীন একটি ঐশ্বর্যময়ী ভাষা হলেও, সংস্কৃত বোধহয় কোনদিন কথ্য ভাষা ছিল না, তা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলন ও ধর্মাচরণের মাধ্যম। সংস্কৃত নাটকেও আমরা সর্বত্র দেখি নারী এবং সাধারণ মানুষের মুখে কথ্য প্রাকৃত ভাষা বসান হয়েছে। মনে করলে ক্ষতি নেই যে প্রাকৃতই ছিল জনসাধারণের ভাষা এবং তা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল আর্য অভিযানের আগে থেকেই।

দুঃখের বিষয় বেদপূর্ব ভারতীয় সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরাপ্পায়, তাতে কোন পূর্ণাঙ্গ লেখন পাওয়া যায়নি। পোড়া মাটির মোহরে উৎকীর্ণ কিছু কিছু হরফ পাওয়া গেছে শুধু, যার মর্মোদ্ধার সম্ভব হয়নি এখনো। হয়ত এগুলি আদিমতম প্রাকৃত হরফই। মোটের ওপর প্রাকৃতই যে শোধিত অর্থাৎ সংস্কৃত হয়ে পণ্ডিতী ভাষার রূপ ধরেছে, এমন অনুমানও করেন কেউ কেউ। বলা দরকার যে অঞ্চল ভেদে প্রাকৃতকে চার শাখায় ভাগ করা হয়: যথা, শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী ও পৈশাচী।

এদের মধ্যে বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি মাগধী প্রাকৃত থেকে। সম্রাট অশোকের গিরনার অনুশাসনে [খ্রীঃ পূঃ ৩ অব্দ] পাওয়া গেছে প্রাচীনতম প্রাকৃতের নিদর্শন। ব্রাহ্মী হরফে খোদিত ঐ লেখনের এবং অন্যান্য অশোক লিপির পাঠোদ্ধার করে প্রিন্সেপ স্মরণীয় হয়েছেন। বৈদিক

আর্যদের লেখা পড়ায় কি হরফ চলত জানা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগরী হরফ নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালের সংযোজন। এই কারণেই অনেকে মনে করেন, মহেঞ্জোদাড়ো হরফই হল আমাদের আদি ও অকৃত্রিম হরফ।

প্রাচীন ভারতীয় মনীষা ও সৃজনী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি যদিও সংস্কৃত ভাষাতেই গ্রন্থিত হয়েছে, তবু মনে রাখতে হবে যে প্রাকৃতেও ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়েছে অনেক এবং প্রাকৃতের মতই উত্তর ভারতে চলত আরো যে একটি লোকভাষা, পালি, উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্যের গৌরবে তাও অগণনীয় নয়। এই দুই সাহিত্যের অন্তঃপুরে একটু তাকান যাক এবার কিন্তু তার আগে বলে রাখা দরকার যে ব্রাহ্মণ্য ভারতে জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্যে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার আদৌ স্বীকৃত ছিল না। তাঁদের তফাতে রাখারই সতর্ক ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধেরাই প্রথম বিদ্যাকে সর্বজনের আয়ত্তে আনার প্রয়াস করেন, একদিকে নালন্দা তক্ষশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা সকলের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়ে, অন্যদিকে পালি ও প্রাকৃত লোকভাষাকে শিক্ষা ও সাহিত্যের মাধ্যম রূপে গ্রহণ করে। বুদ্ধদেব সম্ভবত পালিতেই তাঁর উপদেশ প্রচার করতেন, তাই পালিতেই বৌদ্ধদের বিপুল ধর্মীয় সাহিত্য রচিত হয়েছে। অবশ্য মহাবস্তুঅবদান, অবদানশতক, দিব্যাবদান, ললিতবিস্তর প্রভৃতি বই সংস্কৃতেই লেখা।

যাই হোক পালি ধর্ম সাহিত্য বিনয়, সুত্ত ও অভিধর্ম, এই তিন ভাগে বিভক্ত, তাই তার নাম ত্রিপিটক। বিনয় পিটকে আছে বুদ্ধ জীবনের আদি তথ্যসমূহ। সুত্ত পাঁচটি পিটকে বিভক্ত। এই পঞ্চ পিটক হল দীর্ঘ নিকায়, মজ্‌ঝিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় ও খুদ্দ নিকায়। আর অভিধর্মে আছে জীবন মৃত্যু সুখ দুঃখ ও নির্বাণ সম্বন্ধীয় তত্ত্ববিচার। এর মধ্যে খুদ্দ নিকায়ই হল সাহিত্য হিসাবে অগ্রগণ্য, কারণ এই বিভাগেই পড়ে ধম্মপদ থেরীগাথা ও জাতক গ্রন্থমালা। ধম্মপদ হল নীতিমূলক সুভাষিতের সংগ্রহ, অনেকটা এপিকটেটাস ও কনফুৎসের তত্ত্বকথাগুলির মত। থের গাথা এবং থেরী গাথা হল থের অর্থাৎ স্থবির বা সিদ্ধ বৌদ্ধ নরনারীর জীবন বেদনার রসে সঞ্জীবিত অনুপম কবিতা সংগ্রহ।

জাতক হল বুদ্ধের বিভিন্ন জন্মের বৃত্তান্ত সম্বলিত বিচিত্র গল্পের সমষ্টি। গল্পের মোট সংখ্যা প্রায় ৫৪৭টি এবং তাতে পুরাণেতিহাস ও লোকপ্রত্যয়ের রকমারি কাহিনী সংকলিত হয়েছে। কথাবস্তু হিসাবে জাতকের গল্পগুলি

অধিকাংশই অতুলনীয়। এ ছাড়া পালি ভাষায় আছে মিলিন্দো পনহো বা মিলিন্দ প্রশ্ন নামক দার্শনিক বই, যাতে ব্যাকট্রিয় গ্রীক রাজা মিনাণ্ডার ও নাগসেনের কথোপকথনের মাধ্যমে বৌদ্ধদর্শন ব্যাখ্যাত হয়েছে। বুদ্ধঘোষ রচিত আটট কথা বা অর্থ কথা আর একখানি মূল্যবান ভাষ্যগ্রন্থ। এছাড়া আছে দীপবংশ ও মহাবংশ নামক দুইখানি সিংহলের ইতিহাস, যা পালি ভাষার গৌরব স্বরূপ। লাঢ়ের রাজপুত্র বিজয় সিংহের লঙ্কা জয়ের কাহিনী আছে শেষোক্ত বইয়ে। যদিও এই লাঢ় বঙ্গভূমির রাঢ়, না গুজরাট, তা নিয়ে তর্ক আছে।

খ্রীঃ পূঃ ৬ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় ৫ শতক পর্যন্ত ঈষদূণ এই হাজার বছরে উপরোক্ত পালি গ্রন্থগুলি রচিত। তার মধ্যে জাতকের অনেকাংশ এবং মহাবংশ ও দীপবংশ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের। অবশিষ্টগুলি বুদ্ধ সম-সাময়িক কাল থেকে মৌর্যযুগের মধ্যে লিখিত। প্রাকৃতের প্রাচীনতম নিদর্শন আমরা পাই অশোকের অনুশাসনে, একথা আগেই বলেছি। কিন্তু বিশাল তত্ত্বসাহিত্য যা জৈনরা লিপিবদ্ধ করেন প্রাকৃতে, তাই হল প্রাকৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই তত্ত্বসাহিত্য ১১ খানি অঙ্গশাস্ত্র, ১২ খানি উবংগ [উপাঙ্গ], ৬খানি ছেয়সুত্ত [ছেদসূত্র] ও ৪ খানি মূল সুত্তে বিভক্ত। এ সবের মধ্যে পুগ্‌দলের তত্ত্ব এবং মোক্ষ বা অনেকান্তের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। ব্যাখ্যাত হয়েছে আদিনাথ ও পার্শ্বনাথ প্রমুখ তীর্থংকরদের জীবন ও তপস্যার প্রসঙ্গ। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ জীবন দর্শনের অন্তর্নিহিত তত্ত্ববস্তুর সঙ্গে এইসব তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা আকর্ষণীয় হলেও, বর্তমান প্রবন্ধে তা বোধহয় অনাবশ্যক।

জৈনেরা রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদিকে কিন্তু উপেক্ষা করেন নি। তাঁদের মত করে পুনর্লিখন করেছিলেন এ সবের। বিমল সূরী রচিত জৈন রামায়ণ [৪ শতক] অদ্যাবধি বিশেষ সমাদৃত গ্রন্থ। পৈশাচী প্রাকৃতে লেখা গুণাঢ্যের বৃহৎকথা থেকে পরবর্তীকালে সংস্কৃতে কথা সরিৎসাগর রচিত হয়েছিল বলেও অনুমান করেন অনেকে, যদিও গুণাঢ্যের বই পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ সাহিত্যেও প্রাকৃতের স্থান এবং দান নগণ্য নয়। ভাস [২ শতক] ও কালিদাসের [৬ শতক ?] নাটকে নারী ও সাধারণ মানুষের কথাবার্তায় প্রাকৃতের ব্যবহার দেখা যায় প্রচুর। এ ছাড়া ৬ শতকে প্রবীরসেন প্রাকৃতে সেতুবন্ধ বা রাবণবধ কাব্য লেখেন। ৮ শতকে গৌড়রাজ যশোধর্মা ও কাশ্মীর

রাজ ললিতাদিত্যের যুদ্ধ নিয়ে লেখা হয় কবি বাকপতির গৌড়বহ [গৌড়বধ] কাব্য। রাজশেখর ৮ শতকে লেখেন কর্পূর মঞ্জরী নাটক, যা আদ্যোপান্ত প্রাকৃতে লিখিত। সট্টক নামে অভিহিত এই নাটকখানি মিলনান্তক কমেডী হিসাবে যথার্থই উপভোগ্য। ৮ শতকেই হাল লেখেন গাহা সত্তসই [গাথা সপ্তশতী], যার অনুকরণে পরে গোবর্ধন লেখেন আর্য-সপ্তশতী।

গোবর্ধনের বই অবশ্য প্রাকৃতে নয়, খাঁটি সংস্কৃতে। গাথা সপ্তশতীর প্রেম কবিতা এবং কবি বাকপতির চূর্ণ কবিতাবলী অব্যবহিত পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় যে গীতিকবিতা লেখার ঢেউ আসে, তাতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা জোগায়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে গাথা সপ্তশতী গ্রন্থেই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক দু-একটি পদের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত বক্তব্য যে কালিদাস সমসাময়িক এবং বিক্রমাদিত্যের বিখ্যাত নবরত্নের অন্যতম বররুচি লেখেন প্রাকৃত ভাষার প্রথম ব্যাকরণ প্রাকৃত প্রকাশ, যা এখনো প্রামাণ্য বলে গৃহীত।

ত্রিশ ॥ ভারতীয় সাহিত্য : মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে ॥

খ্রীষ্টীয় ৮-৯ শতক থেকে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রতিপত্তি কমতে থাকে এবং অন্তবর্তীকালের বিভিন্ন আঞ্চলিক অপভ্রংশ থেকে আজকের ভারতীয় মাতৃ-ভাষাগুলি ধীরে ধীরে মাথা তুলতে থাকে। তারপর ১০ শতক থেকে অদ্যাবধি এই সব ভাষাতেই ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে সাহিত্য রচিত হয়ে চলেছে। বলে রাখা দরকার যে এই অল্পাধিক হাজার বছরের মধ্যে প্রথম আটশো বছরকে ধরা হয় ভারতীয় সাহিত্যের সেকাল রূপে, আর ১৯ শতকে বিদেশী শাসন ও শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে জন্মায় যে সাহিত্য, তাকে আমরা বলি একালের সাহিত্য। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই দুই কালের সাহিত্যের মধ্যে সুস্পষ্ট একটি প্রাণগত পার্থক্য এসে পড়েছে স্বাভাবিক ভাবেই, যা একটু নজর করলেই বোঝা যায়। তথাকথিত সাবেকী বা প্রাচীন সাহিত্য ভাষার ক্ষেত্রে যতই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকুক, বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গী ও মননশীলতার দিক থেকে তাদের মধ্যে ছিল গভীর একটি আত্মিক যোগ। সেই কারণেই তার রূপটা ছিল অনেকটা সর্বভারতীয়, আর আধুনিক কালের সবগুলি সাহিত্যই সেই তুলনায় হয়ে পড়েছে অনিবার্যভাবে কিছুটা করে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত।

বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। উত্তর প্রদেশে কবীর, দাদূদয়াল, পাঞ্জাবে নানক, গুজরাটে মীরাবাঈ, নরসী ভকত, মহারাষ্ট্রে তুকারাম, নামদেব, বাংলায় চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, শেখর, আসামে শঙ্করদেব, মাধবদেব প্রমুখ কবি একই ভাবের প্রেমভক্তিমূলক পদ রচনা করেছেন। দক্ষিণ ভারতের আলাবর বৈষ্ণব ও নায়নমার শৈব কবিদের, তিরুবল্লুবর, আপ্পর, অণ্ডাল, বামন প্রমুখের রচনার সঙ্গেও পাওয়া যায় তাঁদের আশ্চর্য রকম ভাবগত ঐক্য। তামিলনাদে কম্বন কবি লিখেছেন রামায়ণ, যা অনুবাদ নয়, মূলের ভাবানুসরণ মাত্র। বাংলায় কৃত্তিবাস, ওড়িশায় রামদাস, হিন্দীতে তুলসীদাস, অসমিয়ায় শঙ্করদেব, নেপালে ভানুভক্ত একইভাবে করেছেন রামায়ণের পুনর্লিখন। হিন্দীতে মালিক মুহম্মদ জায়সী লিখেছেন পদুমাবৎ কাব্য, যা মেবার মহিষী পদ্মিনীর

কাহিনী। বাংলায় আলাওল লিখেছেন ঐ বই অবলম্বনে একই কাহিনী। বাংলার বেহুলা লখীন্দর আসাম উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের কাব্যগাথায় কীর্তিত হয়েছেন। গোরক্ষনাথ মীননাথ প্রমুখ নাথগুরুদেরও বিহার উত্তর প্রদেশ থেকে নেপাল পর্যন্ত ব্যাপ্তি হয়েছে সাহিত্যের মাধ্যমে। হীর রঞ্ঝা ও লোর চন্দ্রাণী শ্রেণীর লোক গাথাগুলিও পাঞ্জাব থেকে ভাসতে ভাসতে ভারতের নানা অঞ্চলে ছড়িয়েছে। ছড়িয়েছে নাভাজীর হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থ বাংলা ওড়িশা ও আসামে।

সে যুগে ত্বরিতগতি যানবাহন ছিল না, গমনাগমনের পথও আজকের হিসাবে ছিল দুর্গম, সেদিন ভ্রাম্যমাণ বণিক তীর্থযাত্রী ও সাধুসন্তের মাধ্যমেই এই ভাবে সাহিত্যের আদান প্রদান হয়েছে, এটা বিস্ময়কর। আসলে নদী পাহাড় ও তীর্থস্থানগুলিকে কেন্দ্র করে একটা সর্বভারতীয় মানসিকতা গড়ে উঠেছিল দূর অতীতেই। সেটা তৈরী হয়েছিল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে। পরের ধাপে সাম্যবাদী বৌদ্ধধর্ম ও পালি প্রাকৃত ভাষা সেই মানসিকতাকে দিয়েছিল একটা সমাজসম্মত বাস্তব রূপ। তারপর যখন দেশে মুসলিম শাসন এল এবং জনসমষ্টি হিন্দু মুসলমান দুটি পৃথক শ্রেণীতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল, তখন সারা ভারতে প্রায় একই সময় উঠল সমন্বয়কামী ভক্তিধর্ম। রামানন্দ নানক চৈতন্য কবীর তুকারাম শংকরদেব মীরা প্রমুখ এই ভক্তিধর্মের প্রবক্তারা অনেকেই ছিলেন কবি। তাঁরা এবং তাঁদের অনুগামীরা যে সাহিত্য রচনা করলেন, মধ্যযুগের তিন চারশো বছর ধরে, প্রাণধর্মে তা এক ও অভিন্ন না হবে কেন? তাই দেখা যায় গীতগোবিন্দের পদ শিখদের গ্রন্থসাহেবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। আবার জপজীর ভজন চলে এসেছে বিহার উত্তর প্রদেশে।

পূর্বাঞ্চলে আসামে ওড়িষায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পদ মুখে মুখে ছড়িয়েছে। দক্ষিণ থেকে রামানুজ নিম্বার্কের দর্শন এবং আলোয়ার নায়নমারদের পদাবলী এসে স্পর্শ করেছে বাঙালীর মনোলোক। বাঙালী গায়ক গেয়েছেন সুরদাসের বাৎসল্যরসের পদ, মীরার ভজন, তুকারামের অভং এবং কবীর ও তুলসীদাসের দোঁহা। সপ্তদশ শতকের হিন্দী সঙ্গীতসংকলন গীতচিন্তামণিতে মরুঙ্গী মরুঙ্গী সোহী [মরিব মরিব সখী] পদটি অনেকেই হয়ত দেখেছেন। লেখকের নাম সেখানে অবশ্য উল্লিখিত হয়েছে খণ্ডী দাস, যা হয়ত চণ্ডীদাসেরই রূপান্তর বিশেষ। রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের চারণ গাথা এবং বাংলার

প্রবাদ প্রবচন বাঁকাচোরা উচ্চারণে সারা ভারতের মুখেই কোন না কোন সময় কে না শুনেছেন? কোনটা এসেছে কোন অঞ্চল থেকে, আদিতে লেখা কোন ভাষায়, তা জানা২ই অবকাশ হয়নি সাধারণ মানুষদের অনেকের। গোটা ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রূপেই তাঁরা নিয়েছেন এদের এবং নিয়েছেন নিজ নিজ ভাষার ছাঁচে ঢালাই করে।

বলে রাখা দরকার যে একালীন অর্থে যাকে রাজনৈতিক ঐক্য বলে, অতীতে ভারতবর্ষে কোনদিনই তা ছিল না। মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটদের যুগ থেকে হর্ষবর্ধন পর্যন্ত, আবার আকবর থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত কোন শক্তিশালী শাসকই কোনদিনই গোটা ভারতকে এক কেন্দ্রীয় শাসনে আনতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও ধর্ম সংস্কৃতি ও জীবন চর্যার ক্ষেত্রে যে গভীর একটি ভাবিক ঐক্য ভারতবর্ষে সুপ্রাচীনকাল থেকে গড়ে উঠেছিল, এ কথা আগেই বলেছি। ইংরেজ শাসনেই প্রথম বাইরে থেকে আরোপিত এক কেন্দ্রীয় শাসন, এক মুদ্রা ব্যবস্থা, ডাক ব্যবস্থা, রেলপথ ও সরকারী ভাষার আয়ত্তে এসে ভারতবর্ষ রাজনীতিক একাত্মতা লাভ করে।

দুঃখের বিষয় নূতন কালের শিক্ষা দীক্ষায় অতীতের সেই ভাবিক ঐক্যের বন্ধনটি ভিতর ভিতর ক্রমশ ঢিলে হতে শুরু করে এবং আঞ্চলিক স্বাধিকারের মনস্তত্ত্ব প্রবল হয়ে উঠতে থাকে তার ফলে। যদিও নূতন কালের জাতীয় আন্দোলন রাজনীতিক ও আর্থনীতিক ঐক্যকেই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য বলে প্রচার করতে থাকে, কার্যত কিন্তু ভাষাগত অপরিচয় আমাদের ক্রমশ দূরেই ঠেলে দিতে থাকে। এর ফলে হিন্দী উর্দু পাঞ্জাবী ওড়িয়া অসমিয়া গুজরাটী মারাঠী তামিল তেলুগু কানাড়ী মালয়ালী প্রভৃতি ভাষায় ইদানীন্তন-কালে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তার বার্তা আমরা খুব কমই জেনেছি। হয়ত বিচ্ছিন্ন ভাবে আমরা পাঞ্জাবী ভাষার গ্রন্থ সাহেব, হিন্দী ভাষার তুলসী রামায়ণ, তামিল ভাষার কুরল হাতে পেয়েছি। মীরা কবীর দাদূ ও রজ্জবালির কিছু পদ গান হিসাবে শুনেছি। মৈথিল শরণ গুপ্ত জয়শংকর প্রসাদ প্রেমচন্দ সুমিত্রানন্দন পন্থ অজ্ঞেয় বাৎস্যায়ন প্রমুখ হিন্দী লেখকের এবং উপেন্দ্র ভঞ্জ ফকিরমোহন সেনাপতি কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী প্রমুখ ওড়িয়া লেখকের কিছু কিছু রচনা অনুবাদে পড়েছি। উর্দু কবি গালিব, হালী ও মালিহাবাদী, কথা সাহিত্যিক কিষণচন্দর উপেন্দ্র আশক এবং অসমিয়া সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সঙ্গেও হয়েছে আমাদের ভাসা ভাসা পরিচয়।

হয়েছে তামিলনাডুর সুব্রহ্মণ্য ভারতীর এবং কেরলের ভাল্লাথোল ও পানিক্করের সঙ্গে।

কিন্তু কতটুকু নির্ভরযোগ্য এই পরিচয়? এর চেয়ে শিক্ষিত ভারতবাসী ঢের বেশী জানেন না কি ইংরেজী ফরাসী জার্মান ও রুশ সাহিত্য সম্বন্ধে? একটি যথার্থ সর্বভারতীয় ভাষা না থাকা এবং ইংরেজীর মত একটি সজীব বিশ্বভাষায় আমাদের সব কটি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি অনূদিত না হওয়াই এই দুর্ভাগ্যের কারণ। জাতীয় ঐক্যের দিক থেকে এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য, এ কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য। আর এ কাজ অনায়াসেই সম্পন্ন হতে পারে সাহিত্য একাডেমির মাধ্যমে। পারছে না উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে।

মধ্যযুগের পটভূমিতে ভারতবর্ষে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। এই বিশাল সাহিত্যের প্রায় সবটাই ধর্মভিত্তিক। লেখকরা অনেকেই ছিলেন সন্ত সাধক, অথবা কোন না কোন ধর্ম প্রবর্তকের অনুগামী এবং সকলেই তাঁরা আপন আপন উপাসনা বিধি অনুযায়ী শিবশক্তি রাধাকৃষ্ণ অথবা রাম বিষয়ক পদাবলী রচনা করেছেন। কিংবা লিখেছেন পৌরাণিক কাহিনী, অথবা মহাপুরুষ জীবনী। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের বা হিন্দু মুসলমানের ভেদ-বিমুক্ত একটি সর্বমানবিক ঐক্যের আদর্শে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের রচনায় তাই প্রেম ভক্তির পথে পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে বিবেক বৈরাগ্য ও মানব প্রেমের কথাও। মধ্যযুগে শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব দর্শন যখন শিক্ষিত জনমনে সাড়া জাগায়, সন্ত কবিরাও তখন সমন্বয়ের আলোয় মানব সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের কথা ব্যক্ত করেন তাঁদের রচনায়। দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তার ফলে আসে নূতন একটি ভাবের বন্যা, যা ভূগোলের গণ্ডী অতিক্রম করে গোটা ভারতকেই প্লাবিত করে। এই ধর্মীয় সাহিত্যের পাশাপাশি আর একটি সাহিত্য ধারা প্রচলিত ছিল অবশ্য। তা হল ঐতিহাসিক ও লৌকিক কাব্য কাহিনী। তাও লেখা হয় প্রচুর পরিমাণে এবং ছোট বড় সকল শ্রেণীর মধ্যে গানের আকারে প্রচারিত হয়।

রাজপুত চারণ গাথার কথা আগেই বলেছি। এছাড়া হিন্দীতে চাঁদ বরদাই পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার কাহিনী নিয়ে লেখেন পৃথ্বীরাজ রসো। জায়সী লেখেন পদ্মিনী আলাউদ্দীনের কাহিনী পদ্মাবৎ কাব্যে। শিবাজীর জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে শিব্ব ছত্রপতি মহাকাব্য লেখেন ভূষণ। লাউ সেন কর্পূর সেনের

মত অর্ধ ঐতিহাসিক বীরদের কাহিনী নিয়ে বাংলায় কাব্য লিখেছেন ঘনরাম চক্রবর্তী। লক্ষণীয় যে মধ্য যুগের লৌকিক কাহিনীগুলিতে কারণে অকারণেই যত্রতত্র দেবতার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তার ফলে কাহিনীতে লৌকিক অলৌকিকে জগাখিচুড়ী পাকিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত, যার পর্যাপ্ত নিদর্শন পাওয়া যাবে বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলিতে। বিশুদ্ধ লৌকিক কাহিনীও দু-চারখানি আছে অবশ্য, যেমন পাঞ্জাবী ভাষায় আছে হীর রঞ্জার কাহিনী, বাংলা ও হিন্দী ভাষায় লোর চন্দ্রানীর এবং ওড়িয়া ভাষায় কাঞ্চী কাবেরীর কাহিনী। পূর্ব বাংলার গ্রাম জীবন থেকে সংগৃহীত মহুয়া মলুয়া চন্দ্রাবতী প্রভৃতি কাব্য কাহিনীরও উল্লেখ করা দরকার এই প্রসঙ্গে। এ ছাড়া বিহারের কাজরী ও বিরহা, ওড়িষ্যার ওড়িষী, পাঞ্জাবের ভাংড়া, গুজরাতের গরবা প্রভৃতি নৃত্যধারার সঙ্গে প্রচলিত লোক সঙ্গীতের কথাও উল্লেখ্য। উল্লেখ্য সারি জারি মুর্শিদা গম্ভীরা ভাওয়াইয়া ঝুমুর ভাটিয়ালি বাউল প্রভৃতি বাংলা লোকসঙ্গীতের কথাও।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য, তার সবটাই হল ছন্দে গাঁথা। পদ্যই ছিল লেখার একমাত্র মাধ্যম এবং জীবন চরিত, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, আচার আচরণ বিষয়ক নীতিগ্রন্থ, সবই লেখা হয়েছে পদ্যে। বাংলা হিন্দী ওড়িয়া অসমিয়া মারাঠী গুজরাটী, সব ভাষার ভাণ্ডার তল্লাস করলেই চোখে পড়বে এই বৈশিষ্ট্যটি। কথাবার্তায়, চিঠিপত্রে ও দলিল দস্তাবাজে একটা গদ্য ভাষার চল অবশ্যই ছিল। আসামের বুরঞ্জী নামক কৌলিক ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে, মারাঠীদের প্রশাসন সম্পর্কীয় লেখনগুলিতে এবং সহজিয়াদের শাস্ত্রব্যাখ্যামূলক ভাষ্য বা তেঙ্গুরগুলিতে নড়বড়ে একটা গদ্যের দেখাও পাওয়া যায়। কিন্তু সে গদ্যের উঠে দাঁড়ানর মত মেরুদণ্ড নেই, তাই কোনদিন তা শিষ্ট রচনার বাহন হয়নি। আসলে বিদেশী শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে এল যে নূতন শিক্ষাদীক্ষা, তারই অনুষঙ্গ রূপে উনিশ শতকের সূচনায় এল গদ্য লেখা এবং নাটক উপন্যাস প্রবন্ধ নিবন্ধ, নানা শাখায় গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল সাহিত্যের ধারা। ছাপাখানা, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ইত্যাদি প্রচার মাধ্যম নূতন কালের সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য দিকে দিকে ছড়াতেও লাগল ব্যাপক ভাবে।

এই নূতন কালের সাহিত্য প্রাণধর্মে প্রতীচ্য মননশীলতার যতটা কাছাকাছি, তার তুলনায় প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনবোধ থেকে ঢের বেশী দূরবর্তী। সাবেকী সাহিত্য প্রধানত ও প্রথমত উৎসারিত হয়েছে কোন না

কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীর দেবপ্রতীকগুলিকে বেষ্টন করে, অথবা কোন মহাপুরুষের জীবন চরিত ও তাঁদের প্রচারিত তত্ত্বকথা অবলম্বন করে। কিছু কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা, যুদ্ধ বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ মহামারী শ্রেণীর দুর্বিপাক এবং সত্য বা কল্পিত বীর কাহিনীও অবশ্য পেয়েছে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশাধিকার। আর নিরক্ষর জনগণের, চাষী কারিগর, দেহশ্রমী মজুর মাঝি মাল্লা ও বাউল ফকির প্রভৃতির কল্পনাও মুখর হয়েছে অবশ্য হাসি-কান্না ও মিলন-বিরহের বিচিত্র গানে।

কিন্তু সাত আটশো বছর ধরে সাহিত্য আবর্তিত হয়েছে এই নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে এবং তার প্রাণলোকে প্রভুত্ব করেছে গুরুবাদ, অবতারবাদ, অদৃষ্টবাদ, মোক্ষবাদ প্রভৃতি পুরাতন সব প্রত্যয়গুলির সঙ্গেই রকমারি আঞ্চলিক দেবতা, এমন কি অপদেবতা সম্পর্কীয় বিশ্বাসও। উন্নত সাহিত্যসুষমা, কাব্যগৌরব বা উজ্জ্বল জীবনদর্শন কোথাও ফোটেনি, একথা কেউ বলবেন না। কিন্তু এক একটি ধারা ধরণ ও ভঙ্গীর বাঁধা সড়কে যুগের পর যুগ রচয়িতারা যে ভাবে অন্ধ অনুবৃত্তি করে গেছেন, তাতে মৌলিকতাও বেশী মেলে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের প্রধান বিশেষত্ব তাহলে কি? সংক্ষেপে বলছি। প্রথম বিশেষত্ব হল দেবমাহাত্ম্য প্রপীড়িত ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম দেশমাহাত্ম্য বস্তুটি সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হল উনিশ শতকে। রাজপুত শিখ ও মারাঠীদের লোক গাথায় শৌর্য-বীর্যের বার্তা একেবারে নেই তা নয়। হিন্দীতেও কিছু কিছু বীরগাথা লিখিত হয়েছে ঠিকই, যাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জাতীয় বিপর্যয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এত বৈদেশিক আক্রমণ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের স্রোত গেছে যে দেশের ওপর দিয়ে, তার সামগ্রিক জাতীয় চেতনা দেশপ্রেমের পথে কেন সংহত হয়নি, তার স্ফুরণ ও বিকাশের জন্যে স্বাধীন ইউরোপের সাহিত্যিক অনুপ্রেরণার মুখাপেক্ষী হতে হল কেন, এটা সত্যিই রহস্যময়।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব হল স্বয়ং-সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারে নারীর প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের রঙ্গমঞ্চে পুরুষ ও নারীর ভূমিকার সমস্বীকৃতি। শিক্ষা ও আর্থিক স্বাধিকারে বঞ্চিত, বাল্যবিবাহ, সপত্নীত্রাস ও অকাল বৈধব্যে বিড়ম্বিত ছিল যে দেশে নারীর বাস্তব জীবন, অথচ কাব্যে ও দর্শনে যাঁকে পরমা প্রকৃতি, দিব্যানন্দময়ী হ্লাদিনী শক্তি বলে বৃথা স্তোকবাক্যে আপ্যায়িত করা হয়েছে, সে দেশে নারীর এই মানবীকরণ ও পূর্ণ মানবাধিকারে পুনর্বসতি সম্ভব হয়েছে, প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রেরণাতেই।

তৃতীয় বিশেষত্ব হল প্রকৃতির মধ্যে একটি মানবোচিত সজীব সত্তার উপলব্ধি এবং মানুষের প্রাত্যহিক সুখ দুঃখ ও আশা নিরাশার দরদী দোসর রূপে প্রকৃতির একটি শব্দহীন সক্রিয় ভূমিকার উপলব্ধি, যা ভারতীয় প্রাগাধুনিক সাহিত্যে কোনদিন ছিল না। নূতন কালে যেসব কাব্য-কবিতা লিখিত হল, তার মধ্যেই প্রথম প্রকৃতি ও মানব মনের নিভৃত আদান-প্রদানের বাণী স্পন্দিত হল, যেমন নাটকে জাগ্রত জীবন্ত স্বদেশানুরাগ ধ্বনিত হল, উপন্যাসে গল্পে প্রতিফলিত হল দুঃখ দৈন্য ও সংকট সমস্যা তাড়িত সমাজের চিত্র এবং তার পটভূমিতে নরনারীর সম্পর্ক ও স্বাধিকারের সীমানা নির্ধারণের প্রয়াস। অর্থাৎ সাহিত্য ধীরে ধীরে একালের সামাজিক জীবনে নিতে শুরু করল তার দায়িত্বজনক ভূমিকা।

এই ভূমিকা সেকালে নিত সাহিত্য গান কীর্তন কথকতা ও পাঁচালীর মাধ্যমে। বলা বাহুল্য ছাপা বইয়ের যুগে এই সাবেকী মাধ্যমগুলি বাতিল হয়েছে, তার ফলে সাহিত্যের প্রচারও সীমিত হয়েছে, শুধু লিখন-পঠনক্ষম মানুষদের গণ্ডীতে, যা সেকালে হয়নি। হয়ত বেতার দূরদর্শন এবং ছায়াচিত্র এই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারত, যদি সার্বিক জন মঙ্গলের দিক চোখ রেখে সে সবের নিয়ন্ত্রণ পরিচালন চলত।

ভারতবর্ষের মুখ্য মাতৃভাষাগুলিকে অঞ্চল হিসাবে মোটামুটি চার পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। উত্তরী পর্যায়ে পড়ে হিন্দী উর্দু পাঞ্জাবী কাশ্মীরী, পূর্বী পর্যায়ে বাংলা ওড়িয়া অসমিয়া মণিপুরী, পশ্চিমী পর্যায়ে মারাঠী গুজরাটী সিন্ধী এবং দক্ষিণী পর্যায়ে তামিল তেলুগু কনাড়ী ও মালায়ালম্। এই চার পর্যায়ে বিভক্ত ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র দক্ষিণী ভাষাগুলি ছাড়া আর সবই ইন্দো ইউরোপীয় আদি উৎস থেকে বিবর্তিত হয়েছে। সে হিসাবে তাদের মধ্যে রয়েছে নিঃসংশয় একটি গোত্রনৈকট্য। তবু প্রত্যেকটি বলয়ের অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলি নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, শব্দসম্ভারে, বাচনরীতি ও ব্যাকরণ বিধিতে তারা একে অন্যের যত ঘনিষ্ঠ, ভিন্নতর বলয়ের ভাষাগুলির ক্ষেত্রে তা নয়। অবশ্য উত্তর ও পূর্ব পশ্চিমের ভাষাগুলির মধ্যেও একটি কৌলিক আত্মীয়তা অন্তঃপ্রবাহী ধারার মত বয়ে চলেছে, যা হরফ ও উচ্চারণ বৈষম্য হেতু সব সময় আমরা ধরতে পারি না।

উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাত্যের ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এক তামিল ছাড়া অন্য ভাষাগুলির ক্ষেত্রেও এই আত্মীয়তার সূত্রটি অলভ্য নয়। কিন্তু দক্ষিণী ভাষাগুলিকে আমরা সাধারণত এক শিবিরভুক্ত করেই দেখি। তার কারণ তারা সবাই কমবেশী তামিলের কাছে ঋণী, সে ভাষার ব্যাপারেও, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ব্যাপারেও। যাই হোক এই ত্বরিত সমীক্ষায় সর্বসাকুল্যে পনের ষোলটি ভাষার সাহিত্য নিয়ে আনুপূর্বিক আলোচনা করব না। তা করার প্রয়োজনও হয়ত নেই। প্রতিটি বলয়ের অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যগুলির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা এবং সেই সূত্রে অগ্রণী লেখকদের কথা বললেই পাঠক-পাঠিকা ইদানীন্তন ভারতীয় সাহিত্যের মর্মপরিচয় পাবেন। তার অতিরিক্ত যাঁরা চাইবেন, তাঁদের জন্যে আছে বিশেষজ্ঞদের রচনা।

প্রথমে আমরা আসছি হিন্দী বলয়ের আলোচনায়। হিন্দী ভাষা বহু পুরাতন, প্রায় খ্রীষ্টীয় দশম একাদশ শতক থেকেই তাতে কাব্য ও কবিতা লেখা হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক থেকে বিপুল উদ্যমে ভক্তি সাহিত্য লেখার

জোয়ার আসে এবং সুরদাস দাদু কবীর প্রমুখ আবির্ভূত হতে থাকেন। তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানস এই ভক্তি সাহিত্যেরই মুকুটমণি স্বরূপ। সাধু রামানন্দ প্রচারিত ভক্তিধর্মের প্রভাবে রামকে তিনি নররূপী নারায়ণে রূপান্তরিত করেন, আর সেখান থেকেই রামসীতার যুগল আরাধনা সারা উত্তর ভারতে ব্যাপ্ত হয়। বলে রাখা দরকার যে আজ আমরা যে হিন্দী ভাষা বলি বা পড়ি, তার নাম খড়ী বোলী। এর জন্ম উনিশ শতকের শুরুতে এবং ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র ও মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী প্রমুখ সাহিত্যিকের হাতে এর জাতকর্ম নিষ্পন্ন হয়। তুলসীদাস যে হিন্দীর মাধ্যম নিয়েছিলেন, তার নাম অবোধী বা ব্রজ ভাষা। এই ভাষা আধুনিক ধ্যান ধারণা প্রকাশের অনুপযোগী মনে হয় বলেই, উত্তর ভারতীয় শিষ্টজনের ব্যবহৃত খড়ী বোলীকে সাহিত্য কর্মে নিয়োগের কথা ভেবেছিলেন প্রথম আমলের ভাষা সংগঠক লিখিয়েরা।

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের যাত্রা শুরু উনিশ শতকেই এবং মৈথিলশরণ গুপ্ত ও অযোধ্যা সিং উপাধ্যায় হলেন আদি অধ্যায়ের গণনীয় দুই কবি। এঁদের পর একে একে ওঠেন জয়শংকরপ্রসাদ, নিরালা [সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী], সুমিত্রানন্দন পন্থ ও মহাদেবী বর্মা। মৈথিলশরণ অমিত্রাক্ষরে মেঘনাদবধ কাব্যের অনুবাদ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উপেক্ষিতার অনুসরণে লেখেন উর্মিলার জীবন নিয়ে সাকেত কাব্য। প্রসাদ একাধারে কবি নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। কামায়নী তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্য, এতে সৃষ্টির আদি প্রেরণারূপে কামনার দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন কবি। পরবর্তীয়েরা সবই ছায়াবাদী গোষ্ঠীর কবি হিসাবে খ্যাত। ছায়াবাদীরা সকলেই রোমান্টিক স্বপ্নাবেশের কবি। তাঁদের প্রধান বিষয় হল প্রেম ও প্রকৃতি। নিরালা লেখেন অনামিকা ও পরিমল কাব্য, মহাদেবী লেখেন নীহার রশ্মি ও নীরজা কাব্য। সুমিত্রানন্দন গুঞ্জন ও পল্লব কাব্যের রোমান্টিক অধ্যায় পার করে মধ্য বয়সে সাম্যবাদে উন্নীত হন। তখন তিনি লেখেন যুগান্ত।

কথা সাহিত্যে প্রথম অগ্রণী লেখক মুন্সী প্রেমচন্দ, যাঁর সেবাসদন ও গোদান প্রসিদ্ধ উপন্যাস। ছায়াবাদের যুগে আবির্ভূত হলেও, ইনি কিন্তু বাস্তবধর্মী এবং নীচু সোপানের মনুষ্যদের দরদী বন্ধু। জৈনেন্দ্রকুমার আর একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক যাঁর পরখ ও ত্যাগপত্র মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের কৃতিত্বে অসাধারণ রচনা। তাঁরই ধারা ধরে যশপাল ও অজ্ঞেয় [এস এইচ বাৎস্যায়ন] পরে অধিকতর খ্যাতিমান হন। যশপালের শ্রেষ্ঠ রচনা হল দেশদ্রোহী ও

কমরেড। উপেন্দ্রনাথ আশক লেখেন পড়ন্ত দেওয়াল নামক বই যা আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের একটি সমাদৃত গ্রন্থ। অতি আধুনিক হিন্দী কবিতা ও কথাসাহিত্যে আজ এসেছে মার্কসবাদ, বস্তুবাদ ও অস্তিত্ববাদের প্রভাব এবং সাহিত্য স্রষ্টারা রকমারি তত্ত্ব ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। ভগবতী চরণ বর্মার ভৈঁসা গাড়ী বোধহয় এই ধারার প্রথম সার্থক বই। বিশিষ্ট হিন্দী সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রেমচন্দ ও উপেন্দ্র আশক উর্দুতেও গল্প উপন্যাস লিখেছেন।

উর্দুকে একটা স্বতন্ত্র ভাষা রূপে সংবিধানে স্বীকার করা হয়েছে বটে, কিন্তু বহুজন মনে করেন হিন্দী ও উর্দু খুবই কাছাকাছি ভাষা। হিন্দী দেবনাগরী হরফে লেখা হয়, উর্দু হয় ফারসী হরফে এবং হিন্দীতে সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা কিছুটা বেশী, পক্ষান্তরে উর্দুতে তার স্থানে রয়েছে কিছুটা ফারসী শব্দের প্রাধান্য। মুঘল যুগের শেষ ধাপে উর্দ বা শিবিরে সৈন্যবাহিনীর কথোপকথন থেকে এর উদ্ভব। মোটের উপর উর্দু খুব সমৃদ্ধ ভাষা এবং এই ভাষার তিনজন প্রসিদ্ধ কবি হলেন গালিব হালী ও মহম্মদ ইকবাল। গালিব জীবন মৃত্যু প্রেম ও সৌন্দর্যের ব্যাখ্যাতা কবি। তিনি লিখেছেন অজস্র গজল। হালী তাঁরই অনুগামী এবং তাঁর মোসান্দেস কাব্য দেশপ্রেমের জীবন্ত দলিল স্বরূপ। ইকবাল মনস্বী দার্শনিক কবি এবং শেকোয়া জবাব ও আসরারে খুদী প্রভৃতি তাঁর সুবিদিত কাব্য। পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রবক্তারূপে তিনি খ্যাত বা কুখ্যাত হন, যদিও সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা তাঁরই রচনা রূপে একদা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল গোটা ভারতবর্ষে। আজও তার রেশ থামেনি।

ইকবাল-পরবর্তী কবিদের মধ্যে জোশ মলিহাবাদী, সর্দার জাফরি, কাইফি আজমি ও মকদুম মহীউদ্দীন যুগ সচেতন কবি। প্রগতিবাদী জীবন চিন্তার দরজা উন্মুক্ত করেছেন এঁরাই। জাফরি নঈ দুনিয়াকো সালম কাব্য নাট্য এই পর্যায়ের একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। উর্দু কথা সাহিত্যে প্রেমচন্দ ও উপেন্দ্র আশকের পর উল্লেখযোগ্য নাম কিষণ চন্দর ও সজ্জাদ জহীর। কিষণ চন্দরের অন্নদাতা পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা সুখপাঠ্য উপন্যাস। কিন্তু হিন্দীর মত প্রথম সারির ঔপন্যাসিক উর্দুতে বেশি ওঠেন নি। আর হিন্দী উর্দু কোন ভাষাতেই বরণীয় নাট্যকার কেউ নেই। যদিও জয়শংকর প্রসাদের রাজ্যশ্রী এবং গোবিন্দবল্লভ পন্থের বরণমালা নাটকের উল্লেখ করা যেতে পারে।

পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরী সাহিত্যে কবি ও কথাসাহিত্যিকের সংখ্যা অল্প নয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ হয়নি বিশেষ কারোরই। পাঞ্জাবী ভাষা শিখরা লেখেন গুরুমুখী হরফে, হিন্দুরা লেখেন দেবনাগরী এবং মুসলমানরা লেখেন ফারসী হরফে, যদিও ভাষাটা মোটামুটি একই। অবশ্য এখন মুসলীম অধ্যুষিত অংশ গেছে পাকিস্তানে। হিন্দুরা গেছেন হরিয়ানায়। আধুনিক পাঞ্জাবী লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক যশস্বী নাম হল ভাই বীর সিংয়ের। কবিতা নাটক উপন্যাস প্রবন্ধ নিবন্ধ, সব বিভাগেই তিনি কলম চালিয়েছেন, যদিও সব লেখাই তাঁর একটু সাবেকীধারার। আর একজন কবি হলেন ধনীরাম ছত্রক। ইনি বীরসিংয়ের মত ধর্মীয় কবিতা লেখেন নি, ইনি মানুষ ও প্রকৃতির পূজারী কবি এবং প্রাণবন্ত লিরিক কবিতার স্রষ্টা। আধুনিক কবিরূপে শ্রীমতী অমৃতা প্রীতম এবং কথাসাহিত্যিকরূপে নানক সিং ইদানীং প্রসিদ্ধ হয়েছেন। নানক সিংয়ের ছোট গল্পগুলির গাঁথুনি সত্যিই প্রশংসনীয়। দরিদ্র সর্বাধিকারভ্রষ্ট মানুষদের ইনি দরদী শিল্পী।

অজস্র গদ্য গ্রন্থ লেখা হয়েছে পাঞ্জাবীতে যদিও, কিন্তু তার সবই মধ্যযুগীয় ধর্ম ব্যাখ্যামূলক, নয়ত শিখ-মুঘল সংঘাতের ইতিহাসভিত্তিক রচনা। কাশ্মীরে সার্থক পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য আজও কিছু গড়ে ওঠেনি বললেই চলে। একই সঙ্গে সমাজে কাশ্মীরী ডোগরি হিন্দী উর্দু পাঞ্জাবা, অনেকগুলি ভাষায় জগাখিচুড়ি পাকিয়ে রয়েছে যেমন, তেমনি নিজস্ব হরফের অভাবে সবই লেখা হয়ে চলেছে উর্দু হরফে। অথচ কেউ কারো ভাষার স্বাধিকার ছাড়তে রাজী নন। তার ফলে সাহিত্য সগৌরবে মাথা তুলতে পারছে না এখনো। তবু-১৯৩১ এর কৃষক অভ্যুত্থান থেকে যে গণজাগরণের সূত্রপাত হয়, তাতে ওঠেন কবি মজহুর, যিনি আধুনিক কাশ্মীরী সাহিত্যের অগ্রনায়ক স্বরূপ। পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে জনতাকে সংহত হবার আহ্বান জানিয়েছেন নাদিম প্রমুখ অন্যান্য কবিরা, অজস্র তেজোদ্দীপ্ত কবিতা ও গানে। কিন্তু তাঁরা স্বভূমির সীমানা কাটিয়ে বাইরে প্রচার লাভ করেন নি বললেই চলে।

২.

এবার আমরা আসছি পূর্বী পর্যায়ের সাহিত্য সমীক্ষায়। এই বিভাগে পড়ে বাংলা ওড়িয়া অসমিয়া মণিপুরী ও মৈথিলী, এই পাঁচটি ভাষার সাহিত্য। এদের মধ্যে একমাত্র ওড়িয়া ভাষার নিজস্ব একটা হরফ আছে, আর সকলে

ব্যবহার করে বাংলা হরফ এবং শব্দ সম্ভার, বাচন ভঙ্গী ও ব্যাকরণ বিধিতেও তারা পরস্পর প্রায় অভিন্ন। অর্থাৎ তারা একই ভাষা পরিবারের শাখা। এইজন্যেই নেপাল-রাজ লাইব্রেরী থেকে আবিষ্কৃত চর্যাপদগুলিকে এই ভাষাভাষীরা সকলেই নিজ নিজ ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলে দাবী করেন। বলা বাহুল্য এ দাবী অযৌক্তিক নয়। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কামরূপ একই রাষ্ট্রীয় বলয়ের অন্তর্ভুক্তরূপে পূর্বাঞ্চল নামে পরিচিত ছিল অতীতে। এখনো এদের মধ্যে খাদ্য পানীয় পরিচ্ছদ ও আচার সংস্কারে পর্যাপ্ত মিল দেখা যায়। মিল দেখা যায় শিবশক্তি ও রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রিক আরাধনা পদ্ধতিতে এবং তদ্বিষয়ক সাহিত্য ধারায়।

যাই হোক নবম দশম শতকে রচিত চর্যাপদের কথা আগেই বলেছি। তারপরই হল প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম দুটি বিভাগ, বৈষ্ণব সাহিত্য, আর মঙ্গলকাব্য। এ ছাড়া আছে কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ, কাশীরাম দাস রচিত মহাভারত এবং মালাধর রচিত ভাগবত। শেষোক্ত বইগুলি কোনটাই অনুবাদ নয়, মূলানুসরণে লিখিত এবং বইগুলিতে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে রচয়িতাদের নিজস্ব সংযোজন। যেমন মালাধর রাধাকে তাঁর কাব্যে এনেছেন, যা মূল ভাগবতে নেই। বৈষ্ণব সাহিত্যের দুটি অংশ, এক পদাবলী, আর জীবনী ও তত্ত্বগ্রন্থাবলী। পদাবলী রচয়িতাদের মধ্যে 'বড়ু' চণ্ডীদাস যে চৈতন্য পূর্ববর্তী, তা তাঁর অবিশুদ্ধ রুচিতেই প্রকট। চৈতন্য বৈষ্ণব কবিতায় একটি অতীন্দ্রিয়তার রস সঞ্চারিত করেন, যার ছাপ পাওয়া যায় পরবর্তী জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস ও শেখরের রচনায়। প্রাক্-চৈতন্য 'দীন' চণ্ডীদাসের পদে অবশ্য এর সূত্রপাত।

চৈতন্য জীবন ও চৈতন্যবাদ বিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থ হল চৈতন্য চরিতামৃত, যা লেখেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল [কবিকঙ্কণ], মনসামঙ্গল [বিজয় গুপ্ত] ও ধর্মমঙ্গল [ঘনরাম] কাহিনী কাব্য হিসাবে মধ্যযুগের মন ও মানুষকে বিশদ ভাবে উদ্‌ঘাটিত করে দেখায়। তবে লৌকিক অলৌকিকের সীমারেখা খুঁজে পাওয়া যায় না কাহিনীগুলিতে। কিছু কিছু লৌকিক কাহিনী, প্রেম সঙ্গীত ও মাতৃসঙ্গীতও লেখা হয় অবশ্য প্রাগাধুনিক যুগে। মাতৃসঙ্গীত রচয়িতারূপে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত এবং প্রেম কাহিনী [বিদ্যাসুন্দর] রচয়িতারূপে ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতকের প্রখ্যাত তিন কবি।

উনিশ শতকে জন্মাল নূতন বাংলা সাহিত্য, নূতনকালের শিক্ষা-দীক্ষা ও

জীবন দর্শনের প্রভাবে। প্রথম বৃহৎ ঘটনা হল গদ্য লেখার সূচনা, যার ফলে পদ্যের পরিবর্তে গদ্যেই এ যুগে জীবনী ইতিহাস ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি লেখা শুরু হল। দ্বিতীয় ঘটনা নাটক উপন্যাস ও নূতন ছাঁদের কাব্য ও কবিতা লেখা শুরু হল। একদিকে রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিম, অন্যদিকে মধুসূদন দীনবন্ধু বিহারীলাল গড়লেন নূতন বাংলা সাহিত্যের বনিয়াদ, যার ওপর রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুল থেকে আজকের সমস্ত লেখক দাঁড়িয়ে আছেন।

বাংলা সাহিত্যকে জাতীয়তা থেকে ভাবের গৌরবে আন্তর্জাতিকতায় উন্নীত করেন রবীন্দ্রনাথ। জগৎ জীবন প্রেম প্রকৃতি ও জন্ম মৃত্যুকে তিনি যে নূতন দৃষ্টি ও মূল্যবোধে অভিষিক্ত করেন, সারা ভারতকেই তা প্রভাবিত করে বিপুলভাবে। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য এবং দীনবন্ধু গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক স্রষ্টা সাহিত্যিকদের অনুপ্রাণিত করে নূতন পথে লেখনী ধরতে। অন্যান্য ভাষার, বিশেষত হিন্দী উর্দু ও পূর্বাঞ্চলস্থিত ভাষাগুলির সাহিত্যেই মিলবে এ সবের পর্যাপ্ত নিদর্শন। শরৎচন্দ্র থেকেই বাংলা সাহিত্যে অবহেলিত নীচু সোপানের মানুষরা সসম্মান স্বীকৃতি পেতে শুরু করেন। তারপর আধুনিক সাহিত্যিকরা সে পথকে শতমুখে প্রসারিত করেন, বাঙালী পাঠক মাত্রেই যার মোটামুটি পরিচয় জানেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক হিসাবে কথা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদা শংকর রায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সারা ভারতে সমাদৃত। কবিতায় নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাস, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য বিশেষ জনপ্রিয়। প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখের প্রবন্ধকার রূপেও বিশেষ খ্যাতি আছে।

এখন ওড়িয়া অসমিয়া প্রভৃতি সাহিত্যের অন্তর্লোকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। ওড়িয়া সাহিত্যেও বাংলার মতই আদি অধ্যায় অর্থাৎ ১৫-১৬ শতকে বলরাম দাসের রামায়ণ সরলা দাসের মহাভারত এবং জগন্নাথ দাসের ভাগবত রচিত হয়। পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে কিছু কিছু কাব্য গাথাও লেখা হয় এই সময়। এরপর ওড়িষ্যার মৃত্তিকায় চৈতন্যের আবির্ভাব হয় এবং তার ফলে আসে ভক্তিধর্মের জোয়ার। বৈষ্ণব কবিরা প্রেম ভক্তিবিষয়ক পদাবলী লিখতে থাকেন। অষ্টাদশ শতকে ওঠেন কবি উপেন্দ্র ভঞ্জ, যাঁর বৈদেহীশ

বিলাপ এক সময়ের বিখ্যাত কাব্য। ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক এই কবিই ওড়িষ্যায় ধর্মায়তন থেকে সাহিত্যকে সর্বজনীনতার স্তরে নিয়ে আসেন। ১৮০৩-এ ওড়িষ্যা আসে ইংরেজাধিকারে এবং তখন থেকে ঘটতে থাকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন তার জীবন ও মননে। খ্রীষ্টান মিশনারিদের উদ্যোগে ছাপাখানা স্থাপিত হয় এবং পাঠ্য পুস্তক, ব্যাকরণ অভিধান ইত্যাদি তৈরি হতে থাকে।

এই নূতন যুগ চেতনার আলোয় দেখা দেন তিন সাহিত্যরথী, রাধানাথ রায়, মধুসূদন রাও ও ফকির মোহন সেনাপতি। প্রথম দুজন কবি এবং তৃতীয় জন ঔপন্যাসিক।

রাধানাথ প্রকৃতপক্ষে বাঙালী সন্তান, কিন্তু ওড়িয়া ভাষায় কাব্য রচনা করে খ্যাতিমান হন। তাঁর চন্দ্রভাগা কেদার গৌরী ও অসমাপ্ত কাব্য মহাযাত্রা তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে। প্রধানত উনিশ শতকী বাংলা আখ্যান কাব্যই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী মধুসূদন ওড়িষ্যায় প্রসিদ্ধ ভক্তকবি রূপে এবং বসন্তগাথা ও কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তাঁর অনুপম গীতিকবিতা সমূহ। ফকির মোহন লছমা ও প্রায়শ্চিত্ত নামক উপন্যাসে সমাজের অবহেলিত মানুষদের নির্বাক ব্যথাকে প্রথম ভাষা দিয়েছেন। তাঁর আত্মজীবনীও একখানি অনুপম বই। এঁদের পরই ওঠে সবুজ আন্দোলন এবং বস্তুবাদী একদল তরুণ লেখক দেখা দেন, যাঁদের মধ্যে কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী বৈকুণ্ঠ পট্টনায়েক শচী রাউথরায় অগ্রগণ্য। কালিন্দীচরণের মাটির মনীষ ও মুক্তাগড়ের ক্ষুধা উপন্যাস এবং শচী রাউথের বাজীরাউথ [ইংরেজী অনুবাদে বোটম্যান বয়] কাব্য শোষিত নীচু সোপানের চাষী ও শ্রমিকদের জীবন বেদনার অকপট ছবি মেলে ধরেছে। এই দলে ছিলেন অন্নদা শংকর রায়ও, যিনি পরে বাংলা লেখায় মন দেন। গোদাবরীশ মিশ্র, নিত্যানন্দ মহাপাত্র, মায়াধর মানসিংহ প্রমুখ লেখকরা আধুনিক ওড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। মানসিংহের ধূপ কাব্য অনবদ্য শিল্পকর্ম হিসাবে বিখ্যাত।

আসামের সাহিত্যিক ইতিহাসও মোটামুটি একই রকম। প্রথম ধাপে সেখানে ডাক ও খনার বচন শ্রেণীর প্রবাদ প্রবচন রচিত হয়েছে, গ্রামের মানুষরা বেঁধেছেন বারমাহী গীত, নাও খেলবা গীত, রঙ্গিলা বিহু গীত, যা সর্বত্র গাওয়া হত। তারপর মাধব কান্দলী লিখেছেন রামায়ণ, অজ্ঞাতনামা

কবি একজন লিখেছেন মহাভারতও। ভক্তি ধর্মের উদ্ভব হয়েছে শংকর দেব ও তাঁর শিষ্য মাধব দেবের আবির্ভাবে। চৈতন্য সমসাময়িক এই আচার্যেরাও ছিলেন বৈষ্ণব। শংকর দেবের পদ সংগ্রহ, কীর্তন ঘোষা এবং ভক্তি প্রদীপ, রুক্মিণী হরণ প্রভৃতি গীতিনাট্য অদ্যাবধি জনগণের দ্বারা অশেষ সমাদরে গৃহীত হয়। মাধবের বরগীতও খুব প্রসিদ্ধ। শ্রীবর কান্দলী, রাম সরস্বতী, গোপাল দ্বিজ প্রমুখ ভক্তেরা একই ধারায় লেখেন প্রেমভক্তি মূলক পদাবলী।

উনিশ শতকের শুরুতে ওঠেন আনন্দরাম ফুকন, তিনিই অসমিয়া ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর অনুগামী হেমচন্দ্র বরুয়া অরুণোদয় পত্রিকায় এবং গুণাভিরাম বরুয়া জোনাকি পত্রিকায় যুগসচেতন নূতন সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। হেম বরুয়ার বিখ্যাত প্রহসন বাহিরে রঙচঙ ভিতরে কোয়াবাতরী এক ভণ্ড ধর্মগুরুর মুখোস খুলে ধরেছে, অনেকটা মাইকেলের বুড়ো শালিকের মত। এরপর সাহিত্যে দেখা দেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, যিনি যথার্থ স্রষ্টা লেখক এবং আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যের অগ্রনায়ক স্বরূপ। তাঁর কৃপাবর বরুয়া এবং অসমিয়া জাতি ডোঙর জাতি সুখ্যাত রচনা। তাঁর অর্ধ-ঐতিহাসিক উপন্যাস পদ্মকুমারীও একদা বিশেষ সমাদৃত গ্রন্থ ছিল। লক্ষ্মীনাথই বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত অ মোর আপোনর দেশ-এর রচয়িতা। সেকাল একালের গণনীয় অসমিয়া সাহিত্য নিদর্শন সংকলিত হয়েছে অসমিয়া সাহিত্যের চানেকী পুস্তকে, যা সকলেই দেখে নিতে পারেন।

মৈথিল ভাষা বিদ্যাপতির পদ আশ্রয় করে বাংলায় আসে চৈতন্যের আগেই এবং বাঙালী কবিরা তার অনুকরণে তৈরি করেন ব্রজবুলি, যাতে বহু পদ রচিত হয়েছে এবং যার জের চলেছে রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ পর্যন্ত। চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত গীতই ছিল মৈথিল ভাষার প্রধান সম্বল। তারপর উনিশ শতকে কান্তা ঝা, ভুবনেশ্বর সিংহ, গঙ্গানন্দ ঝা প্রমুখ লেখক ওঠেন। গঙ্গানন্দের আগিলাহী চঞ্চলা সত্যই চমকপ্রদ উপন্যাস। ছোট গল্পে বুদ্ধিধারী সিংহ ও অমরনাথ ঠাকুর যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যের অধিকারে মৈথিল দ্রুত মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, যদিও পৃথক ভাষারূপে তাকে সংবিধানে এখনো স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। মনে রাখা দরকার যে মৈথিলকে পৃথক একটি ভাষা হিসাবে গণ্য করেই গ্রিয়ারসন তার ব্যাকরণ লেখেন।

দু-কোটি মানুষের ভাষা মৈথিলী এবং অনুরূপ সংখ্যক মানুষের ভাষা ভোজপুরীকে অকারণেই হিন্দীর উপভাষা বলে চালান হয়।

মণিপুরী ভাষায় মধ্যযুগ থেকেই বৈষ্ণব আদর্শে ভক্তিগীতি রচিত হয়েছে এবং বিচিত্র নৃত্যভঙ্গীর সঙ্গে তা যাত্রার আকারে সর্বত্র গাওয়া হয়েছে, এখনো হয়। অনেকেই জানেন আশাকরি যে, মণিপুরীরা বেশীর ভাগই চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব এবং নবদ্বীপ তাঁদের তীর্থভূমি। মণিপুরী সংস্ এণ্ড ডান্স ফর্মস্ নামক বইয়ে এই প্রাচীন মণিপুরী গানের বহু নিদর্শন অনুবাদসহ গ্রথিত হয়েছে। আধুনিক কালে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস অনুবাদ করেছেন সুরচাঁদ শর্মা, বিরামণি সিং প্রভৃতি। মৌলিক লেখকরূপে নীলকান্ত সিং বিশেষ খ্যাতিমান। নীলকান্ত এবং গুণসিং ঔপন্যাসিকরূপে, আর মহারাজ কুমারী বিনোদিনী ও কুঞ্জমোহন সিং গল্পলেখকরূপে মণিপুর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই সাহিত্যেরও সর্বাংগীণ প্রতিষ্ঠা আগামী কোনদিন অবশ্যই হবে। এখনো তা সংগঠনের পথে।

৩.

এবার আসছে পশ্চিমী পর্যায়ের কথা। এই বিভাগে উল্লেখ্য মারাঠী গুজরাতী রাজস্থানী ও সিন্ধী সাহিত্যের কথা। এর মধ্যে সিন্ধী ভাষার পঠন পাঠন শুরু হয়েছে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্প দিন হল এবং সংবিধানের ভাষা সম্পর্কীয় তপশীলে তাকে অন্যতম ভাষা হিসাবে স্বীকারও করা হয়েছে। কিন্তু রাজস্থানী এখনো মৈথিলী ভোজপুরী বাঘেলী ও বুন্দেলীর মত হিন্দীর উপভাষা বলে গণ্য হয় এবং এই সব ভাষাভাষীদের কতকটা গায়ের জোরেই এক জোটভুক্ত করে হিন্দী-ভাষীদের সংখ্যাধিক্য প্রতিপাদনের চেষ্টা হয়। কিন্তু ও কথা থাক। বৈদর্ভী প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশের ভাঙাগড়া পার করে দশম একদশ শতাব্দী নাগাদ মারাঠী ভাষার জন্ম হয় এবং দ্বাদশ শতক থেকে তাতে লক্ষ্য করার মত সাহিত্য রচিত হতে থাকে। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মত মারাঠীতে একদিকে মুক্তেশ্বর কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ, অন্যদিকে জ্ঞানেশ্বর রচিত জ্ঞানেশ্বরী গীতাব্যাখ্যা বিপুল ভক্তি সাহিত্যের জমি তৈরি করে, যা থেকে একে একে উদ্ভব হয় নামদেব একনাথ বামন মধ্বমুণি মোরপন্থ মুক্তাবাঈ প্রমুখের। তুকারাম ও সমর্থ রামদাস স্বামী, শিবাজী আমলের দুই প্রখ্যাত সন্ত হলেন এই শাখার শেষ দুজন।

একদিকে অদ্বৈত বেদান্ত, অন্যদিকে গোরক্ষনাথ প্রবর্তিত নাথপন্থা, এই দুইয়ের প্রভাবে তৈরি হয় মহানুভাবী ও বরাকরি নামে দুটি সম্প্রদায়। তাঁরাই অভি এবং অভং এই দুই শ্রেণীর পদ রচনা করে ভক্তি সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করেন। তুকারাম এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য, তাঁর অভং সংখ্যায় নাকি পাঁচ হাজার। লক্ষণীয় যে পাঞ্জাবী গ্রন্থসাহেবে নামদেবের একটি পদ গ্রথিত হয় এবং পরশুরাম সম্পাদিত নবনীত গ্রন্থে সপ্তদশ শতকেই মারাঠী সন্ত কবিদের উৎকৃষ্ট পদগুলি সংকলিত হয়। অন্যান্য রাজ্যের মত মহারাষ্ট্রেও বিদেশী শাসন ও ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে জন্মায় আধুনিক সাহিত্য এবং একদিকে যেমন লেখা হতে থাকে উপন্যাস নাটক ও প্রাণধর্মী লিরিক কবিতা, অন্যদিকে তেমনি দর্শন ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক গদ্য রচনা শুরু হয়। প্রথম আমলের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হরিনারায়ণ আপ্তে, নাট্যকার দেবল, ইতিহাসকার ভি কে রাজওয়াড়ে, দার্শনিক মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে ও বালগঙ্গাধর [টিলক] তিলক যে সাহিত্যিক ঐতিহ্য স্থাপন করেন, আজাবধি সজীব রয়েছে তার ধারা। তাছাড়া ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলির অনুবাদও করেছে মারাঠীর ঐশ্বর্যবৃদ্ধি।

মারাঠী সাহিত্যের বঙ্কিম হরিনারায়ণ আপ্তের উষাকাল ও কেবল স্বরাজ সাথী প্রথম আমলের দুখানি উপন্যাস হিসাবে অবশ্যই প্রশংসনীয় রচনা। স্বাধীনতা ও জনকল্যাণে উৎসর্গিত জীবন এক সত্যসন্ধ পুরুষের কাহিনী বলা হয়েছে প্রথম বইটিতে। দ্বিতীয়টিতে একই বিষয়ের অনুবৃত্তি করেছেন লেখক, আদর্শ চরিত্র আরো কয়েকটি নরনারীর মাধ্যমে। দেবলের পবিত্রতা নাটকে মদ্যপান ও পতিতা পল্লী গমনে অভ্যস্ত স্বামীকে উদ্ধারে সাধ্বী পত্নীর একনিষ্ঠ প্রয়াস চিত্রিত হয়েছে। বাস্তবধর্মী নয় বলে, এই সব নাটক উপন্যাস আজকের পাঠকের মনোহরণ করে সামান্যই। বামন মলহার যোশীর আশ্রম হরিণী এই ধারারই আর একখানি এককাল প্রসিদ্ধ উপন্যাস। বীর সাভারকরের জাতীয়তামূলক কবিতারও যথেষ্ট সমাদর ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়ার দিকে।

আধুনিক কবিতার অগ্রদূত কেশব দাম্বে। সনেট গীতিকবিতা নাট্য কবিতা সব কিছুর লেখক কেশব বা কেশব সুত ছিলেন একদা অশেষ খ্যাতি সম্পন্ন। তাঁর জয়গাথা এখনো সাদরে পঠিত হয়। একালীন লেখকদের মধ্যে ঔপন্যাসিক নারায়ণ সীতারাম ফাড়কে, নাট্যকার শান্তারাম গোপাল গুপ্তে,

প্রাবন্ধিক চিন্তামন কেলকার, নরসিংহ খাদিলকর খুব প্রসিদ্ধ। সর্বতোমুখী সাহিত্যিক মামা বারেরকরের উল্লেখ ভিন্ন এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। তাঁর সোনেকে কলস ফরাসী ছাঁদের অপূর্ব নাটক। বাঙালীর প্রিয় তিনি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অনুবাদের জন্যেও। মারাঠী সাহিত্যের আসল ঐশ্বর্য তার প্রবন্ধ। রাণাডের হিন্দু দর্শন এবং তিলকের গীতারহস্য পাণ্ডিত্য ও মনস্বিতার জন্যে আজও স্মরণীয়। সাভারকরের কারাস্মৃতি কালাপানিও একখানি চমৎকার বই। দুঃখের বিষয় তিলক ভাণ্ডারকর শুকটাংকর শিলভেংকর, সকলেরই বেশীর ভাগ বিখ্যাত রচনা ইংরেজিতে, সাধারণ মানুষ তা পড়তে বা উপভোগ করতে পারেন নি।

মারাঠী ভাষা গঠনে ও প্রাণধর্মে হিন্দী থেকে যতটা দূরবর্তী, গুজরাতী তা নয়। বিশেষ করে রাজস্থানী ও ব্রজভাষার সঙ্গে তার বেশ খানিকটা সমজাতিত্ব রয়েছে। এই কারণেই মীরাবাঈ ও নরসিংহ মেহতা বা ভক্ত নরসীর ভজন হিন্দী অঞ্চলে প্রায় নিজস্ব সংগীত রূপে গণ্য হয়। অতি প্রচারের ফলে তাঁদের ভাষাও হিন্দীর ছাঁচে ঢালাই হয়ে গেছে বহু স্থানে। যাই হোক ভক্তি সাহিত্যে এঁরাই গণনীয় গুজরাতী লেখক। এছাড়া কৃষ্ণগীতি লেখক ভালনা এবং মাতৃসঙ্গীত লেখক বল্লভ মেরেদোর নাম করা যেতে পারে। এই ভক্তি সাহিত্যের সঙ্গে সমান্তরালভাবে দীর্ঘদিন থেকেই গুজরাতে প্রচলিত আছে পর্যাপ্ত লোকসাহিত্যের ঐশ্বর্য। তাব মধ্যে রস বা দীর্ঘ কবিতা, কথা বা ছন্দোবদ্ধ কাহিনী, ফাগু বা প্রেম কাব্য খুবই প্রসিদ্ধ। বিশেষ ধারার নৃত্য সম্বলিত গীত গরবার কথা ত বোধ হয় না বললেও চলে।

নৃত্যগীত ও কলাকৃষ্টিতে প্রাণবন্ত গুর্জরদের সঙ্গে বাঙালীর আশ্চর্য মিল দেখা যায়। তাই অনেকে অনুমান করেন, এ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অতীতে হয়ত নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের সম্পর্ক নিবিড় ছিল। গুজরাতেও জৈন বৈষ্ণব এবং নাথধর্মের প্রতিপত্তি দেখা যায়, যার ফলে প্রেমভক্তি এবং বিবেক বৈরাগ্যের আদর্শ তার মধ্যযুগীয় সাহিত্যকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে বাংলারই মত। তারপর আধুনিক কালের আবির্ভাব ও ব্যাপ্তি হয় উনিশ শতকে, অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে একই ধারায়। এই অধ্যায়ের প্রথন দুজন গণনীয় লেখক হলেন দলপত রাম ও নরমদ শংকর, যাঁরা পশ্চিমী আদর্শে প্রথম গদ্য ও কবিতা লেখা শুরু করেন। অল্প পরে ওঠেন গোবর্ধন দাস ত্রিপাঠী। চার খণ্ডে বিভক্ত তাঁর বৃহৎ উপন্যাস সরস্বতীচন্দ্র গুজরাতী সাহিত্যের

অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমগ্র ভারতীয় ইতিহাস ও জীবনচর্যাকে এই বইয়ে রূপায়িত করেন লেখক, সুবিশাল এক বংশানুক্রমিক কাহিনীর মাধ্যমে।

পরের ধাপে লক্ষ্মীনারায়ণ ব্যাস, ঈশ্বর পাতিলকার নন্দ শংকর প্রমুখ ঔপন্যাসিক গুজরাতী উপন্যাস সাহিত্যকে একেবারে আজকের দরজা পর্যন্ত টেনে এনেছেন। এঁদের পর ওঠেন তুলিজা শংকর ও গুণবন্ত আচার্য—এ যুগের দুজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। দ্বিতীয়ের কচ্ছ সমুদ্র তীরবর্তী ধীবরদের দুঃখ কষ্ট নিয়ে লেখা উপন্যাস জেলিয়া সত্যিকারের জীবনের স্পর্শে উচ্ছল। কৃষক জীবনের কবি নানালাল এবং নাট্যকার উমাশংকর যোশী তো সর্বতোমুখী লেখকরূপে সারা ভারতেই খ্যাত।

উমাশংকর শরৎচন্দ্রের অনুবাদক রূপেও প্রসিদ্ধ। পৃথ্বী বল্লভ, জয় সোমনাথ প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা সুখ্যাত রাজনীতিবিদ্ কানহাইয়া লাল মুন্সী এবং তাঁর পত্নী লীলাবতী মুন্সীও প্রসিদ্ধ তাঁদের বহুমুখী কার্যকলাপের জন্য, যার অন্যতম হল সাহিত্য সেবা। গান্ধীজী এবং তাঁর তিন অনুগামী, মহাদেব দেশাই, কিশোরলাল মসরুওয়ালা এবং কাকা সাহেব কালেলকারও বিশিষ্ট সাহিত্যিক। কাকাসাহেব আদিতে কিন্তু মারাঠী। গান্ধীজীর আত্মকথা অকপট সত্য কথন ও নিপুণ আত্মবিশ্লেষণের গুণে অপূর্ব। আধুনিকতম লেখকদের মধ্যে কলাপী ছদ্মনামধারী কবি সুরসিংজী, নাট্যকার ও কবি রমনভাই এবং কথা সাহিত্যিক পানালাল ধীরে ধীরে খ্যাতিমান হচ্ছেন। রমন ভাইয়ের নূপুর ঝংকার ও কলাপীর কেকারব কবিতাগ্রন্থদ্বয় আধুনিক কবিতার দুটি দিকচিহ্ন স্বরূপ। রমনভাইয়ের দিব্যচক্ষু এবং পানালালের চাষী উপন্যাসও অতুলনীয় বই। বিদুষী হংস মেহতাও অংশত সাহিত্যিক রূপে খ্যাত। দীর্ঘদিন তিনি একটি সাপ্তাহিক সম্পাদন করেন এবং তাঁর করা হ্যামলেটের অনুবাদ আজও অভিনীত হয়।

রাজস্থানী সাহিত্যের একালীন ধারা হিন্দীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। সাবেকী ধারা বেঁচে আছে চারণ গাথার মধ্যে, যা শুধু সুন্দর নয়, ভারতীয় সাহিত্যে অদ্বিতীয়। সুভদ্রা কুমারী চৌহান একালীন রাজস্থানী লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক স্বীকৃতা। অবশ্য তিনি লিখেছেন হিন্দীতেই।

সিন্ধী সাহিত্যে কিসিনচাঁদ বেওয়াস ও লেখরাজ আজিজ প্রমুখ কবির এবং লালচাঁদ জগতিয়ানি ও মহিরচাঁদ ভেরমুল প্রমুখ কথা সাহিত্যিকের ইদানীং

প্রতিষ্ঠা হয়েছে। লালচাঁদের পূর্ণচন্দ্র উপন্যাসে দুটি তরুণের সমকামী প্রেম বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনা যতটা পার্ণোগ্রাফী শ্রেণীভুক্ত, ততটা সাহিত্য ধর্মী নয়। ভেরমুলের মোহিনীবাঈ সুখপাঠ্য সামাজিক উপন্যাস। দেশ ও মানুষের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের অন্তরঙ্গ পরিচয় ফুটেছে কাহিনীতে। তবে লেখায় মুন্সিয়ানা কম। সিন্ধী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠতর হবে। টি এল ভাস্বানী, অধ্যাপক মালকানি, কবি কাইকিনি, আচার্য কৃপালনী, তাঁর অনুজ কৃষ্ণ কৃপালনী সবাই সিন্ধুর বরেণ্য সন্তান এবং সুলেখকও তাঁরা। তবে তাঁরা সবাই লিখেছেন ইংরেজীতে।

৪.

পূর্ব ও পশ্চিম সহ সমগ্র উত্তর ভারতের সাহিত্য জগৎ পরিক্রমা শেষ করে এখন আমরা আসছি দক্ষিণ ভারতে। দক্ষিণে আছে প্রধান চারটি ভাষা, তামিল তেলুগু, কনাডী ও মালয়ালী। কোন আদি দ্রাবিড় ভাষা থেকে চারটি ভাষারই উদ্ভব হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তামিলভূমির সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতা হেতু ঐ ভাষার আদিরূপটা অনেকটাই অবিকৃত আছে অদ্যাবধি। অন্য ভাষাগুলি সংস্কৃতের সংস্পর্শে এসে যথেষ্ট রূপান্তরিত হয়েছে। তাই তাদের শব্দ ভাণ্ডার ও বাগধারায় সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় প্রচুর, যা যায় না তামিলে। তামিলীরা দাবী করেন তাঁদের আদি সাহিত্য বেদপূর্বকালের এবং পরপর অনুষ্ঠিত তিনটি সঙ্গম বা সম্মেলনের নেতৃত্বে এই সাহিত্য যে ভাবে সংশোধিত ও সংকলিত হয়, আজ তাই আমরা পাই প্রাচীন তামিল রচনার নিদর্শন রূপে।

প্রাচীন রচনার মধ্যে নবম দশম শতকে রচিত মহাকবি কম্বন কৃত রামায়ণই হল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইলাংগো আদিগল রচিত মহাকাব্য নিলোপ্পাদিবারমও খুব প্রাচীন, যদিও তার প্রচার হয়েছে একালে। এছাড়া আছে তিরুবল্লুবর রচিত কুরল গ্রন্থ, যা বৌদ্ধ নীতিগ্রন্থ ধম্মপদ বা মার্কাস অরেলিয়াসের তত্ত্বচিন্তার অনুরূপ।

তুলসীদাস ও কৃত্তিবাসের মত কম্বনও আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি রামায়ণের, ভাবানুসরণে স্বাধীনভাবে লিখেছেন। দক্ষিণী ভক্তিধর্মের বীজ পাওয়া যায় এতে। তাছাড়া মনে রাখতে হবে, শংকরাচার্য প্রচারিত অদ্বৈত তত্ত্বের বিকল্পরূপে তামিলনাড়ুতে রামানুজ, কেরলে বিষ্ণুস্বামী, অন্ধ্রে নিম্বার্ক ও

বল্লভ এবং কর্ণাটকে মধ্বাচার্য ওঠেন, যাঁরা দ্বৈতবাদী ভক্তিধর্মের বনিয়াদ গড়েন।

এই বনিয়াদের উপরই তামিলভূমিতে জন্মায় শৈব ও বৈষ্ণব সাধন প্রণালী, যথাক্রমে নায়নমার ও আলোয়ারদের মাধ্যমে। বিরাট সাহিত্য রেখে গেছেন দুই দলই। নায়নমার শৈব কবিদের মধ্যে উল্লেখ্য সম্বন্ধর অপ্পর সুন্দরর তায়ুমনবর ও মাণিক্য বাচকর। এঁদের বারখানি সংকলনের সমষ্টিগত নাম তিরুমূরৈ, যার মধ্যে প্রধান তিনখানি তেবারম নামে প্রসিদ্ধ। আলোয়ার বা আড়বারদের দিব্য প্রবন্ধ, তিরুবায় মোড়ি বা সহস্রগীতিও স্মরণীয় সংকলন। তাতে গৃহীত হয়েছে অণ্ডাল বিষ্ণুচিত্ত শঠকোপ ও পট্টিনত্তর প্রমুখের পদ। বৈরাগ্য প্রেম আত্মসমর্পণ ও আর্তি উভয় বিভাগের রচনার বৈশিষ্ট্য এবং বাইবেলের সং অব সংস্ বা মহাসংগীতের সঙ্গেই তুলনীয়, দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত এই ভক্তি সঙ্গীতগুলি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য অনেকের মতে এই আলোয়ারী উৎস সম্ভূত।

আজকের তেলুগু ভাষাভাষী অন্ধ্র ও কনাড়ী ভাষাভাষী কর্ণাটক অতীতে একই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীন থাকায়, উভয়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে অনিবার্যভাবেই ঘনিষ্ঠ আদান প্রদান ঘটে। দুই অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যেই তাই কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কর্ণাটকে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকে বীরশৈব ধর্মের অভ্যুদয় হয় এবং তা উভয় অঞ্চলকেই প্রভাবিত করে। বসব এই ধর্মমতের দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, বসব পুরাণ নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। চেন্না বাসব অল্লমপ্রভু সিদ্ধরাম প্রমুখ সাধক কবিরা এই বিভাগের সাহিত্যকে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ করেন, অতুলনীয় ভক্তি সংগীত রচনা করে।

মহাদেবী নামে একজন মহিলা কবিও দেখা দেন কর্ণাটকে, যিনি অণ্ডাল ও মীরার মত তদ্গতপ্রাণা ভক্তরূপে পূজিতা। এঁদের অল্প পরে ওঠেন হরিদাস গোষ্ঠী। তাঁরা শিব শক্তির স্থানে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর আরাধনা প্রবর্তন করেন এবং প্রেমভক্তি মূলক অনুপম গীতমালা রচনা করে কনাড়ী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করেন। এই বিভাগের গণনীয় কবিরূপে ব্যাস রায় পুরন্দর দাস মোহন দাস আদিরাজ তীর্থ প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। বলা নিষ্প্রয়োজন যে তামিলী নায়নমার ও আলোয়ারদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই কর্ণাটকী বীর শৈব ও হরিদাস গোষ্ঠীর সাহিত্যিক এবং দার্শনিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে এসেছে।

অন্ধ্রের সাহিত্যে এসেও আমরা দেখি, এড়া নন্নয় ও তিক্কণ এই তিন কবি একযোগে তেলুগু মহাভারত রচনা করেছেন। তার পিছু পিছু জন্মেছে শৈব ও বৈষ্ণব ভক্তিসাহিত্য। বেমন্না তেনালী রামকৃষ্ণ ভদ্রাচল রামদাস এবং স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণদেব রায় তেলুগু সাহিত্যের আদি সংগঠকরূপে স্মরণীয়। কৃষ্ণদেব রায় আমুক্ত মাল্যদ নামক গ্রন্থে তামিল সাধিকা কবি প্রেম ভক্তির প্রতীক রাধা রূপিণী অণ্ডালের জীবন কাহিনী কাব্যাকারে পরিবেশন করেন। তেনালী রামকৃষ্ণ লেখেন পাণ্ডুরং মাহাত্ম্যম।

ভদ্রাচল রামদাস ছিলেন রামভক্ত এবং তিনি রামসীতার যুগল আরাধনা-মূলক পদাবলী রচনা করেন, যা মধ্যযুগীয় ভক্তি সাহিত্যে ঈষৎ নূতনত্ব দাবী করতে পারে। অনেকেই জানেন সম্ভবত যে অন্ধ্রে গীতিপদ বা গেয়মুলু নামে এক শ্রেণীর নৃত্যগীত সম্বলিত নাট্যাভিনয় বহু কালাবধি চলে আসছে। অন্নম ভট্ট পেদ্দিতিরু মলাচার্য নারায়ণ নন্দতীর্থ প্রমুখ বৈষ্ণব ভক্ত কবির গীতাবলী এই প্রসিদ্ধ গেয়মুলু নাট্যধারার মাধ্যমেই সারা দেশে ব্যাপ্ত হয়। এই ধারাই অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত একটানা চলে আসে এবং তাঞ্জোরের বিখ্যাত ত্রয়ী, ত্যাগ রাজু শ্যামা শাস্ত্রী মুত্তুস্বামী দীক্ষিতর তেলুগু ভক্তিগীতিকে একেবারে একালের দরজা পর্যন্ত টেনে আনেন। কেরলের ইতিহাসও একই। সেখানে চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে মালয়ালী ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ করেন এড়ুচ্চতন। চেরুশ শেরী করেন ভাগবতের অনুবাদ এবং পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে ওঠেন বহু ভক্ত কবি, যাঁদের মধ্যে পুন্তানম ও কুঞ্চন্নম্পার প্রসিদ্ধ।

উনিশ শতকে বিদেশী শাসন ও শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব উত্তর ভারতের মত দক্ষিণেও জীবন মননের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। কিন্তু অন্য তিনটি ভাষা বলয়ের তুলনায় তামিলনাড়ু সমস্ত কিছু পরিবর্তনের মধ্যেও খানিকটা পর্যন্ত স্বধর্মে অনড় থেকে গেল। তা সত্ত্বেও আধুনিক তামিল সাহিত্যে ঐশ্বর্য সৃষ্টি কিছু কম হয় নি। আধুনিকতার দীপ সেখানে প্রথম জ্বালেন সুব্রহ্মণ্য ভারতী, মহান কবিরূপে যিনি সর্বভারতে সুখ্যাত। ধর্মায়তন থেকে সাহিত্যকে তিনিই সমাজ মৃত্তিকায় নামিয়ে আনেন এবং রবীন্দ্রনাথের আদর্শে জাতীয় মুক্তি ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর বাণী প্রচার করেন। রামলিঙ্গম পিল্লাই দেশকাবিনায়াম পিল্লাই ভারতী দর্শন কোথা মঙ্গলম প্রমুখ কবি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে খ্যাতিমান হন পরের ধাপে। কথাসাহিত্যে প্রথম লক্ষণীয়

বই কমলম্বল চরিতম লেখেন রাজন আয়ার। কিন্তু প্রথম সার্থক উপন্যাস লেখেন কুপাস্বামী মুদালিয়ার ও রঙ্গরাজ। দ্বিতীয়ের মোহন সুন্দরম সত্যিই সুখপাঠ্য ও যুগ সচেতন গ্রন্থ। বাস্তববাদী উপন্যাস লেখক হিসাবে এম বরদারাজন এবং বিজয় রাঘবাচারী একালে সমধিক প্রসিদ্ধ। কল্কি বা কৃষ্ণ মূর্তি চিদাম্বরণ রঘুনাথন প্রভৃতিও গণণীয় কথাসাহিত্যিক। কিন্তু তামিল সাহিত্য উপন্যাস ও গল্পে এখনো অসামান্য সম্পদ লাভ করে নি, আর নাটক ত লেখা হয়নি বললেই চলে। অবশ্য জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ আছে প্রচুর, কেননা তামিলনাড়ু পণ্ডিতের দেশ। স্বয়ং রাজা গোপালাচারি একজন বিশিষ্ট প্রবন্ধকার। তিনি গল্পকারও বটেন।

আধুনিক তেলুগু সাহিত্যে যুগস্রষ্টা কোন একজন লেখকের দেখা পাওয়া না গেলেও, রামমোহন রায়ের অনুগামী বীরেশলিঙ্গম এবং চিলকামার্তি কর্মী লক্ষ্মী নরসিংহম কিছু পরিমাণ একালীনতার প্রেরণা দেন। তাছাড়া অন্ধ্রে সাহিতি শক্তি জয়ন্তী সারদা প্রভৃতি পত্রিকাগুলিও ইদানীং নব্য সাহিত্যিক মানসিকতা গড়ে তুলতে অশেষ সহায়তা করে। তারই প্রভাবে একে একে উঠতে থাকেন নাণ্ডুরী বেংকট সুব্বারাও দেবুলাপল্লী কৃষ্ণশাস্ত্রী পুত্তাপত্তি নারায়ণাচার্যলু প্রমুখ কবি এবং লক্ষ্মী নরসিংহম উন্নাভা লক্ষ্মী নারায়ণ বাচ্চু বাবু প্রভৃতি কথা সাহিত্যিক। এর মধ্যে উন্নাভা লক্ষ্মী নারায়ণের মাল্লাপল্লী উপন্যাসে দরিদ্র ধীবরদের জীবন চিত্রিত হয়েছে অকপট আন্তরিকতার ভাষায়। নাটকে গুরু জাড়া আপ্পারাও রচিত কন্যা শুল্কম একখানি অসাধারণ রচনা। বরপণের ভয়াবহ পরিণতি দেখান হয়েছে এতে ছোট গল্পে গুড়িপতি ভেংকটচলম, গোপীচাঁদ চিন্ত দিঘিথুলু ক্রমশ যশস্বী হচ্ছেন।

আধুনিক কর্ণাটকে প্রথম বিশিষ্ট কবি বি এম কান্তিয়া ও ডি আর বেন্দ্রে। বেন্দ্রে কবির লেখা মূর্তি ও প্রেমের গান এবং বসন্ত কুসুমাঞ্জলি রচয়িতা ডি ডি গুণ্ডাপ্পা ও কে ভি পুটাপ্পার লেখা অনুবাদ মাধ্যমে আমাদের কাছ পর্যন্ত এসেছে। তাঁরা সত্যিই জীবনবাদী শক্তিমান কবি, শেষোক্ত জন যুগ সচেতনও। আধুনিক যুগ ও জীবন রূপায়ণের সার্থকতর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় কনাড়ী কথাসাহিত্যে। কৃষ্ণ রাও এর সন্ধ্যা রাগ, পুটাপ্পার কন্থুরা, সব্বাম্মা শিবরাম করান্তের ভেড়াটুরু, আন্না রাও এর রাষ্ট্রপুরুষ উপন্যাস এবং আর ভি জাগীরদারের নাটক দরিদ্র নারায়ণ সত্যিই প্রথমশ্রেণীর রচনা। শেষোক্ত নাটকে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের অভ্যুদয়কে সসম্মান স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। করান্ত

বিপ্লববাদী, ভেড়াটুক্ক তাঁর বিখ্যাত বই। জ্ঞান বিদ্যা পদগৌরব ও বংশ কৌলীন্যের চেয়ে মনুষ্যত্ব যে অনেক বড়, এই কথা প্রতিপন্ন করেছেন তিনি উল্লিখিত উপন্যাসে।

মালয়ালী সাহিত্যে আধুনিকতা এসেছে দেরীতে, বিশ শতকের প্রথম দশকে। প্রধান দুজন আধুনিক কবি হলেন শংকর কুরূপ ও ভাল্লাথোল। প্রথমজন একাডেমী পুরস্কার পেয়ে সর্বভারতে যশস্বী হয়েছেন। দ্বিতীয়জন গণজাগরণের কবিরূপে মহাকবি আখ্যায় ভূষিত। তাঁর একটি চিত্র এবং শিষ্য ও পুত্র কাব্যগ্রন্থ দুটি অনুবাদ মাধ্যমে সর্বত্র পরিচিত। উপন্যাসে টি এন আপ্পা নিডুন গাড়ি ও সি ভি রামণ পিল্লাই খ্যাতিসম্পন্ন। প্রথমের কুন্দলতা এবং দ্বিতীয়ের ধর্মরাজ্য সর্বজন সমাদৃত, যদিও ঠিক একালীন উপন্যাস নয়। তা নয় কে এম পানিক্করের কেরল সিংহম ঐতিহাসিক উপন্যাসটিও। ছোট গল্পে কুনাই কৃষ্ণ মেনন ও শ্রীমতী সরস্বতী পানিক্কর দ্রুত প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হচ্ছেন।

স্বাধীনতার পূর্ব সর্ত হিসাবে ১৯৪৭-এ বঙ্গভূমি দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের বেশীর ভাগ অংশ ভারতভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত হতে শুরু করে। আর পশ্চিম পাঞ্জাব সিন্ধু সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তান নিয়ে তৈরি হয় পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হয় একই দেশের দুই অংশে পরিণত। দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকে দু-হাজার মাইল, যা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত। এ অবস্থায় করাচি বা রাওয়ালপিণ্ডি থেকে গোটা দেশ শাসন কি স্বচ্ছন্দে চলতে পারে? পদে পদেই বিচিত্র প্রাশাসনিক অসুবিধা হতে থাকে। তাছাড়া উর্দু ভাষাভাষী পশ্চিমী মুসলমানরা বাঙালী মুসলমানদের কার্যত তাঁবেদার বানাতেই সচেষ্ট হন। তাঁদের উপর জোর করে উর্দু ভাষা চাপানর পর্যন্ত চেষ্টা হয়। এই শেষোক্ত চেষ্টার ফলে ১৯৫২-তে আরম্ভ হয় ভাষা আন্দোলন, যাতে প্রথম বঙ্গভাষাভাষী মুসলীমরা সংহত হতে উদ্বুদ্ধ হন। তারই পরিণতিতে বাধে ১৯৭১-এ স্বাধীনতার জন্যে সশস্ত্র যুদ্ধ এবং পূর্ব পাকিস্তান তাতে বিজয়ী হয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ নাম নেয়। এখান থেকেই আদি বাংলা সাহিত্যের একাত্মিক প্রবাহ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় এবং বাংলাদেশের সাহিত্য সংগীত নাটক চিত্রকলা, এক কথায় সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রয়াসই নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে।

সর্বক্ষেত্রেই যদিও বাংলাদেশে আজ অগ্রযাত্রার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তবু সকল দিকের প্রসঙ্গ আমাদের বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে না। আমরা এখানে শুধু সাহিত্যের কথাই বলব। অখণ্ড বঙ্গভূমিতে মধ্যযুগ থেকেই হিন্দু ও মুসলমান কবি সাহিত্যিকরা সমান্তরাল ভাবে সাহিত্য রচনা করতে থাকেন এবং সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী, দৌলৎ কাজির সতী ময়না এবং সেখ মর্তুজা সেখ আকবর প্রমুখের রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদাবলী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়েছে। সেখান থেকে একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত উঠেছেন যে গণনীয় মুসলমান সাহিত্যস্রষ্টারা, তাঁদের মধ্যে এমদাদ আলির ডালি, কায়কোবাদের মহাশ্মশান, গোলাম হোসেনের

যমজ ভগিনী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং মীর মোশারফ হোসেনের অতুলনীয় বিষাদ সিন্ধু নামক মহরম বিষয়ক গদ্য আখ্যায়িকা ও জমিদার দর্পণ নাটক আমরা সকলেই বাল্যকালে পড়েছি। পড়েছি মোজাম্মেল হকের ফেরদৌসী চরিত, বরকতুল্লাহের পারস্য প্রতিভা, আক্রাম খাঁর সমস্যা ও সমাধান, মোস্তাফা চরিত প্রভৃতি আলোচনা গ্রন্থ। ইদানীন্তন কালে প্রধানতম প্রতিভাধর স্রষ্টা হলেন নজরুল ইসলাম, যাঁর কবিতা ও গান পশ্চিম পূর্ব নির্বিশেষে সমস্ত বাংলার হৃদয় হরণ করেছে। তাঁর অগ্নিবীণা, দোলন চাঁপা, বিষের বাঁশী, চক্রবাক, কে না পড়েছেন? তাঁর পাশাপাশি উল্লেখ্য গোলাম মোস্তাফা, হুমায়ুন কবীর, বন্দে আলি মিঞা, জসিমউদ্দীন প্রমুখ কবির এবং ওয়াজেদ আলি, হবিবুল্লা বাহার প্রমুখ কথা সাহিত্যিকের নাম, যাঁরা বাঙালীর প্রিয় লেখক ছিলেন। এঁদের মধ্যে পূর্ব বাংলার অনাড়ম্বর গ্রাম্য ভাষায় নকসীকাঁথার মাঠ ও সোজন বাদিয়ার ঘাট কাব্য-কাহিনী লিখে জসিম স্বকীয়তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। পরে তিনি বাংলাদেশে চলে যান।

এক সময় মোহম্মদী সওগাত বুলবুল প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকা ছিল, যা মুসলীম সাহিত্যিকদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে বেরত। আজাদ এওেহাদ নবযুগ প্রভৃতি দৈনিক পত্র ছিল, যাতে ওঁদের তদানীন্তন রাজনীতিক চিন্তাধারার সাক্ষাৎ মিলিত। দেশ বিভাগের পর দুই বঙ্গে স্বচ্ছন্দ আনাগোনা ব্যাহত হয় এবং বাংলাদেশের সাহিত্য শিল্প ও কলাকৃষ্টির বার্তা তখন থেকে পশ্চিম বাংলায় কমই আসতে থাকে। রাজনীতি কূটনীতির প্রাচীর দুই বাংলার মাঝখানে এক অপরিচয়ের বাধা গড়ে তোলে। তা সত্ত্বেও তার সাহিত্য সাধনার খবর যতটুকু জানা ও পাওয়ার সুযোগ হয়েছে, তাতে একথা নিঃসংশয়ে বোঝা যায় যে বাংলা দেশের এই নূতন প্রজন্ম একটি নূতন সাহিত্যিক ঐতিহ্য গড়ে তুলতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই প্রবীণ কবি সাহিত্যিকরা অবশ্য কিছুটা ঐস্লামিক ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনে মন দিয়েছিলেন এবং তাঁদের গদ্যেপদ্যে ফার্সি আরবি শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই সাহিত্যস্রষ্টারা জাগ্রত আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তস্নান অন্তে তাঁদের আমরা দেখি, যথার্থ আত্ম-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশী সাহিত্যিক রূপে। তাঁদের কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে এবং গদ্যসাহিত্যে সুচিহ্নিত স্বাধিকারের ছাপ যে কোন চক্ষুষ্মান মানুষকেই প্রীত করবে। ইংরেজী ভাষায় লিখিত হলেও ইংল্যাণ্ডের

সাহিত্য আর মার্কিন দুনিয়ার সাহিত্য যেমন এক নয়, তেমনি একই বাংলা ভাষায় লিখিত হলেও, পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য ও বাংলাদেশের সাহিত্য এক নয়। তার সুর আলাদা, আলাদা রঙ রস ও মেজাজ।

২.

প্রথমে কবিতার কথা বলি। আগেই বলেছি দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে যে সাহিত্য রচিত হয়, তাতে সার্বিক মানব চেতনার চেয়ে ঐস্লামিক চেতনাই বড় হয়ে দেখা দেয় এবং সে অধ্যায়ের গণনীয় কবি হলেন ফারুক আহামদ। দেশের মুখ্য কবিদেরই একজন তিনি সন্দেহ নেই। ভাষা আন্দোলনের পর থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী কাল পর্যন্ত তারপর একে একে বহু কবির উদ্ভব হয়েছে, যাঁরা উদার সর্বজনীন ভাব ও ভাবনার প্রবক্তা। প্রথম দিকে হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ ও আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এবং ঈষৎ পরবর্তী সময়ে শামসুর রহমান, আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী, রফিক আজাদ, আব্দুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ কবিরাই আজকের বাংলা দেশ ও বঙ্গভাষাকে গৌরবান্বিত করেছেন। এঁদের মধ্যে শক্তির তারতম্য অবশ্যই আছে, যেমন আল মাহমুদ একটু বেশী রোমান্টিক, শামসুর রহমান একটু বেশী সুর সজাগ, কিন্তু একযোগে তাঁরা সকলেই গণনীয় ও শ্রদ্ধার্হ কবি। শামসুর রহমানের রৌদ্র করোটি ও শহীদ কাদরীর উত্তরাধিকার নিঃসন্দেহে তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা এবং বাংলা ভাষাভাষী দুই বাংলার মানুষই তা পড়ে তৃপ্ত হবেন। নির্মলেন্দু গুণ ও মহাদেব সাহা প্রমুখ হিন্দুরাও সুকবি। নির্মলেন্দুর না প্রেমিক না বিপ্লবী যথার্থই উৎকৃষ্ট রচনা। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এঁরা সকলেই যথাশক্তি রবীন্দ্র-প্রভাব পরিহারের চেষ্টা করেছেন এবং অনেকেই সফলও হয়েছেন। নজরুল ও জীবনানন্দের প্রভাবও কারো কারো লেখায় ছায়াপাত করেছে, যদিও তাঁদের স্বাধিকার তাতে ষোল আনা খোয়া যায় নি। কারো কারো লেখায় সাম্যবাদের সুর স্পষ্ট, কারো কারো প্রচ্ছন্ন। তবে সকলেই তাঁরা যুগ ও জীবন সচেতন।

আজকের বাংলাদেশে নাটকও প্রচুর রচিত ও অভিনীত হচ্ছে। অভিজ্ঞ মানুষেরা জানেন আলোছায়া, কাফেলা, বিদ্রোহী পদ্মা ও অগ্নিগিরি শ্রেণীর নাটক মঞ্চাভিনয়ে বেশ সাফল্যও অর্জন করেছে। কিন্তু যথার্থ সজীব নাট্য-সাহিত্য এখনো ভাল করে গড়ে ওঠেনি। যদিও নাট্য আন্দোলন জোর কদমে

চলছে ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল নানাস্থানেই। উনিশ শতকী পূর্ব বাংলায় নাটক ও নাট্যাভিনয়ের একটা সম্মানিত ঐতিহ্য ছিল। গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল অমৃতলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকই প্রধানত মঞ্চস্থ হত, অথবা ওঁদের পৌরাণিক ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের ছকে নাটক লিখিয়ে তা মঞ্চস্থ করতেন সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা, অথবা নামী প্রতিষ্ঠানগুলি। বিচিত্র রাজনীতিক ও সামাজিক ভাঙাগড়ার ধাক্কায় সে ঐতিহ্য ধীরে ধীরে লুপ্তপ্রায় হয়েছে। নূতন কালের নাট্য-আন্দোলন নূতন আলো তুলে ধরারই চেষ্টা করছে, যা পূর্ণতর পরিণতির অপেক্ষা রাখে। ইতিমধ্যে স্বাধীনতা উত্তরকালে যে নাট্য-সাহিত্য তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে জব্বার খাঁর জাগলো দেশ, আলাউদ্দীন আল আজাদের ইহুদির মেয়ে, ইব্রাহিম খাঁর কাফেলা, আবু আমেদের আগামী দিন, আসকার ইবনে শাইখের পদক্ষেপ, বিদ্রোহী পদ্মা, মুনীর চৌধুরীর রক্তাক্ত প্রান্তর, শাহাদাৎ আলি খানের ছোট মা, ভুল ইত্যাদির নাম অবশ্যই উল্লেখ্য। যুগ ও জীবনের বার্তা আশ্রয় করেই তাঁরা নাটক রচনা করছেন এবং জনগণ সে নাটক নিয়েছেনও। তবে বিরাট শক্তিধর কোন নাট্যকার, নট বা নাট্যাধ্যক্ষ এখনো বাংলাদেশে দেখা দেননি। কিন্তু আজ দেননি বলে আগামী কালও দেবেন না, তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? বাংলা একাডেমী এবং জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান নাটকের খুবই পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। একাডেমীর পরিচালনায় একটি রঙ্গালয়ও আছে। এছাড়া চারটি বিশ্ববিদ্যালয় শহরেই পেশাদার নাট্যালয় গড়ে উঠছে এবং নবীন সাহিত্যিকরা অনেকেই নাটক লিখছেনও নিষ্ঠা সহকারে।

পৃথিবীর সব দেশের মত বাংলা দেশেও উপন্যাস এবং ছোটগল্পই সর্বাধিক সংখ্যায় লিখিত ও প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে ভাল মন্দ মাঝারির স্তরভেদ আছে, তবে মোটামুটি ভাল লেখা যথেষ্ট মিললেও, অসাধারণ অভিধা পাবার মত উপন্যাস এখনো হয়নি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী কালের উপন্যাস সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহের লাল সালু, আবুল কালামের কাশবনের কন্যা, আবু ইস্‌হাকের সূর্যদীঘল বাড়ী ঝরঝরে সুন্দর সুপাঠ্য রচনা। জীবনের স্পর্শও আছে, যদিও দ্বন্দ্বসংঘাতে উদ্বেল আজকের জটিল জীবন কমই ফুটেছে তাতে। তা এল ১৯৬২-র পর এবং আল আজাদের কর্ণফুলী, আব্দুল গফফর চৌধুরীর শেষ রজনীর চাঁদ, শকওত ওসমানের জননী, ক্রীতদাসের হাসি শহীদুল্লা কায়সারের সংশপ্তক প্রভৃতি সত্যকার সার্থক উপন্যাস। কর্ণফুলী ও

জননী, বিশেষ করে কর্ণফুলী ত মনস্তত্ত্বের ঘাত-প্রতিঘাতে খুবই লক্ষণীয় বই। বিভূতিভূষণ তারাশংকর ও মাণিকের প্রভাব ইতস্তত হয়ত আছে, কিন্তু স্বাধিকারের চিহ্নও সর্বত্রই লক্ষণীয়। ছোট গল্পে মান্নান সৈয়দ একজন আদি অধ্যায়ের শক্তিশালী লেখক। তাঁর সময়ের ঘর, মাতৃহননের নান্দীপাঠ প্রভৃতি গল্প গতানুগতিকতার পথে পা বাড়ায় নি। সৈয়দের গল্প ছোটও বটে, গল্পও বটে এবং তাঁর অধিকাংশেরই কিছু না কিছু বক্তব্য আছে। ৬৯।৭০ থেকে তারপর গল্পের রাজ্যে আসে রীতিমত সৃষ্টির জোয়ার। এই অধ্যায়ে আবু কায়সারের গুহা এবং সাজ্জাদ কাদিরের রক্তের স্বাদ যে কোন দেশের ভাল গল্পের সঙ্গে সমাসন দাবী করতে পারে। ছোটগল্প সংক্রান্ত পত্রিকা কণ্ঠস্বর নিত্যনূতন গল্পের পসরা মেলে ধরছে সকলের সামনে। আগামী দিনের সম্ভাবনা তাই খুবই উজ্জ্বল।

৩.

সৃষ্টিমূলক সাহিত্য রচনায়, অর্থাৎ কবিতা গল্প উপন্যাস ও নাটকে বাংলাদেশের নূতন প্রজন্ম বিপুল উদ্যমে অগ্রসর হয়েছেন এবং যথাশক্তি সাফল্যেরও স্বাক্ষর অংকিত করেছেন। যুগান্তকারী স্রষ্টা এখনো হয়ত কেউ ওঠেন নি, বা সর্বজনকে অভিভূত করার মত সাহিত্যও হয় নি। তবে প্রভাতী অরুণাভা উজ্জ্বল সুন্দর দিনের পূর্বাভাষ যে ঘোষণা করছে, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু উপন্যাস নাটক ও গল্প কবিতার অনুশীলন যা হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে এবং অধিকতর উৎসাহে রচিত হচ্ছে প্রবন্ধ সাহিত্য এবং সে বিভাগে ঐশ্বর্যের পরিমাণ যথার্থই চমকপ্রদ। দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সমাজবিদ্যা সাহিত্যতত্ত্ব লোকবৃত্ত, সবদিকে জনগণকে মাতৃভাষার মাধ্যমে সজাগ ও শিক্ষিত করে তোলার এই প্রয়াস সত্যই লক্ষণীয়। এই কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রণী হলেন মহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. এনামুল হক, ফয়েজ আহামদ চৌধুরী, শেখ গোলাম মকসুদ হিলালী প্রমুখ পণ্ডিতজন। তাঁদের রচিত বই পুঁথি শুধু বাংলাদেশে আবদ্ধ না থেকে দুই বঙ্গেই সমভাবে প্রচারিত হলে উভয়েরই মঙ্গল হবে। গোলাম কোরায়সী প্রণীত আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মমতাজুর রহমানের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, আব্দুস সাত্তারের আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর এরিষ্টটলের কাব্যতত্ত্ব প্রভৃতি বই পাণ্ডিত্য ও প্রাঞ্জলতা দুদিক থেকেই অপূর্ব। বাংলা

একাডেমী প্রকাশিত এই সব বই এত অল্পদিনে তৈরি হয়েছে, এ ঘটনা অবশ্যই বিস্ময়কর।

বাংলাদেশের ঢাকা রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিপুল উৎসাহে আলোচনা গবেষণার কাজ চলছে, তার ফলেই শিক্ষক শিক্ষাব্রতী ও সংস্কৃতি-সেবীদের মধ্যে নবজীবনের স্পন্দন জেগেছে। একদিকে দর্শন বিজ্ঞান অর্থনীতি চিকিৎসা সমাজবিদ্যা ইত্যাদির পরিভাষা নির্মাণে, অন্যদিকে বিবিধ বিষয়ের অভিধান ও কোষগ্রন্থ প্রণয়নে একাডেমীর পৃষ্ঠপোষকতাও বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে। আসলে বাংলা মাতৃভাষাকে শিক্ষা ও প্রশাসনের সর্বস্তরে যেমন একমাত্র মাধ্যম হিসাবে প্রবর্তন করেছেন বাংলাদেশ, তেমনি বিশ্বরাষ্ট্রসংঘেও বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায় করে তাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। স্বভাবতই বাংলা ভাষাকে সকল রকম ভাব ও ভাবনার বাহন করার প্রয়োজন অনিবার্য হয়েছে, যার পরিচায়ক হল তাঁদের প্রচুরায়ত গদ্য রচনা, যার সম্বন্ধে সামান্য দুচার কথা উল্লেখ করা হল এখানে। একটা কথা এই প্রসঙ্গে অবশ্য বলার আছে যে বিশুদ্ধ সাহিত্যধর্মী গদ্য, যাতে বক্তব্যের চেয়ে বাচন ভংগী বড় এবং যা গদ্য ও পদ্যের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করে, তাও পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে। সে বিভাগে গণনীয় লেখকদের নাম ও লেখা খুব বেশী এখনো আমাদের কাছে এসে পৌছায়নি। বলা বাহুল্য সে জাতীয় গদ্য লেখেন স্রষ্টা সাহিত্যিকরাই, পণ্ডিত প্রাবন্ধিকের কলমে সে জিনিস আসে না।

বিশ্ব সাহিত্যের বিশাল পটভূমি সামনে রেখে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যা সাহিত্য রচিত রয়েছে, তার প্রধান প্রধান লিখিয়েদের সৃষ্টি ও শিল্পরীতির স্বরূপ বোঝার সহায়তা হবে মনে করেই বিশ্বসাহিত্যের এই নাতিবৃহৎ মানচিত্রটি তৈরী করা হল। এত বড় ক্ষেত্র সম্যক্‌রূপে পর্যালোচন করার জন্য যে পরিমাণ সময় সামর্থ্য বিদ্যাবত্তা ও ভাষাজ্ঞান থাকা দরকার, তার সব কটির অভাবই পদে পদে বাধা হয়েছে লেখকের। তাছাড়া চলতি পরিবেষ্টনীতে সীমিত স্থান ও বিচিত্র রুচি এবং বোধশক্তিসম্পন্ন পাঠক-পাঠিকার কথাও মনে রাখতে হয়েছে। কাজেই অনেক প্রসঙ্গ শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে মাত্র, কোন কোন ক্ষেত্রে নামোল্লেখের বাইরে আর কিছুই করা সম্ভব হয় নি। কাজেই এই বই থেকে বিশ্বসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণাই হবে মাত্র এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে স্বদেশের জীবন মনন ও সাহিত্য চর্যার ধারাবাহিক প্রবাহটি কত বাঁক ঘুরে, কত ভাঙাগড়ার স্রোত পাড়ি দিয়ে, সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতির কত রূপান্তর অতিক্রম করে আজকের অধ্যায় উপনীত হয়েছে, তার ছবিটা চোখের সামনে হয়ত কিছুটা স্পষ্ট হবে। কোন দেশের, কোন যুগের, কোন সাহিত্যধারার সংগে আমাদের কোন যুগের, কোন সাহিত্যশাখার কতটা মিল বা গরমিল, তা যাচাই করে দেখার বুদ্ধিও হয়ত সজাগ হবে।

এই বইয়ে গ্রীক লাতিন ইতালিয়ান ফরাসী স্প্যানিশ ইংরেজী জার্মান রুশ ও স্কাণ্ডিনেভীয় সাহিত্যের যে পরিচিতি লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার সংগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সাহিত্য পড়ুয়াদের অবশ্যই অল্প স্বল্প চেনা শোনা হয়েছে, মূল অনুবাদ ও আলোচনা গ্রন্থের মাধ্যমে। হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহিত্যের সংগেও। কিন্তু লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার সাহিত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার পুঁজি অনেকেরই খুব কম। যাঁরা সবিশেষ সন্ধানী, তাঁরা হয়ত বিচ্ছিন্নভাবে দু-দশটি নাম জানেন এবং তথাকথিত আন্তর্জাতিক সংকলন পুস্তকে এঁর ওঁর তাঁর দু-দশটি রচনার নিদর্শনও পেয়েছেন হয়ত। কিন্তু স্নাতক

ও স্নাতকোত্তর পড়ুয়া আর কজন এদেশের? মাধ্যমিকের দরজাও পার না হওয়া মানুষই ত বেশী এবং তাঁদের একমাত্র আশ্রয় মাতৃভাষা। সেই মানুষেরা যদি গ্রহনক্ষত্র পৃথিবী জীবন এবং বৃক্ষলতা কীটপতঙ্গ জীবজন্তু ও মানুষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হন, যদি বিশ্বমানবের সভ্যতা সংস্কৃতি সমাজ ধর্ম সাহিত্য ও কলাকৃষ্টির খবর জানতে চান, কি তার উপায়? যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ওসবে কোন প্রয়োজন নেই, তাঁরা পাঁচালী তরজা কবিগান ইত্যাদি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন, তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। আমি মনে করি, দেশের সমস্ত নর-নারীরই অধিকার আছে অবশ্যজ্ঞাতব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি আপন মাতৃভাষার মাধ্যমে পাওয়া ও পড়ার। আসলে সমষ্টি মানুষের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে চিরদিন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষকে লক্ষ্য স্বরূপ নিয়ে আমরা বইপুঁথি লিখি বলেই, এই শ্রেণীর পলায়নী মনোভাব প্রশ্রয় পেয়েছে আমাদের। নেওয়ার মত করে ধরে দিলে, নিতে পারেন সব জিনিসই মধ্য বা স্বল্প শিক্ষিত জনও।

কিন্তু দেব মনে করলেই ত দেওয়া যায় না। কি ভাবে, কোন ভাষায় বললে সর্বনিম্ন সোপানের মানুষদের কাছ পর্যন্ত বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া যায়, সে যেমন একটা বড় সমস্যা, তেমনি বড় সমস্যা কোন প্রসঙ্গে কতটা বলতে হবে, কোথায় থামতে হবে। এই সব দিকের কথা যথাসম্ভব মনে রেখেই বইয়ের বক্তব্যগুলি উপস্থিত করেছি। তথ্যসমাবেশে তাই যেমন সর্বত্র বাহুল্য পরিহার করেছি, তত্ত্ব বিচারে তেমন কোথাও খুব গভীরে যেতে চেষ্টা করিনি। নিতান্তই প্রাথমিক ধরণের বই এটি, পণ্ডিতী রচনা নয়। তবে কতকগুলি বিষয় ইতিপূর্বে কোথাও আলোচিত হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। সেদিক থেকে এই প্রচেষ্টায় বোধহয় কিছু নূতনত্ব আছে। এশিয়ার ছোটবড় সব ভাষাকেই এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া ও লাতিন আমেরিকার সাহিত্যও বাদ পড়েনি। সব শেষে ভারতবর্ষের ভাষাগুলিকে নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে চারটি বলয়ে ভাগ করে, প্রতি বিভাগের সাহিত্যকেই অল্পাধিক স্পর্শ করা হয়েছে এবং অন্যান্য দেশের সাহিত্যে সমধর্মী রচনা পাওয়া গেলে, তাদের সঙ্গে তুলনায় আলোচনারও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ইতস্তত। বলা অনাবশ্যক যে এই বিভাগটি সংক্ষিপ্ত হলেও, এটিই বইয়ের সব চেয়ে প্রণিধানযোগ্য অংশ এবং ভারতীয় সাহিত্যের বহু প্রকোষ্ঠে বিন্যস্ত বিরাট সৌধের উপর নানা দিক দেশ থেকে আলো এনে ফেলার জন্যেই

এই বিশ্বসাহিত্য মন্থনের প্রয়াস। যাঁদের জন্যে এই প্রয়াস শহরে মফঃস্বলে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা সেই চেনা-অচেনা ভাই বন্ধু সুহৃদরা উপকৃত হলেই আমার প্রত্যাশা পূরণ হবে, শ্রম হবে সার্থক।

দীর্ঘ ও বর্ণবহুল মানব ইতিহাসের পটভূমিটি উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই আগে ইউরোপ আমেরিকা আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার কথা একের পর এক বলেছি, তারপর এসেছে পশ্চিম ও পূর্ব এশিয়ার কথা এবং সেই পটভূমিতে ভারতীয় সাহিত্যের সবগুলি খণ্ড শাখাকে এক অখণ্ড ঐক্যে গেঁথেছি। এই রকম ব্যাপক অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যা বোধহয় ইতিপূর্বে হয়নি। কিন্তু যেহেতু এটি প্রথম প্রয়াস, তাই নানা কারণেই এই উদ্যোগ অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। তাছাড়া বহুক্ষেত্রে মূল উৎসে পৌছতে হয়েছে অনুবাদের হাত ধরে। কাজেই হয়ত সব উচ্চারণ সঠিক হয় নি, সব তথ্যও যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যাত হয় নি। পরবর্তী দিনের কোন সন্ধিৎসু ও শ্রমনিষ্ঠ অভিযাত্রী এই পথে আগুয়ান হলে, একটা চলনসই কাঁচা রাস্তা অন্তত সামনে পাবেন। তিনি দেখবেন, গ্রীক লাতিন ফরাসী জার্মান রুশ ইংরেজী এক দিকে, অন্যদিকে হিব্রু আরবী ফারসী তুর্কী সংস্কৃত পালি প্রাকৃত·········নানা ভাষার শাখানদী মানব মিলনের এক মহানদীতে কি ভাবে এসে মিশেছে এবং অম্লান মৈত্রী প্রেম ও সত্যের আলোয় মনুষ্য জাতিকে ভবিষ্যতের পথনির্দেশ করছে। সেই আলোয় আমরা যদি আমাদের নিজেকেও চিনতে বা আবিষ্কার করতে পারি, বিশ্বের সঙ্গে আমাদের একত্ব উপলব্ধি করি এবং ছোট বড় উচ্চ অনুচ্চের ভেদ ভুলে মানুষকে ভালবাসতে অনুপ্রাণিত হই, তাহলে সেখানেই হবে বিশ্বসাহিত্য পাঠের যথার্থ সার্থকতা।

